নারীর ফাঁদ-৬
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাশ
www.eelm.weebly.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৬

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৬

আলতামাশ

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৬
আলতামাশ

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৬
ISBN-984-8925-03-7

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৬

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে–বিশেষত মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ
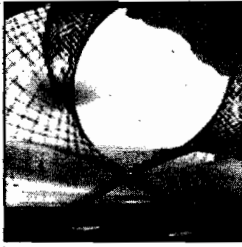
মেয়েটি নিজের লাশ দেখল

সুদর্শন যুবক আন-নাসের সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সেই কমান্ডোদের একজন, যারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কথা বলে। খৃস্টানদের বিশ্বাস, সুলতান আইউবীর কমান্ডোদেরকে মৃত্যুও ভয় করে। মরুভূমির দুর্গমতা, সমুদ্রের উতলা, কণ্টকাকীর্ণ পর্বতমালা কিছুরই পরোয়া করে না তারা। দুশমনের রসদ ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ করে নিজেরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন কুরবান করা তাদের পক্ষে একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু জিন-পরী আর ভূত-প্রেতে প্রচণ্ড ভীতি সুলতান আইউবীর এই অকুতোভয় জানবাজ গেরিলাদের। তারা কখনো জিন-ভূত দেখেনি; শুধু গল্প-কাহিনী শুনেছে মাত্র, যাতে তাদের শতভাগ বিশ্বাস আছে। জিন-পরীর নাম শুনলেই ভয়ে তাদের গা ছমছম করে ওঠে।

আন-নাসের যদি আসিয়াত দুর্গে আপন মর্জিতে এবং সচেতন অবস্থায় এসে পৌঁছতো, তাহলে এতোটা ভয় পেতো না। তাকে যদি কয়েদি বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলেও সে নির্ভীক থাকতো এবং পালাবার বুদ্ধি বের করে নিতো। কিন্তু তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে হাশিশের নেশায় মস্তিষ্কে অবাস্তব কল্পনা সৃষ্টি করে। সেই নেশার ঘোরে সে কাল্পনিক সবুজ-শ্যামলিমা এবং বাগ-বাগিচার মধ্যদিয়ে পথ অতিক্রম করে এসেছে।

কিন্তু এখন তার নেশা কেটে গেছে। এই ভূখণ্ডে কোথায় কোথায় সবুজ-শ্যামলিমা থাকতে পারে, তার স্মরণ আসতে শুরু করেছে। এখন সে বুঝে, মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল এমন স্বর্গীয় হতে পারে না।

আন-নাসের যে রূপসী মেয়েটিকে পরী মনে করেছিলো, এখন সে তার পালঙ্কে বসা। মেয়েটি তার কল্পনার চেয়েও বেশি সুন্দরী। আন-নাসের মেয়েটিকে মানুষ বলে বিশ্বাসই করতে পারছে না। মেয়েটি যখন বললো, 'তুমি আমার উপর আস্থা রাখো', তখন তার ভয় আরো বেড়ে গেলো। সে শুনেছে, জিন-পরীরা চিত্তাকর্ষক প্রতারণার মাধ্যমে মানুষ খুন করে থাকে।

এই দুর্গটি তার কাছে জিন-পরী ও ভূত-প্রেতের আড্ডা বলে মনে হতে শুরু করেছে। তার সঙ্গীরা এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

'আমি তোমার উপর কেনো ভরসা রাখবো? আমার জন্য তোমার কেনো এতো মায়া হলো? এখানে আমাকে কেনো নিয়ে এসেছো? এটা কোন্ জায়গা?' মনে সামান্য সাহস সঞ্চয় করে আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'তুমি যদি আমার উপর আস্থা স্থাপন না করো, তাহলে তোমার পরিণতি খুবই মন্দ হবে'- মেয়েটি বললো- 'তুমি ভুলে যাবে, তুমি কে ছিলে। তোমার হাত তোমারই ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হবে আর তুমি সেই রক্তকে ফুল মনে করে আনন্দিত হবে। আমি তোমার প্রতি এতো স্নেহশীল কেনো হলাম, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি এখনই দিতে পারবো না। এটি একটি দুর্গ, যার নাম আসিয়াত। এটি ফেদায়ীদের দুর্গ। এখানে ফেদায়ীদের গুরু শেখ সান্নান অবস্থান করে থাকেন। তুমি কি ফেদায়ীদের সম্পর্কে জানো?'

'হ্যাঁ, জানি'- আন-নাসের জবাব দেয়- 'খুব ভালো করে জানি। এবার আমি বুঝে ফেলেছি তোমরা কারা। তোমরাও ফেদায়ী। আমি জানি, ফেদায়ীদের কাছে তোমাদের ন্যায় রূপসী মেয়েরা থাকে!'

'তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই'- মেয়েটি বললো- 'আমার নাম লিজা।'

'তোমার সঙ্গে আরো একটি মেয়ে ছিলো, সে কোথায়?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'তার নাম থ্রেসা'- লিজা জবাব দেয়- 'সে এখানেই আছে। তোমাদেরকে হাশিশের নেশায় আচ্ছন্ন করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

লিজা আর কিছু বলতে পারলো না। হঠাৎ থ্রেসা এসে কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে যায় এবং ইশারায় লিজাকে বেরিয়ে যেতে বলে। লিজা আন-নাসেরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

'এখানে কী করছো?'- থ্রেসা জিজ্ঞেস করে- 'লোকটার এতো কাছাকাছি বসেও তোমার হুঁশ হলো না যে, মুসলমান ঘৃণ্য মানুষ? তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হতে চাচ্ছো?'

লিজার মাথায় কিছুই ধরছে না। সে কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। মুসলিম আমীরদের চরিত্রহননের পেশাটার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার। এই ঘৃণা-বিতৃষ্ণা এতোই প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, নিজের কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে লিজা। এখন তার মাথায় একটিই চিন্তা- হয় প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা পলায়ন।

'আমিও একটি যুবতী মেয়ে'- থ্রেসা বললো- 'আমারও এই মুসলিম

গেরিলা আন-নাসেরকে ভালো লাগে। ভালো লাগার মতো সুদর্শন যুবক বটে। যদি বলো, লোকটা তোমার হৃদয়ে বাসা বেঁধে ফেলেছে, তাহলে আমি বিস্মিত হবো না। তোমার অন্তরে বৃদ্ধ মুসলমান আমীর ও সালারদের প্রতি যে ঘৃণা জন্মে গেছে, তাও আমি জানি। সে কারণেই তুমি তাদের খেলনা হয়ে থাকতে চাচ্ছো না। কিন্তু কর্তব্যকে তো আর ভুলে গেলে চলবে না। ক্রুশের মর্যাদাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই মুসলমানরা তোমার দুশমন।'

'না থ্রেসা!'– লিজা আপ্লুত কণ্ঠে বললো– 'তার প্রতি আমার সেই আকর্ষণ নেই, যা তুমি মনে করছো।'

'তাহলে তার পাশে গিয়ে বসেছিলে কেন?'

'বলতে পারবো না'– লিজা বললো– 'জানি না কী ভেবে তার পাশে গিয়ে বসেছিলাম।'

'তার সঙ্গে তোমার কী কী কথা হয়েছে?' থ্রেসা জিজ্ঞেস করে।

'বিশেষ কোন কথা হয়নি।' লিজা বললো।

'তুমি দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করছো'– থ্রেসা বললো– 'এটি বিশ্বাসঘাতকতা, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

'কিন্তু শুনে রাখো থ্রেসা!'– লিজা বললো– 'আমি ঐ বুড়োটার কাছে একা যাবো না। তিনি যদি জবরদস্তি করেন, তাহলে হয় তাকে নয়তো নিজেকে শেষ করে ফেলবো।'

রূপসী কন্যা থ্রেসা তো নিজেকে পাথর বানিয়ে নিয়েছে, যার রং ও চাকচিক্য যে কারো হৃদয়কে আকর্ষণ করে থাকে এবং যে কেউ তার মালিক হতে চায়। পাথরের নিজস্ব কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকে না। লিজাও সেই অবস্থান থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। সেখানে একজন নারীর আত্মচেতনা, ভালোবাসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ বলতে কিছুই থাকে না।

থ্রেসা তাকে বললো– 'আমার বিলকুল ধারণা ছিলো না, তুমি এতো বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বে। অন্যথায় আমরা এখানে আসতাম না। কিন্তু এটি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনো কেল্লা ছিলো না। ত্রিপোলী পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমি তোমাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, শেখ সান্নান থেকে তোমাকে রক্ষা করার পুরোপুরি চেষ্টা করবো এবং এখান থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়ার পন্থা বের করে নেবো। তুমি আবেগ ত্যাগ করো। আমি আমার ওয়াদা রক্ষা করবো।'

'আমি এই মুসলিম কমান্ডোদেরকে এখান থেকে আমাদের পলায়নের কাজে ব্যবহার করতে চাই'– লিজা বললো– 'তুমি না নিজে এখান থেকে বের হতে পারবে, না আমাকে বের করতে পারবে। এরা গেরিলা সৈনিক। আমি এদের বীরত্বের কাহিনী শুনেছি। সামান্য সুযোগ বের করে দিলেই তারা পালিয়ে যাবে এবং আমাকে ও তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।'

'আমি তাদের পারঙ্গমতা ও বীরত্ব স্বীকার করি'– থ্রেসা বললো– 'কিন্তু আমরা যদি তাদের সহযোগিতায় পলায়ন করি, তাহলে তারা আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে– আমাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবে না। তুমি শত্রুর সহায়তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। গোসল করে পোশাক বদল করে আসো। শেখ সান্নান আজ রাতের আহারে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে, আমি তোমাকে বলে দেবো। প্রকাশ করতে হবে, তুমি তাকে অপছন্দ করো না এবং তার থেকে পলায়নেরও কোন চেষ্টা করছো না। আমি এইমাত্র জানতে পেরেছি, হাররানের স্বাধীন শাসক গোমস্তগীনও এসেছেন। তুমি হয়তো জানো না, গোমস্তাগীন সালাহুদ্দীন আইউবীর সবচেয়ে বড় শত্রু। তুমি তাকে বন্ধুরূপে বরণ করে নেবে। আমি বহু কষ্টে এই মুসলিম শাসকদের হাতে এনেছি এবং তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছি।'

লিজার চলে যাওয়ার পর আন-নাসের গভীর ভাবনায় ডুবে যায়। এখন সে নিশ্চিত, মেয়ে দুটো পরী নয়। কিন্তু তার প্রতি লিজার দয়াপরবশ হওয়া তাকে অস্থির করে তুলেছে। মেয়েটি বলেছিলো, তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে হাশিশের নেশায় আচ্ছন্ন করে এ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। তাতেই সে বুঝে ফেলেছে, এই মেয়েগুলো ফেদায়ী চক্রের সদস্য। তার মনে আরো সংশয় জাগে, হাশিশ ছাড়াও রূপসী যুবতীর দ্বারা তাকে হাত করা এবং আপন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলছে। আন-নাসের গেরিলা সৈনিক। কর্তব্য পালনে দুশমনের এলাকায় যেতে হবে বিধায় তাকে ফেদায়ী চক্র এবং তাদের রীতি-নীতি এবং হাশিশের ক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছিলো।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলে। জাগ্রত হয়ে তারাও তাদের কমান্ডারের ন্যায় অস্থির হয়ে ওঠে। তারা আন-নাসেরের মুখপানে তাকিয়ে থাকে।

'বন্ধুগণ!'– আন-নাসের বললো– 'আমরা ফেদায়ীদের ফাঁদে এসে পড়েছি। এই দুর্গের নাম আসিয়াত। এটি ফেদায়ী ও তাদের ফৌজের আস্তানা। এই মেয়েগুলো জিন-পরী নয়। তারা আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে, আমি এখনই বলতে পারবো না। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। ফেদায়ীরা কী কী পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তোমাদের জানা আছে। আমি যদি এই কক্ষ থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে দুর্গ থেকে পালাবার কৌশল ভেবে দেখবো। তোমরা চুপচাপ থাকবে। এরা কিছু জিজ্ঞেস করলে সংক্ষেপে উত্তর দেবে। এই শয়তানদের থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে না।'

'এরা কি আমাদেরকে কয়েদখানায় আটকে রাখবে?' আন-নাসেরের এক সঙ্গী জিজ্ঞেস করে।

'কারাগারে নিক্ষেপ করলে তো ভালোই হতো'– আন-নাসের জবাব দেয়– 'কিন্তু এরা হাশিশ আর নারী দ্বারা আমাদের মন-মস্তিষ্ক এমনভাবে বদলে দেবে, আমাদের স্মরণই থাকবে না, আমরা কারা ছিলাম এবং আমাদের ধর্ম কী ছিলো।'

'পলায়ন ছাড়া মুক্তির আর কোনো উপায় আমার চোখে পড়ছে না।' আন-নাসেরের এক সঙ্গী বললো।

'আমরা মৃত্যুকে বরণ করে নেবো; তবু ঈমান বিনষ্ট হতে দেবো না।' অপর একজন বললো।

'তোমরা সাবধান থাকবে'– আন-নাসের বললো– 'আমরা অতো তাড়াতাড়ি তাদের কব্জায় যাবো না।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি এসে কক্ষে দু'টি প্রদীপ রেখে যায়। লোকটি কোনো কথা বললো না। আসলো আর বাতিগুলো রেখে চলে গেলো। ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পেট চোঁ চোঁ করছে। তাদের কক্ষ থেকে বেশ দূরে কেল্লার এক কোণে সান্নানের মহল। সেখানে নারী আর মদের জমজমাট আসর চলছে। সান্নানের খাস কামরায় রকমারী সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে রাখা আছে। আছে মদের পিপা-পেয়ালাও। খাবারের গন্ধে মৌ মৌ করছে চারদিক। শেখ সান্নান দস্তরখানে উপবিষ্ট। তার এক পাশে থ্রেসা, অপর পাশে লিজা বসে আছে। সম্মুখে গোমস্তগীন বসে আহার করছেন।

গোমস্তগীন হাররান নামক একটি দুর্গের অধিপতি। নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি হাররান দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী

অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ছিলেন সুলতান আইউবীর মুসলমান শত্রুদের সমন্বয়কারী ব্যক্তি। তিনিও নিজের বাহিনীকে সেই সম্মিলিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যাকে সুলতান আইউবী পরাজিত করেছেন। গোমস্তগীন নিজে বাহিনীর সঙ্গে যাননি। তিন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন সাইফুদ্দীন। জোটের শরীক বাহিনীগুলোর ন্যায় গোমস্তগীনও খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। খৃস্টানরা তাদেরকে সৈন্য দিয়ে এখনো সাহায্য করেনি। তবে উপদেষ্টা, গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসী দিয়ে রেখেছে এবং তাদেরকে নিজেদের কব্জায় রাখার জন্য উন্নত মদ, সুন্দরী নারী ও অর্থ সরবরাহ করছে।

গোমস্তগীনের পেটভরা কুটিল বুদ্ধি। ষড়যন্ত্র পাকানোর ওস্তাদ লোকটি। দুশমনের উপর মাটির নীচ থেকে আক্রমণ করা এবং আপনদের বিরুদ্ধে মনে মনে শত্রুতা পোষণ করা ছিলো তার নীতি। ভালবাসা-বন্ধুত্ব ছিলো তার শুধুই ক্ষমতার জন্য। রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট হয়ে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। যারা সরল বন্ধুত্বে তাকে অকাতর সাহায্য করতো, তাদের প্রতিও তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যা মিশনে বেশ আগ্রহ-আন্তরিকতা ছিলো তার। তার ভালোভাবেই জানা ছিলো, ক্ষমতালোভী শাসকের সিংহাসন কেবল সামরিক শক্তিই উল্টাতে পারে। সুলতান আইউবীই একমাত্র সালার, যার হৃদয়সমুদ্রে জাতীয় চেতনা তরঙ্গায়িত ছিলো। সমর যোগ্যতার পাশাপাশি ঈমান ছিলো তাঁর বিশেষ এক শক্তি। গোমস্তগীন তাঁর এই শক্তিটাকেই বেশি ভয় করতেন। এবার নিজের বাহিনীকে সাইফুদ্দীনের কমান্ডে দিয়ে তুর্কমান রওনা করিয়ে কাউকে না জানিয়ে তিনি শেখ সান্নানের নিকট আসিয়াত দুর্গে এসে পৌঁছেন। উদ্দেশ্য, সুলতান আইউবীকে হত্যা করার এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যা পূর্বেকার পরিকল্পনাগুলোর ন্যায় ব্যর্থ হবে না।

আসিয়াত দুর্গে তিনি আন-নাসের ও থ্রেসা-লিজার আগমণের একদিন আগে পৌঁছে যান। সাইফুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন তার বাহিনীর সুলতান আইউবীর হাতে কী পরিণতি ঘটেছে, এখনো তিনি জানেন না। বাহিনীকে রওনা করিয়েই তিনি আইউবী হত্যার ষড়যন্ত্র মিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং আসিয়াত এসে পৌঁছান।

'গোমস্তগীন ভাই!'– শেখ সান্নান বললো– 'তোমার বন্ধু তো তুর্কমান থেকে পালিয়ে গেছে।' তারপর থ্রেসার প্রতি তাকিয়ে বললো– 'তুমি একে যুদ্ধের বিস্তারিত শোনাও।'

পরাজয়ের সংবাদে গোমস্তগীন অকস্মাৎ এতোই ব্যথিত হয়ে পড়েন যে, বেশ সময় পর্যন্ত তার মুখ থেকে কথা বের হলো না। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি ব্যথিত ও বিস্মিত চোখে থ্রেসার প্রতি তাকিয়ে থাকেন। সুলতান আইউবী স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর উপর কীভাবে আক্রমণ করেছেন এবং কীভাবে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, থ্রেসা গোমস্তগীনকে তার বিবরণ প্রদান করে। থ্রেসা সাইফুদ্দীন সম্পর্কে জানায়– 'আমি তার ওখান থেকে রওনা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রণাঙ্গন থেকে নিখোঁজ ছিলেন।'

গোমস্তগীন চুপচাপ থ্রেসার বক্তব্য শুনতে থাকেন।

'আমাকে আমার বন্ধুরা অপদস্ত করেছে'– গোমস্তগীন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন– 'আমি সাইফুদ্দীনকে তিন বাহিনীর কমান্ড প্রদানের পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু কেউই আমার কথা শুনলো না। জানি না, আমার বাহিনী কী অবস্থায় আছে!'

'খুবই খারাপ অবস্থায়'– থ্রেসা বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলারা আপনার বাহিনীকে শান্তিতে ও নিরাপদে পিছপাও হতে দেয়নি।'

'সান্নান ভাই! তুমি জানো, আমি এখানে কেন এসেছি।' গোমস্তগীন বললেন।

'জানি– তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার মিশন নিয়ে এসেছো।' সান্নান বললো।

'হ্যাঁ'– গোমস্তগীন বললেন– 'যা চাইবে, দেবো। আইউবীকে খুন করাও।'

'আমি আমাদের খৃস্টান মিত্র এবং সাইফুদ্দীনের পরিকল্পনা মোতাবেক আইউবীকে খুন করার লক্ষ্যে চারজন ঘাতক প্রেরণ করে রেখেছি'– সান্নান বললো– 'কিন্তু তারা আইউবীকে খুন করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আমার থেকে আলাদা পুরস্কার নিও'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমাকে নতুন লোক দাও। এদেরকে আমাকে দিয়ে দাও। কাজটা আমি নিজে করবো।'

'ওরা সর্বশেষ চার ফেদায়ী, যাদেরকে আমি প্রেরণ করেছি'– শেখ সান্নান বললো– 'আমার কাছে ঘাতকের অভাব নেই। কিন্তু আমি সালাহুদ্দীন হত্যার মিশন থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি।'

'কেনো?' গোমস্তগীন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'আইউবী আপনাকে কোন দুর্গ-টুর্গ দিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'না'– সান্নান বললো– 'লোকটাকে খুন করাতে আমি আমার বহু মূল্যবান ফেদায়ী নষ্ট করে ফেলেছি। আমার লোকেরা তার উপর ঘুমন্ত অবস্থায় খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ করেছে। একবার তার গায়ে তীরও ছোঁড়া হয়েছিলো। তাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছো। আমি যা বুঝেছি, তাহলো, আইউবীর উপর খোদার হাত আছে। তার মধ্যে এমন কোন শক্তি আছে, যার ফলে তার উপর না খঞ্জর ক্রিয়া করে, না তীর-বর্শা। আমার গুপ্তচররা আমাকে বলেছে, আইউবীর উপর যখন সংহারী আক্রমণ হয়, তখন তিনি ভীত কিংবা ক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে মুচকি হাসেন এবং মুহূর্ত মধ্যে ভুলে যান একটু আগে কী ঘটেছিলো।'

'পারিশ্রমিক কতো লাগবে বলো'– গোমস্তগীন গর্জে ওঠে বললেন– 'আমি আইউবীকে জীবিত দেখতে চাই না। তুমি আনাড়ি ঘাতক প্রেরণ করেছো।'

'তারা সবাই ঘাঘু ছিলো'– শেখ সান্নান বললো– 'তাদের হাত থেকে কখনো কেউ বাঁচতে পারেনি। তারা মৃত্যুকে ভয় করার মতো মানুষ ছিলো না। আমার কাছে তাদের চেয়েও দক্ষ ওস্তাদ আছে। তারা এমনভাবে খুন করে, পরে হত্যাকাণ্ডের কোন ক্লু খুঁজে বের করা যায় না। কিন্তু গোমস্তগীন! আমি আমার এই মূল্যবান লোকগুলোকে এভাবে নষ্ট করবো না। তোমরা তিনটি বাহিনী একত্রিত হয়ে আইউবীকে পরাজিত করতে পারলো না। আমার তিন-চারজন লোক কীভাবে তাকে খুন করবে?'

'তুমি আইউবীকে হত্যা করতে ভয় পেয়ে গেছো'– গোমস্তগীন বললেন– 'এর কারণ অন্যকিছু হবে।'

'আরো একটি কারণ হলো'– সান্নান বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। হাসান ইবনে সাব্বাহ পয়গম্বর হতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমার বাহিনীটি পেশাদার ঘাতক হয়ে গেছে। আমিও পেশাদার ঘাতক গোমস্তগীন! আইউবী যদি তোমাকেও খুন করার জন্য আমাকে পারিশ্রমিক দেয়, তোমাকে হত্যা করাতেও আমি দ্বিধা করবো না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী কাপুরুষের ন্যায় কাউকে হত্যা করান না'– লিজা বললো– 'এ কারণেই বোধ হয় তিনি কাপুরুষদের হাতে খুন হন না।'

'উহ!'– সান্নান লিজাকে বাহুতে চেপে ধরে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো– 'তুমি এ বয়সেই জেনে ফেলেছো, যারা কাপুরুষ নয়, কাপুরুষরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না!' সে গোমস্তগীনকে উদ্দেশ করে বললো– 'সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ এবং খৃস্টানরা শুধু এই জন্য একে

অপরের বন্ধু হয়েছে যে, তারা সকলে সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু। অন্যথায় তোমাদের মাঝে কোন বন্ধুত্ব নেই। তুমি বলো, আইউবীকে হত্যা করে তোমরা কী অর্জন করতে পারবে? তিনি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আপসে লড়াই করবে। মন দিয়ে শোন গোমস্তগীন! আইউবীর নিহত হওয়ার পর সাম্রাজ্যের এক বিঘত ভূমিও তোমার কপালে জুটবে না। তার ভাই ও সালারগণ ঐক্যবদ্ধ। তোমার যদি কাউকে খুন করাতেই হয়, সাইফুদ্দীনকে করাও এবং তাকে তুমি নিজেই হত্যা করতে পারবে। সে তোমাকে নিজের বন্ধু ও সহযোগী মনে করে। তুমি তাকে বিষ খাওয়াতে পারো, তার উপর হামলা করাতে পারো।'

গোমস্তগীন গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। ক্ষণকাল নীরব থেকে পরে বললেন- 'হ্যাঁ, সাইফুদ্দীনকে খুন করিয়ে দাও। বলো, তোমাকে কী দিতে হবে?'

'হাররানের দুর্গ।' শেখ সান্নান বললো।

'তোমার মাথা ঠিক আছে সান্নান?'- গোমস্তগীন বললেন- 'সোনাদানা-অর্থকড়ির কথা বলো।'

'সোনাদানা নয়- আমি বরং তোমাকে চারজন লোক দেবো'- শেখ সান্নান বললো- 'তারা আমার ফেদায়ী নয়, আইউবীর কমান্ডো। এই মেয়ে দুটো তাদেরকে হাশীশের নেশায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আমি তাদেরকে কারো কাছে হস্তান্তর করতে চাই না। এমন অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে আমি পেয়ে গেছি। হাশীশ আর আমার পরীরা তাদেরকে আপন রঙে রঙিন করে এমন ঘাতকে পরিণত করবে যে, তারা তাদের পিতা-মাতাকেও খুন করতে দ্বিধা করবে না। আমি তোমাকে নিরাশ করতে চাই না। তুমি এদেরকে নিয়ে যাও। এদেরকে তোমার জান্নাত দেখিয়ে দাও। তোমার হেরেমের রাজপুত্র বানাও। অজান্তে হাশীশ পান করাও। মদপানের অভ্যাস গড়ে তোল। তারপর তারা তোমার ইশারায় নাচবে, উঠ্-বস্ করবে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলারা অতো কাঁচা নয়, যতটা তুমি মনে করছো।' গোমস্তগীন বললেন।

'তুমি তো জানো গোমস্তগীন!'- সান্নান বললো- 'আমরা ফেদায়ী। আমরা মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা নিয়ে খেলা করে থাকি। আমরা আমাদের শিকারের মস্তিষ্কে চিত্তাকর্ষক কল্পনা ঢুকিয়ে দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করি যে, তারা কল্পনাকে বাস্তব ভাবতে শুরু করে। কোন মানুষের

মাথায় নারীর সুদর্শন কল্পনা সৃষ্টি করে দাও, সেই সঙ্গে নেশাও পান করাও, দেখবে সে কল্পনার গোলাম হয়ে যাবে। মানুষকে নারীর কল্পনায় হারিয়ে থাকায় অভ্যস্ত করে তোল, তুমি তার ঈমান ও চরিত্র সামান্য মূল্যে ক্রয় করতে পারবে। তুমি এই চার ব্যক্তিকে নিয়ে যাও। এ কথা ভেবো না, তুমি এদেরকে নিজ কাজে ব্যবহার করতে পারবে না।'

সান্নান মুচকি হেসে বললো– 'তুমি নিজের প্রতিই তাকিয়ে দেখো, নারী, মদ আর বিলাসপ্রিয়তা তোমাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে। মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমানের শত্রু হয়ে গেছো।'

শেখ সান্নান গোমস্তগীনকে তার মূল্য জানায়। চুক্তি সম্পাদিত হয়, গোমস্তগীন আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের হাররান নিয়ে যাবেন। সান্নান গোমস্তগীনকে পরামর্শ দেয়, এদেরকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ না করে রাজপুত্র বানিয়ে রাখবে। গোমস্তগীন দু'দিনের মধ্যে সুলতান আইউবীর কমান্ডোদের নিয়ে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে উঠে যান।

গোমস্তগীন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে শেখ সান্নানের এক লোক কক্ষে প্রবেশ করে। সে জিজ্ঞাসা করে, আজ যে চার ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে নির্দেশ কী?

'হাররানের গভর্নর গোমস্তগীন এসেছেন'– সান্নান বললো– 'তিনি তাদেরকে নিয়ে যাবেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। আমি তাদেরকে রাখতে চাই না। তবে বিষয়টা তাদের বলবে না।'

লোকটি চলে যায়। সে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দেয়। আন-নাসের খেতে অস্বীকার করে। তার সন্দেহ, খাদ্যে হাশীশ মেশানো হয়েছে। সান্নানের লোকেরা বহু কষ্টে তাকে নিশ্চিত করে, খাদ্যে কিছু মেশানো হয়নি। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে আছে। সম্মুখে এমন উন্নত খাবার দেখে তারা আরো অস্থির হয়ে ওঠে। ঝুঁকি মাথায় নিয়ে খেতে শুরু করে।

শেখ সান্নান থ্রেসাকে বললেন, লিজাকে আমার কাছে রেখে তুমি চলে যাও। থ্রেসা বললো, মেয়েটা লাগাতার তিন-চার দিন সফরে ছিলো। এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

সান্নান হিংস্র প্রকৃতির এক অমানুষ-পশু। লোকটা লিজার সঙ্গে আগেও অসদাচরণ করেছে, যা থ্রেসার কথায় লিজা সহ্য করে নিয়েছে। এবারও

গ্রেসার অজুহাত উপেক্ষা করে লিজার প্রতি হাত বাড়াতে শুরু করেছে। ঘৃণায় লিজার শরীরটা রি রি করে ওঠে। মেজাজ চড়ে গিয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে শুরু করে। ইতিমধ্যে হঠাৎ কক্ষের দরজা খুলে যায়। দারোয়ান এক ব্যক্তির আগমনের সংবাদ জানায়। সান্নান ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'এখন কেউ ভেতরে আসতে পারবে না।' কিন্তু আগন্তুক তার অসম্মতির তোয়াক্কা না করে দারেয়ানকে ঠেলে একদিকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

লোকটা একজন খৃস্টান। এইমাত্র দুর্গে এসে পৌঁছেছে। সান্নান তাকে চেনে। তাকে দেখামাত্র সে তার নাম উল্লেখপূর্বক আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু বললো– 'তুমি এখন গিয়ে বিশ্রাম নাও, সকালে কথা হবে।'

'আপনার সঙ্গে আমার সকালেই সাক্ষাৎ করার কথা ছিলো'– খৃস্টান বললো– 'কিন্তু এখানে এসেই জানতে পারলাম, এই মেয়েরা এসেছে। এদের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, বহু কিছু জানতে হবে। আমি এদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

সান্নান গ্রেসার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'একে নিয়ে যাও।' লিজাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললো– 'একে আমি এখানে রাখবো।'

'শেখ সান্নান!'– লোকটি খানিকটা শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো– 'আমি দু'জনকেই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি জানো, আমি কী কাজে এসেছি। এই মেয়েগুলোর দায়িত্ব কী, তোমার জানা আছে। তোমার বগলের তলে বসে থাকা এদের কর্তব্য নয়।' সে মেয়েরেদেক বললো– 'তোমরা দু'জনই আমার সঙ্গে আসো।'

মেয়েরা ঝটপট উঠে পড়ে লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'তোমরা কি আমার সঙ্গে শত্রুতার ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছো?'– শেখ সান্নান বললো– 'তোমরা এখন আমার দুর্গে অবস্থান করছো। আমি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অতিথি থেকে বন্দিতে পরিণত করতে পারি।' সে গর্জে ওঠে লিজার প্রতি অঙুলি নির্দেশ করে বললো– 'একে আমার কাছে রেখে তোমরা বেরিয়ে যাও।'

'সান্নান!'– খৃস্টান লোকটি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো– 'তুমি কি ভুলে গেছো, এই দুর্গ তোমাকে আমরা দিয়েছি? তুমি কি ভুলে গেছো, আমরা যদি তোমার পিঠে হাত না রাখি, তাহলে তুমি এবং তোমার ফেদায়ীরা ভাড়াটে খুনী ছাড়া আর কিছুই থাকবে না?'

শেখ সান্নান এই দুর্গের রাজা। তার এই দক্ষতা আছে যে, কোন রাজা-বাদশাহকে যে কোন সময় এমনভাবে খুন করাতে পারে যে, কারো সন্দেহ করার উপায় থাকে না। বেশ ক'জন খৃস্টান অফিসারকেও সে খুন করিয়েছে। পারস্পরিক শত্রুতার কারণে খৃস্টানরাই তাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে। প্রয়োজনে এ কাজে তারা সান্নানকে ব্যবহার করতো।

লিজা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে রাজি নয় সান্নান। সে খৃস্টান লোকটিকে বললো– 'আমি তোমাকে চিন্তা করার সময় দেবো। এই দুর্গে খোদার ফেরেশতাদেরও গুম করে ফেলা হয়, যা খোদা নিজেও টের পান না। এই মেয়েটিকে আমি দুর্গ থেকে বের হতে দেবো না। বাড়াবাড়ি করলে তুমিও বেরুতে পারবে না।'

'আমার এক সঙ্গী আগে চলে গেছে'– খৃস্টান বললো– 'সে বলে দেবে আমি এখানে আছি। তুমি জানো, আমি এখানে দু'-তিন দিন থাকতে এসেছি। তারপর আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। আমার এখানে থাকার অধিকার আছে। তোমাকে দুর্গ দান করার সময় শর্ত দেয়া হয়েছিলো, প্রয়োজন হলে আমরা এখানে এসে থাকতে পারবো। এটি আমাদের আশ্রয়স্থল এবং অস্থায়ী ক্যাম্প। তুমি আমার হাড়-গোড় গায়েব করে ফেললেও তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমাদের একজন লোক আর মেয়ে দু'টি কোথায়?' খৃস্টান লোকটি কি যেনো ভেবে পুনরায় বললো– 'তুমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারো, তাহলে এরূপ এক ডজন মেয়ে তোমার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু তুমি আমাদের সোনা আর কড়ি কেবল হজমই করে যাচ্ছো, আইউবীকে হত্যা করতে পারোনি। আমি জানতে পেরেছি, তুমি আইউবীকে হত্যা করার জন্য চারজন ফেদায়ী প্রেরণ করে রেখেছো। কিন্তু আইউবী এখন পর্যন্ত জীবিত এবং বিজয়ী। তোমার অভিযানকে আমার কাছে ধাপ্পা বলে মনে হচ্ছে।'

'ধাপ্পা নয়'– সান্নান নেশার ঘোরে ক্ষোভ-কম্পিত কণ্ঠে বললো– 'আমি সত্যি সত্যিই চার ব্যক্তিকে প্রেরণ করে রেখেছি। দিন কয়েকের মধ্যেই সংবাদ পাবে সালাহুদ্দীন আইউবী খুন হয়ে গেছেন।'

'কাজ হোক। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে এর মতো দু'টি মেয়ে উপহার দেবো।' খৃস্টান বললো।

'দেখা যাক'– সান্নান বললেন– 'এখন তুমি একে আমার কক্ষের বাইরে নিয়ে যাও। তবে দুর্গের বাইরে নিতে পারবে না। যাও, নিয়ে যাও। আমি

দুর্গে খৃস্টানদের জন্য স্বতন্ত্র যে কক্ষ দিয়েছি, একে নিয়ে তুমি সেখানে চলে যাও। খাওয়া-দাওয়া করো, ফূর্তি করো। তারপর ভেবে-চিন্তে জবাব দাও, এই মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দেবে কিনা।'

খৃস্টান লোকটি মেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে সান্নানের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। লোকটি খৃস্টানদের গোয়েন্দা ও নাশকতা বিভাগের অফিসার। মুসলিম এলাকায় ডিউটি পালন করে নিজ অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার পথে এখানে এসেছে। আসিয়াত দুর্গে খৃস্টানদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার ছিলো। খৃস্টানদের যখন যার ইচ্ছে সেখানে যেতে পারতো। থ্রেসাও এই সুযোগের সুবাদেই লিজা এবং আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের নিয়ে এখানে এসেছে। এই খৃস্টান লোকটিরও একই লক্ষ্যে এখানে আগমন। দু'-একদিন পর তার সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। দুর্গে প্রবেশ করামাত্র কেউ একজন তাকে জানায়, দু'টি খৃস্টান মেয়ে এসেছে, যারা এই মুহূর্তে শেখ সান্নানের কাছে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দেখার জন্য সে ভেতরে চলে যায় এবং সান্নানের সঙ্গে উচ্চবাচ্যের পর মেয়ে দুটোকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

খৃস্টান লোকটি মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শেখ সান্নান তার খাস লোকদের ডেকে বললো– 'এই খৃস্টান লোকটি এবং মেয়ে দুটো আমাদের কয়েদি নয়। তবে তাদেরকে আমার অনুমতি ছাড়া দুর্গ থেকে বের হতে দেবে না। তাদের উপর নজর রাখবে। আর গোমস্তগীন যখন ইচ্ছা চার কয়েদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।'

খৃস্টান লোকটিকে জানানো হলো, হাররানের গভর্নর গোমস্তগীনও এসেছেন এবং তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরে ফিরছেন। তাকে আন-নাসের এবং তার সঙ্গীদের বিষয়টিও অবহিত করা হলো।

লোকটি থ্রেসা ও লিজাকে খৃস্টানদের জন্য নির্ধারিত খাস বিশ্রামাগারে নিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

মুজাফফর উদ্দীনকে পরাজিত করে সুলতান আইউবী যাদেরকে পাকড়াও করেছেন, তাদের একজন হলেন সাইফুদ্দীনের উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন, যিনি মসুলে সাইফুদ্দীনের মন্ত্রীও ছিলেন।

সুলতান আইউবী ফখরুদ্দীনকে যুদ্ধবন্দিদের থেকে আলাদা করে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যান এবং যথাযোগ্য সম্মানের সাথে রাখেন। গনীমতের সম্পদ বণ্টন করে সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করেন যে,

তিনি পলায়নপর শত্রুদের ধাওয়া করবেন না। কোন কোন ঐতিহাসিক আইউবীর এই সিদ্ধান্তকে তার সামরিক পদস্খলন বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের এই মর্দে মুজাহিদ বহু দূরের চিন্তা করতেন। এটা বাস্তব যে, তিনি যদি শত্রুসেনাদের ধাওয়া করতেন, তাহলে তাঁর বাহিনী চিরতরে নি:শেষ হয়ে যেতো, যার ফলে দুশমন মোড় ঘুরিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

পরাজিত দুশমনকে ধাওয়া না করার একটি কারণ এই ছিলো যে, মুজাফফর উদ্দীনের সঙ্গে তিনি যে যুদ্ধ লড়েছেন, তাতে বিজয় অর্জন করতে তাঁকে চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। তাঁর ফৌজের ব্যাপক জীবনহানি ঘটেছে। আহতদের সংখ্যাও ছিলো বিপুল। সে কারণে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। অগ্রযাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি তাঁর রিজার্ভ বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। একটি কারণ এও ছিলো যে, মুসলমানের হাতে মুসলমানের আরো অধিক রক্ত ঝরুক, তা তাঁর কাম্য ছিলো না। তিনি আপন জাতিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন।

এই মুহূর্তে সুলতান আইউবী সেই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে সাইফুদ্দীনের ব্যক্তিগত তাঁবু ছিলো। সাইফুদ্দীনের তাঁবুটা ছিলো খুবই মূল্যবান। রেশমী কাপড়ের মহল। পর্দা ও শামিয়ানা ছিলো রেশমী। ভেতরে দাঁড়িয়ে শীশ মহলের কল্পনা করা যেতো। সাইফুদ্দীনের এক ভাতিজা ইয্যুদ্দীন ফররুখ শাহ সুলতান আইউবীর ফৌজে সালার ছিলেন। বিস্ময়কর যুদ্ধের বিস্ময়কর এক দৃশ্য– ভাতিজা চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে! তিনি ব্যতীত আরো কয়েকজন সৈনিক ছিলো, যারা তাদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো। সুলতান আইউবী সাইফুদ্দিনের এই তাঁবু পরিদর্শন করে তার ভাতিজা ইয্যুদ্দীনকে কাছে ডেকে মুচকি হেসে বললেন– 'তোমার চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ তুমি। তার তাঁবুটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এই সম্পদ তুমি বুঝে নাও।'

সুলতান আইউবী তো হাসিমুখে এই নজরানা পেশ করেছিলেন। কিন্তু ইয্যুদ্দীনের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় এই কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, সুলতান আইউবী ইয্যুদ্দীনের চোখে অশ্রু দেখে বললেন– 'ইয্যুদ্দীন! আমি তোমরা জযবা ভালো করেই বুঝি। কিন্তু আমার নীতি

হলো, আমার পুত্রও যদি জিহাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে, আমার তরবারী তাকেও রেহাই দেবে না। এটা ইসলামেরই শিক্ষা। পরাজিত চাচার তাঁবু দেখে তোমার চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। কিন্তু আমি আমার ইসলাম ও জিহাদ- বিরোধী পুত্রের কর্তিত মাথা দেখেও অশ্রু ঝরাবো না।'

সুলতান আইউবী উক্ত এলাকা থেকে সামান্য সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে ছাউনী ফেলেন। অঞ্চলটা পাহাড়ি। তার নাম 'সুলতান পর্বত'। ইতিহাসে জায়গাটাকে এ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। সেখান থেকে হাল্‌বের দূরত্ব পনের মাইল। আল-মালিকুস সালিহ'র রাজধানী ও আবাসভূমি এই শহরটি এখন যৌথ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতো শক্ত এবং এখানকার মানুষ (যারা সকলে মুসলমান) এতো সাহসী ও যুদ্ধবাজ ছিলো যে, সুলতান আইউবীর অবরোধ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। এখন তিনি পুনরায় এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি অবরোধ করে দখল করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি নিজের অবস্থান মজবুত করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন।

পথে দু'টি দুর্গ। একটির নাম মাম্বাজ, অপরটি বুযা। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে মাম্বাজকে মাম্বাস উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুর্গ দু'টির অধিপতিদ্বয় ছিলেন স্বাধীন মুসলমান। এরূপ আরো কয়েকটি দুর্গ ও জায়গীর ছিলো, যেগুলোতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিলো। এভাবেই সালতানাতে ইসলামিয়া দুর্গ, জায়গীর ও প্রদেশে বিভক্ত হয়েছিলো। সুলতান আইউবী এই বিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলোকে একত্রিত করে একটি সাম্রাজ্য গঠন করে তাকে এক খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, এই আমীর ও জায়গীরদারগণ নিজ নিজ স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অবস্থান অটুট রাখতে চাইছেন। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য খৃস্টানদের থেকে পর্যন্ত সাহায্য নিতে কুণ্ঠবোধ করছেন না।

সুলতান আইউবী বুযার আমীরের নামে একটি বার্তা লিখেন। আরেকটি লিখেন মাম্বাজের আমীরের নামে। বার্তা দিয়ে বুযায় ইয্‌যুদ্দীনকে এবং মাম্বাজে সাইফুদ্দীনের উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফখরুদ্দীন সুলতান আইউবীর যুদ্ধবন্দি। কিন্তু তিনি সম্মান প্রদান করে তার মন জয় করে নিয়েছেন এবং ফখরুদ্দীনও তার আনুগত্য বরণ করে নিয়েছেন। সুলতান আইউবী যখন তাকে তাঁর বিশেষ দূত বানিয়ে মাম্বাজ যেতে বললেন এবং তাকে মাম্বাজ দুর্গ জয় করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার

জন্য প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদান করলেন, তখন ফখরুদ্দীন হতবাক্ হয়ে বিস্ফারিত চোখে সুলতানের প্রতি তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি কি মুসলমান নন?'– সুলতান আইউবী ফখরুদ্দীনকে বললেন– 'আপনি আমার প্রতি এমন বিস্মিত চোখে তাকালেন, যেনো আমি একজন কাফেরকে আমার দূত ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করে প্রেরণ করছি। আপনার কি আমার উপর ভরসা নেই, নাকি নিজের ঈমানের প্রতি আস্থা নেই? আমি মাম্বাজ দুর্গ দখল করতে চাই। আপনি তার অধিপতিকে আমার বার্তা পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তার সম্মতি আদায় করবেন, যেনো রক্তপাত ছাড়াই তিনি দুর্গটা আমাদের হাতে তুলে দেন এবং তার বাহিনীকে আমাদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন।'

ইয্‌যুদ্দীন ও ফখরুদ্দীন রওনা হয়ে যান। বুযার অধিপতি ইয্‌যুদ্দীনকে সাদরে বরণ করে নেন এবং সুলতান আইউবীর বার্তা পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিলো–

'আমার প্রিয় ভাই! আমরা এক আল্লাহ্, এক রাসূল ও এক কুরআনের অনুসারী। কিন্তু আমরা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি, যেমন একটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ মরুভূমির বালির উপর বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকে। এমন দেহ কি নড়াচড়া করতে পারে? কোনো কাজে আসে? এই সুযোগে খৃস্টানরা স্বার্থ হাসিল করছে। তারা আমাদের কর্তিত অঙ্গগুলোকে শকুনের ন্যায় ভক্ষণ করছে। আমাদেরকে এক জাতির আকারে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় আমরা কেউ-ই বেঁচে থাকতে পারবো না। আমি আপনাকে এক জাতির আকারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি আপনার বর্তমান পদপর্যাদার কথা ভাবুন। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আপনি শত্রুর প্রতিও হাত প্রসারিত করে থাকেন। আমি আপনাকে কুরআন ও ইসলামের পয়গাম পৌঁছালাম। এই পয়গাম বুঝবার ও তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করুন। প্রথম আবশ্যক হলো, আপনার দুর্গটা সালতানাতে ইসলামিয়ার কর্তৃত্বে অর্পণ করুন এবং আপনি আমার আনুগত্য মেনে নিন। এই প্রস্তাব মেনে নিলে আপনার বাহিনী আমার বাহিনীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। আপনি দুর্গের অধিপতি থাকবেন এবং দুর্গের উপর সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকা উড্ডীন থাকবে। তবে যদি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহলে আমার ফৌজ আপনার দুর্গ অবরোধ করবে। আপনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হোন। আমি আপনাকে হাল্‌ব, মসুল ও হাররানের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ও পিছপা হওয়ার ইতিহাস স্মরণ

করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। তাতে আপনার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হবে। আপনি আমার সদাচরণের আশা রাখুন। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি যা কিছু করছি, ইসলামের বিধান ও আল্লাহর আইন অনুসারেই করছি।'

বুযার আমীর বার্তাটা পাঠ করে ইয্‌যুদ্দীনের প্রতি তাকান। ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'আপনার দুর্গ মজবুত নয়, আপনার সৈন্যও কম। এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে আমাদের হাতে শেষ করে ফেলবেন না।'

বুযার আমীর প্রস্তাব মেনে নেন এবং সুলতান আইউবী বরাবর পত্র লিখেন যে, আপনি আসুন এবং দুর্গ নিয়ে নিন।

মাম্বাজের আমীরও সুলতান আইউবীর আনুগত্য গ্রহণ করে নেন। ফখরুদ্দীন তার লিখিত বার্তা নিয়ে ফিরে যান।

সুলতান আইউবী স্বয়ং উভয় দুর্গে যান। সেখানে যেসব সৈন্য ছিলো, তাদেরকে দুর্গ থেকে বের করে নিজের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে নেন এবং নিজ বাহিনীকে দুর্গে পাঠিয়ে দেন। তিনি উভয় দুর্গে রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম জমা করেন। কিন্তু বাহিনীকে দুর্গে আবদ্ধ করে রাখেননি। হাল্‌বের সন্নিকটে এজাজ নামক একটি মজবুত দুর্গ ছিলো। এই দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হাল্‌বের হাতে ছিলো। তার অধিপতি ছিলেন হাল্‌বের আমীর আল-মালিকুস সালিহ'র অফাদার। সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করার আগে এই দুর্গটিও বিনা যুদ্ধে দখল করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর এক সালার আল-হিময়ারীকে লিখিত বার্তাসহ এজাজ রওনা করিয়ে দেন।

এজাজের আমীর সুলতান আইউবীর বার্তাটি পাঠ করে পত্রখানা আল-হিময়ারীর দিকে নিক্ষেপ করে বললেন– 'তোমার সুলতান আল্লাহ ও রাসূলের নামে সারা পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাকে বলবে, তুমি হাল্‌ব অবরোধ করে দেখেছো, এবার এজাজ অবরোধ করে দেখো।'

'আপনি কি সুলতানের হাতে মুসলমানের রক্ত ঝরানো পছন্দ করবেন?'– আল হিময়ারী বললেন– 'আপনি কি চান, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি আর খৃস্টানরা আমাদের তামাশা দেখুক?'

'আপনাদের সুলতানকে খৃস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলুন।' এজাজের আমীর বললেন।

'তা আপনি কি খৃস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না?'– আল-হিময়ারী জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি কি তাদেরকে আপনার শত্রু মনে করেন না?'

'এই মুহূর্তে আমরা সুলতান আইউবীকে আমাদের শত্রু মনে করি, যিনি আমাদেরকে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন'– এজাজের আমীর বললেন– 'তিনি আমাদের থেকে এই দুর্গ তরবারীর জোরে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন।'

এজাজের আমীর আল-হিময়ারীকে এক তিল মর্যাদা দিলেন না এবং তাকে চলে যেতে বললেন।

আসিয়াত দুর্গে আগন্তুক খৃস্টান গোমস্তগীনের নিকট উপবিষ্ট। থ্রেসালিজাও তার সঙ্গে বসা। গোমস্তগীন ও এই খৃস্টান লোকটি পূর্ব থেকেই পরিচিত। খৃস্টান বললো– 'শুনলাম, আপনি নাকি সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করাতে করাতে এবার সাইফুদ্দীনকেও হত্যা করার মনস্থ করেছেন?'

'আপনি কি শুনেননি, সাইফুদ্দীন কীরূপ কাপুরুষতা ও সামরিক অদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন?'– গোমস্তগীন বললেন– 'এই মেয়েরাই বলেছে, সে আমাদের তিন বাহিনীকে এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে, আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমাদের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে একত্রিত করে আইউবীকে হাল্‌ব থেকে দূরে প্রতিহত করতে চাই। সাইফুদ্দীন যদি জীবিত থাকে, তাহলে আক্রোশ মেটানোর জন্য সে পুনরায় বাহিনীর কমান্ড হাতে নেয়ার জন্য জিদ্‌ ধরে বসবে এবং আমাদেরকে আরেকটি পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেবে। আমি তো তাকে হত্যা না করে উপায় দেখছি না।'

'সাইফুদ্দীন অতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নয়, যতোটা আপনি মনে করছেন'– খৃস্টান বললো– 'আমরা যা জানি আপনি তা জানেন না। আমরা আপনার প্রত্যেক বন্ধু ও প্রত্যেক শত্রুকে আপনার চেয়ে ভালো জানি। সে কারণেই আমরা আপনাকে আমাদের উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছি। আমি আইউবীর বিভিন্ন এলাকায় ছদ্মবেশ ধারন করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘুরে ফিরছি, তা আপনার অস্তিত্ব এবং আপনার রাজ্যের বিস্তৃতির জন্যই। আমি যে পরিস্থিতি দেখে এসেছি, তার দাবি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর সবাই স্বাধীনতা লাভ করেছে। আপনি কেল্লাদার থেকে স্বাধীন শাসক হয়ে গেছেন। আইউবী মরে গেলে আপনি দশগুণ এলাকার শাসক হবেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকা আজীবনের জন্য দূর হয়ে যাবে। আমি ত্রিপোলী যাচ্ছি। আপনার বাহিনীর উট-ঘোড়ার যে ক্ষতি হয়েছে, আমি অতি শীঘ্র তা পূরণ করে দেবো। অস্ত্রও প্রেরণ করবো।

আপনি সাহস হারাবেন না। আইউবী মারা গেলে আমরা আপনাকে এতো অধিক সাহায্য দেবো যে, সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ ও সকল স্বাধীন মুসলমান শাসকের উপর আপনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে এবং এখন সালাহুদ্দীন আইউবীর যে মর্যাদা, আপনি সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন।

ক্ষমতার মোহ এবং বিলাসপূজা গোমস্তগীনের বিবেকের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছে। এতোটুকু বুঝ তার মাথায় ঢুকেনি যে, এই খৃস্টান লোক আপন জাতির প্রতিনিধি এবং সে যা কিছু বলছে ও করছে, তারই জাতির স্বার্থে করছে। লোকটি খৃস্টানদের একজন পদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও নাশকতার হোতা। সুলতান আইউবীর অগ্রযাত্রা কীভাবে প্রতিহত করা যাবে, ঘুরে-ফিরে তারই একটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করছে সে। প্রতিটি রণাঙ্গনে পরাজিত হয়ে খৃস্টানরা সমস্যার সমাধানে একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। তাহলো, সুলতান আইউবীকে হত্যা করে মুসলিম শাসক গোষ্ঠীকে পরস্পর বিরাগভাজন করে তোলা, যাতে আইউবীর মৃত্যুর পর তারা আপসে লড়াই করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আরব জগতের রাজত্ব খৃস্টানদের হাতে চলে যায়। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তেই তারা মুসলিম আমীরদের মন-মস্তিষ্কে অর্থপূজা এবং রাজত্বের মোহ ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করা থেকে তো শেখ সান্নানও হাত গুটিয়ে নিয়েছেন'– গোমস্তগীন বললেন– 'তিনি নাকি চারজন ফেদায়ী প্রেরণ করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি আশাবাদী নন।'

'এতোগুলো সংহারী আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর সান্নানকে আইউবী হত্যা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়াই উচিত'– খৃস্টান বললো– 'সেই আক্রমণগুলো ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ, ফেদায়ীরা হাশীশের নেশায় অভিযানে গিয়ে থাকে। আইউবীকে কেবল সেই ব্যক্তিই হত্যা করতে পারে, যার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করে, জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা থেকেই কাজটা করা উচিত। আপনি বোধ হয় মানবীয় স্বভাব বুঝেন না। আইউবীর উপর যে-ই সংহারী আক্রমণ করতে চায়, সে-ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। যখনই বিপরীত দিক থেকে মোকাবেলা শুরু হয়, তার নেশা দূর হয়ে যায় এবং সে নিজের জীবন রক্ষা করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। আপনি বরং সান্নানকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে চেতনায় অন্ধ বানিয়ে এবং অন্তরে আইউবীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে প্রেরণ করুন। তাহলে সে আইউবীকে হত্যা করেই ঘরে ফিরবে।'

'শেখ সান্নান আমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর চারজন গেরিলা দান করেছেন'– গোমস্তগীন বললেন– 'এবং বলেছেন, এদেরকে প্রস্তুত করে আপনি তাদের দ্বারা সাফুদ্দীনকে হত্যা করান। এই গেরিলারা সাইফুদ্দীনকে তাদের শত্রু মনে করে। আমি এদের দ্বারা সাইফুদ্দীনকে হত্যা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আপনি তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করছেন না কেন?'– খৃস্টান বললো– 'তবে আপনি তাদেরকে হাশীশ কিংবা অন্য কোন নেশা দেবেন না। তাদের উপর আবেগের নেশা সৃষ্টি করে দিন।'

'এমন নেশা আপনিই সৃষ্টি করতে পারেন।' গোমস্তগীন বললেন।

খৃস্টান লোকটি থ্রেসা ও লিজার প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসে। লিজা বললো– 'আমি গেরিলাদের কমান্ডারকে প্রস্তুত করতে পারি। তার নাম আন-নাসের। অপর তিনজনের দায়িত্ব আপনি নিন।'

'তুমি আন-নাসেরকে প্রস্তুত করো'– খৃস্টান বললো– 'অন্যদেরকে আপাতত এমনিতেই রেখে দাও। আমি মানবীয় স্বভাব যতটুকু জানি, আন-নাসের নিজেই তার সঙ্গীদেরকে তৈরি করে নেবে। তাদেরকে এখানে নিয়ে আসো। আন-নাসেরকে এক কক্ষে এবং অন্যদেরকে আরেক কক্ষে থাকতে দাও। আর তোমরা সতর্ক থাকবে। এই মেয়েটির প্রতি সান্নানের কুদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। এর প্রতি তার আসক্তি প্রবল। একে তার হাতে ফিরিয়ে না দিলে তিনি আমাকে মেহমানখানা থেকে কয়েদখানায় স্থানান্তরিত করবেন। তিনি আমাকে ভাববার সুযোগ দিয়েছেন।'

'আপনি তার ব্যাপারে অস্থির হবেন না'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমি এই চার গেরিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি এবং এই মেয়েরাও আমার সঙ্গে যাবেন।'

আন-নাসের ও তার তিন সঙ্গীকে খৃস্টান সেনা অফিসারদের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। আন-নাসেরকে আলাদা কক্ষে রাখা হলো। কিন্তু সে আপত্তি জানায়, আমি আমার সঙ্গীদের ছাড়া আলাদা থাকবো না। থ্রেসা ও লিজা তাকে তাদের জালে আটকানোর জন্য আলাদা রাখতে চাইছে।

'তুমি তাদের কমান্ডার'– খৃস্টান লোকটি আন-নাসেরকে বললো– 'তোমাকে তোমার অধীনদের থেকে আলাদা-ই থাকা উচিত।'

'আমাদের কাছে উঁচ্চ-নীচুর ভেদাভেদ নেই'– আন-নাসের বললো–

'স্বয়ং আমাদের সুলতান সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে থাকেন। আমি একজন সামান্য কমান্ডার মাত্র। সঙ্গীদের থেকে আলাদা অবস্থান করে অহংকার দেখালে আমার পাপ হবে।'

'আমরা তোমাকে সম্মান করতে চাই'– খৃস্টান বললো– 'নিজ এলাকায় গিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে থেকো। আমরা অধীনদের সঙ্গে রেখে তোমাকে অপমান করতে চাই না।'

'না, আমাদের গেরিলা কমান্ডানগণ অধীনদের সঙ্গে একত্র থেকেই বাঁচে এবং তাদেরই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে'– আন-নাসের বললো– 'আমরা মৃত্যুপথের সহযাত্রী। আমরা একে অপর থেকে আলাদা হই না। আমরা যদি আপনার মেহমান হতাম, তাহলে আমি আপনার কথা মানতে পারতাম। কিন্তু আমরা আপনার কয়েদি। আমরা একজন আপনাদের থেকে যে কষ্ট-নির্যাতনের শিকার হবো, সকলে তার অংশীদার হতে চাই। এক সঙ্গীর জীবন রক্ষার জন্য আমরা অপর তিন সঙ্গী জীবন কুরবান করে দেবো।'

'তোমরা আমাদের বন্দিদশা থেকে পালাবার চেষ্টা করবে নাকি?'– গোমস্তগীন মুচকি হেসে বললেন।

আমরা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবো'– আন-নাসের বললো– 'এটা আমাদের কর্তব্য। আমরা নিজেরা মৃত্যুবরণ করে মুক্ত হবো কিংবা আপনাদের সকলকে মেরে। আমাদেরকে যদি কয়েদখানায়ই রাখতে হয়, তো শিকল পরিয়ে দিন। আমাদেরকে ধোঁকা দেবেন না। আমরা ময়দানের পুরুষ। আমরা সাইফুদ্দীন-গোমস্তগীনের ন্যায় ঈমান-বিক্রেতা নই।'

'আমি গোমস্তগীন'– গোমস্তগীন বললেন– 'হাররানের স্বাধীন শাসনকর্তা। তুমি আমাকে ঈমান– বিক্রেতা বলেছো।'

'তাই নাকি! তাহলে আমি আপনাকে পুনরায় ঈমান-বিক্রেতা বলছি?'– আন-নাসের বললো– 'আমি আপনাকে গাদ্দারও বলছি।'

'কিন্তু এখন আমি না ঈমান-বিক্রেতা, না গাদ্দার।'– গোমস্তগীন বললেন। আন-নাসেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য গোমস্তগীন মিথ্যা বললেন– 'দেখো না যুদ্ধ হচ্ছে তুর্কমানে আর আমি এখানে! আমি যদি তোমাদের শত্রু হতাম, তাহলে তোমরা এখন যেরূপ মুক্ত আছো, সেরূপ মুক্ত থাকতে পারতে না। আমি সাইফুদ্দীন ও আস-সালিহ থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমি তোমাদেরকে সম্মানের সাথে এই দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি একজন সাধারণ কমান্ডার। কিন্তু তোমার বুকে সালাহুদ্দীন আইউবীর মর্যাদা ও চেতনা বিরাজমান।'

'কিন্তু আমি আমার সঙ্গীদের থেকে আলাদা থাকবো না'– আন-নাসের বললো– 'আমার দ্বারা আপনারা এই পাপ করাবেন না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে'– খৃস্টান বললো- 'তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথেই থাকো।'

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী একটি প্রশস্ত ও মনোরম কক্ষে অবস্থান করছে, যেখানে পালঙ্কের উপর নরম গালিচা পাতা আছে। তাদের সেবার জন্য একজন খাদেম দেয়া হয়েছে। তারা খাদেমকে জিজ্ঞাসা করে, এটা দুর্গের কোন্ অংশ এবং এখানে কী হয়? খাদেম বললো, এটা মেহমানদের কক্ষ। এখানে শুধু উচ্চপদস্থ ও মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানদেরই রাখা হয়।

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী গভীরভাবে লক্ষ করলো, তাদের সঙ্গে বন্দির আচরণ করা হচ্ছে না। তারা ছিলো অতিশয় ক্লান্ত। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেয়ামাত্র তাদের ঘুম এসে যায়। তারা গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

খৃস্টান ও গোমস্তগীন আন-নাসেরকে দীর্ঘ সময় নিজেদের সঙ্গে রাখে। তার সঙ্গে এমন সম্মানজনক কথাবার্তা বলে যে, আন-নাসেরের চেতনার প্রখরতা কিছুটা কমে আসে। এটা তাদের সাফল্যের প্রথম ধাপ। লিজা উক্ত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। আন-নাসের যখন সেই কক্ষ থেকে বের হয়, ততোক্ষণে তার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আন-নাসের একটা কক্ষের বারান্দায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি নারীকণ্ঠ ফিস্ ফিস্ শব্দে তাকে ডাক দেয়। জায়গাটা অন্ধকার। আন-নাসের দাঁড়িয়ে যায়। একটি কালোপনা ছায়া এগিয়ে আসে। মেয়েটি লিজা। লিজা আন-নাসেরের বাহু ধরে ফেলে বললো– 'এবার নিশ্চিত হয়েছে তো আমি পরী নই– মানুষ?'

'আমার কিছুই বুঝে আসছে না, এসব কী ঘটছে'– আন-নাসের ঝাঝালো কণ্ঠে বললো– 'আমি একজন বন্দি। অথচ আমার সঙ্গে এমন সব আচরণ করা হচ্ছে, যেনো আমি রাজপুত্র!'

'তোমার বিস্ময় যথার্থ'– লিজা বললো– 'একটু বুঝবার চেষ্টা করো। গোমস্তগীন তোমাকে বলে দিয়েছেন, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতা পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি আইউবীর কোন সৈনিককে বন্দি মনে করেন না। তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের সৌভাগ্য যে, তোমরা যখন এখানে এসেছো, গোমস্তগীন এখানে ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ আমার ব্যক্তিসত্ত্বা। তুমি আমার পদমর্যাদা জানো না। আমি তোমার দৃষ্টিতে একটি

দুশ্চরিত্র মেয়ে, যে কিনা রাজা-বাদশাহ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিনোদন কর্মী। আমার ব্যাপারে এসব তোমার ভুল ধারণা এবং কল্পনা মাত্র।' লিজা আন-নাসেরের বাহুটা আরো শক্ত করে ধরে বললো– 'আসো, আমরা এখান থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বসি। আসো, আমি তোমার ভুল শুধরে দিই। তারপরই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর তুমি আমার ব্যাপারে যা খুশি সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

দুর্গের এই অংশটা অতিশয় মনোরম ও আকর্ষণীয়। উন্মুক্ত ময়দান। মধ্যখানে বড় বড় টিলা। আশপাশ সবুজ-শ্যামল। স্থানে স্থানে ফুল গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ। দুর্গটা বেশ প্রশস্ত ও চওড়া। লিজা আন-নাসেরকে কথায় কথায় কক্ষ থেকে দূরে টিলার আড়ালে নিয়ে যায়, যেখানে ফুলের সৌরভ মৌ মৌ করছে। লিজা যখন সেদিকে যাচ্ছিলো, তখন খৃস্টান লোকটি ও থ্রেসা একটি দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি দেখছিলো।

'লিজা লোকটাকে কাবু করে ফেলবে।' খৃস্টান বললো।

'মেয়েটি আবেগপ্রবণ'– থ্রেসা বললো– 'কর্তব্য পালনে ভীত হয়ে তারই কাছে গিয়ে বসেছিলো। তবে অতোটা কাঁচা এবং আনাড়ীও নয়।'

'তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি তোমার প্রতি এত দয়াপরবশ কেনো হয়েছি।' লিজা বললো– 'আমাকে শত্রু মনে করে তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে। তখন আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারিনি যে, শত্রুতা মূলত তোমার ও আমার রাজাদের মাঝে। আমার-তোমার মাঝে শত্রুতার কী কারণ থাকতে পারে?'

'বন্ধুত্বেরই বা কী সূত্র থাকতে পারে?' আন-নাসের বললো।

লিজা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আন-নাসেরের উভয় কাঁধে হাত রেখে বললো– 'তুমি একটা পাথর। আমি শুনেছি, মুসলমানের হৃদয় রেশমের ন্যায় কোমল হয়ে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখো। নিজেকে মুসলমান কিংবা খৃস্টান না ভাবো। আমরা উভয়ে মানুষ। আমাদের বক্ষে হৃদয় আছে। তোমার অন্তরে কি কোনো কামনা, কোনো পছন্দ এবং কোন বস্তুর প্রতি ভালোবাসা নেই? আছে– অবশ্যই আছে। তুমি পুরুষ। তুমি তোমার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। আমি নারী। আমি পারি না। আমার অন্তর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছো। আমরা যখন তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দুর্গে নিয়ে এসেছি, তখন শেখ সান্নান তোমাদেরকে পাতাল কক্ষে আবদ্ধ করে রাখার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তার সেই নির্দেশ পালিত হতো, তাহলে তোমরা সেখান থেকে লাশ হয়ে বের হতে। তোমার ন্যায় সুদর্শন একটি যুবকের এই পরিণতি আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি শেখ সান্নানকে বললাম, এরা তোমার নয়– আমাদের কয়েদি। এরা আমাদেরই হেফাজতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে আমার ও খ্রেসার মাঝে কথা কাটাকাটিও হয়। তিনি এক শর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তিনি বললেন– 'ঠিক আছে, যদি তাদেরকে পাতাল কক্ষ থেকে রক্ষা করতেই চাও, তাহলে তোমরা আমার শয়নকক্ষে এসে পড়ো। আমার অন্তরে বুড়োটার প্রতি ঘৃণা জন্মে যায়। আমি ইতস্তত করলে তিনি বললেন– 'ভিন্ন কোন কথা নেই– হয় তারা পাতাল কক্ষে যাবে, নয়তো তোমরা আমার শয়নকক্ষে আসবে।' আমার গভীরভাবে অনুভূত হলো, যেনো আমি তোমাকে আজ থেকে নয়– শৈশব থেকেই কামনা করছি এবং তোমার খাতিরে 'আমি নিজের দেহ, জীবন ও ইজ্জত সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।'

'তুমি কি তোমার সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছো?' আন-নাসের হঠাৎ চমকে ওঠে জিজ্ঞাসা করে।

'না'– লিজা বললো– 'আমি তাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কালক্ষেপণ করেছি। তিনি আমাকে এই বলে ছেড়ে দিয়েছেন যে, আমরা দুর্গে মুক্ত থাকবো; কিন্তু তার কয়েদি হয়ে থাকবো।'

'আমি তোমার ইজ্জতের হেফাজত করবো'– আন-নাসের বললো।

'তুমি কি আমার ভালোবাসা বরণ করে নিয়েছো?' লিজা সহজ-সরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

আন-নাসের কোন জবাব দেয়নি। খৃস্টান মেয়েরা রূপ-যৌবন ও সুদর্শন প্রতারণার জাল কীভাবে বিছিয়ে থাকে, প্রশিক্ষণে তাকে সে বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু সেসব মৌখিক নির্দেশনা আর বাস্তবতা এক নয়। তাকে তো সেই জাল থেকে আত্মরক্ষার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়। এখন একটি খৃস্টান মেয়ে তেমনি জাল বিছালে আন-নাসেরের ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে মানবীয় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে বসে এবং সেই দুর্বলতা তার বিবেক-বুদ্ধির উপর জয়ী হতে শুরু করে। আন-নাসের পাহাড়-পর্বত ও মরু-বিয়াবানে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করার মতো মানুষ ছিলো। লিজার ন্যায় মনকাড়া মেয়ে কখনো দেখেনি। কোন নারীর রূপ-যৌবন কোনোদিন তাকে আকর্ষণও করেনি। কিন্তু এখন যখন লিজার বিক্ষিপ্ত রেশমকোমল

চুলগুলো তার গন্ডদেশ ছুঁয়ে যাচ্ছে, তখন তার অস্তিত্বে কেমন যেনো একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছে এবং দেহে কেমন একটা কম্পন অনুভূত হচ্ছে।

একাধিকবার দুশমনের তীর আন-নাসেরের দেহ স্পর্শ করে অতিক্রম করেছে। বহুবার শত্রুর বর্শার আগা তার গায়ের চামড়া ছিলে দিয়েছে। কিন্তু তবু সে ভয় পায়নি। দেহ স্পর্শ করে চলে যাওয়া তীর-বর্শা তার দেহের উপর এক সেকেন্ডের জন্যও কম্পন সৃষ্টি করেনি। মৃত্যু কয়েকবার তার দেহ ছুঁয়ে অতিক্রম করেছিলো। কিন্তু তার দেহে সামান্যতম আলোড়নও সৃষ্টি হয়নি। নিজ হাতে লাগানো আগুনের মধ্য দিয়েও অতিক্রম করেছে। কিন্তু এখন একটি মেয়ের চুলের পরশে তার অস্তিত্বে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এই পরশ থেকে বাঁচবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করছে না, যেমন চেষ্টা করতো তীর-বর্শা থেকে আত্মরক্ষার জন্য। ভাব জমাতে জমাতে লিজা যখন তাঁর আরো ঘনিষ্ট হয়, তখনো তার মনে হলো, মেয়েটি এখনো তার থেকে দূরে অবস্থান করছে।

শিকারকে কীভাবে হেপটানাইজ করতে হয়, লিজাকে তার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আন-নাসেরের ক্ষেত্রে সেই বিদ্যা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে লিজা। আন-নাসেরের এমন এক ধরনের পিপাসা অনুভূত হতে শুরু করে, যা মরুভূমির পিপাসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পানি এই পিপাসা নিবারণ করতে পারে না। রাত যতোই গভীর হচ্ছে, আন-নাসের তার আসল পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। প্রথম আন-নাসেরের দেহ কেঁপে ওঠেছিলো। তারপর প্রকম্পিত হয়েছিলো ঈমান। চেতনার ভিত নড়ে ওঠেছিলো।

'হ্যা'– আন-নাসের টলায়মান কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমার ভালোবাসা কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু এর পরিণতি কী হবে? তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে বলবে? এ কথা কি বলবে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করো? বিয়ে করে তোমাকে বউ বানাতে বলবে কি?'

'আমি এসব কিছুই ভাবিনি'– লিজা বললো– 'তুমি যদি আমার সঙ্গ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এবং আজীবনের জন্য আমাকে তোমার জীবনসঙ্গীনি বানিয়ে নিতে চাও, তাহলে আমিই বরং আমার ধর্ম পরিত্যাগ করবো। তুমি আমার থেকে কুরবানী কামনা করো। বিনিময়ে আমাকে তুমি সেই ভালোবাসা দাও, যা অপবিত্র নয়। সাময়িক ভালোবাস তো চাইলেই পাওয়া যায়। আমার আত্মা তোমার স্থায়ী ভালোবাসার প্রত্যাশী।'

প্রেমের নেশা পেয়ে বসেছে আন-নাসেরকে। রাত অর্ধেকেরও বেশি

কেটে গেছে। আন-নাসের জায়গা থেকে উঠতে চাচ্ছে না। লিজা বললো, তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও। ধরা পড়লে পরিণতি ভালো হবে না।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের কক্ষে ফিরে আসে। তার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে বিভোর। সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ঘুম আসছে না। লিজা আপন কক্ষে প্রবেশ করলে থ্রেসার চোখ খুলে যায়।

'এতো দেরি?' থ্রেসা জিজ্ঞাসা করে।

'পাথর এক ফুৎকারে মোম হয়ে যায় নাকি?' লিজা উত্তর দেয়।

'পাথর বেশি শক্ত নয় তো?'

'আমার ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা ছিলো না'– লিজা উত্তর দেয়– 'তবে তূনীরের শেষ তীরটিও আমাকে ছুঁড়তে হয়েছে। সে আমার পুরোপুরি গোলাম হয়ে গেছে।'

'নাকি নিজেই মোম হয়ে এসেছো?' থ্রেসা সংশয় ব্যক্ত করে।

'তাও হতে পারে– লিজা হেসে বললো– 'সুদর্শন সুপুরুষ কিনা। আমাকে অতো সরল মনে করো না। তবে এ ধরনের সহজ-সরল পুরুষ আমার ভালো লাগে, যাদের চরিত্রে কোন ফাঁকিবাজি নেই। হতে পারে লোকটাকে আমার ভালো লাগার কারণ, আমি সাইফুদ্দীনের ন্যায় বৃদ্ধ ও বিলাসী পুরুষদের থেকে অনীহ হয়ে পড়েছি।'

'আন-নাসের থেকেও অনীহ থাকতে হবে'– থ্রেসা বললো– 'প্রেমের ফাঁদকে আরো বেশি যাদুকরী বানাতে হবে। মনে রাখবে, এর দ্বারা ক্রুশের সবচে' বড় শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাতে হবে।'

থ্রেসা লিজাকে আরো কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করে। নতুন দু'-একটি পন্থা শিখিয়ে দু'জনে শুয়ে পড়ে। আন-নাসের এখনো সজাগ। নির্জনে লিজার কথা-বার্তা এবং প্রেম নিবেদনের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করে। তার প্রশিক্ষণের কথা মনে পড়ে যায়, যাতে তাকে খৃস্টান মেয়েদের জাদুময় ফাঁদ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো। লিজা তার কাছে একটি সুদর্শন প্রতারণা বলে মনে হলো। আবার ভাবনা জাগে, না, এটা প্রতারণা নয়– বাস্তব সত্য।

আন-নাসের একজন সুদর্শন সুপুরুষ। নিজের এই গুণ সম্পর্কে সে নিজেও অবহিত। মানবীয় চরিত্রের দুর্বলতাগুলো আন-নাসেরকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলো না। তার দু'চোখের পাতা বুজে আসে। আন-নাসের ঘুমিয়ে পড়ে।

এক ব্যক্তি আন-নাসেরকে জাগিয়ে বললো, থ্রেসা আপনাকে তার কক্ষে যেতে বলেছেন।

নাসের চলে যায়। কক্ষে থ্রেসা একা।

'বসো নাসের!'– থ্রেসা বললো– 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে।'

আন-নাসের লিজার সম্মুখে বসে পড়ে। থ্রেসা বললো– 'আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করবো না, রাতে লিজা তোমাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো, নাকি তুমি তাকে নিয়ে গিয়েছিলে। আমি বলতে চাচ্ছি, এই মেয়েটা অত্যন্ত সরল ও নিষ্পাপ। আমি জানি, সে তোমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি তোমাকে ও তাকে এভাবে রাতভর বাইরে বাইরে থাকার অনুমতি দিতে পারি না। তুমি লিজাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করো না।'

'আমি এমন কোনো চেষ্টা করিনি'– আন-নাসের বললো– 'আমরা কথা বলতে বলতে সামান্য দূরে চলে গিয়েছিলাম।'

'আমি লিজাকে থামাতে পারবো না'– থ্রেসা বললো– 'তোমার থেকে আমি এই আশা রাখি, তুমি তার বয়স, রূপ-যৌবন ও আবেগ থেকে সুযোগ নিতে যেও না।'

'লিজা তোমারই ন্যায় রাজকন্যা'– আন-নাসের বললো– 'আর আমি কয়েদি। আমি একজন তুচ্ছ মানুষ। লিজার ধর্ম এক, আমার আরেক। রাজকন্যা আর কয়েদির মাঝে প্রেম হতে পারে না।'

'তুমি বোধ হয় নারীর সহজাত সম্পর্কে অবহিত নও'– থ্রেসা বললো– 'রাজকন্যা যখন স্বীয় কয়েদিকে মন দিয়ে বসে, তখন তাকে রাজপুত্র মনে করে নিজেকেই তার কয়েদি বানিয়ে নেয়। ভালোবাসা ধর্মের শিকল ছিঁড়ে ফেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। তার একই কথা, আমার জীবন-মরণ দু'-ই আন-নাসেরের জন্য। সে হয়তো বলবে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করো, তাহলে আমি আমার গলা থেকে ক্রুশ খুলে ফেলে দেবো। তুমি জানো না আন-নাসের! লিজা শুধু তোমার খাতিরে শেখ সান্নানকে রুষ্ট করেছে। তিনি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লিজা তার শত্রুতা ক্রয় করে তোমাদেরকে রক্ষা করেছে। সান্নান লিজাকে যে শর্ত দিয়েছেন, তা মেনে নেয়া সেই মেয়ের পক্ষেই সম্ভব, যাকে কারো ভালোবাসা অন্ধ করে তুলেছে। আমরা যদি এই দুর্গ থেকে দ্রুত বের হতে না পারি, তাহলে লিজা সেই শর্ত পালন করতে বাধ্য হবে।'

‘আমি তা হতে দেবো না’– আন-নাসের বললো– ‘লিজার সম্ভ্রমের জন্য আমি মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে প্রস্তুত।’

‘তোমার অন্তরে কি লিজার প্রতি ততোটুকু ভালোবাসা আছে, যতটুকু আছে তোমার প্রতি তার?’

‘লিজা মেয়ে হয়ে যদি আমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে, তাহলে আমি পুরুষ হয়ে পারবো না কেন? আমি লিজাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসি।’

‘তোমার প্রতি আমার একটি মাত্র নিবেদন, তুমি তাকে ধোঁকা দিও না’– থ্রেসা বললো– ‘তুমি আমাদের কয়েদি নও। গোমস্তগীন তোমাকে তাঁর মেহমান মনে করেন।’

লিজার ব্যাপারে আন-নাসেরের মস্তিষ্ক স্বচ্ছ হয়ে যায়। তার হৃদয় লিজার প্রেমে ভরে ওঠে। এই মুহূর্তে লিজাকে এক নজর দেখার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে আন-নাসের। সে থ্রেসাকে জিজ্ঞাসা করে, লিজা কোথায়? থ্রেসা বললো, সারারাত ঘুমায়নি। অন্য কক্ষে শুয়ে আছে।

থ্রেসার তীর লক্ষ্যে আঘাত হানে। সে লিজার যাদুময়তা আন-নাসেরের বিবেকের উপর পুরোপুরি প্রয়োগ করে দেয়। এটাই তার লক্ষ্য। এই মেয়েগুলো সীমাহীন চতুর। এটাই তাদের দীক্ষা। মানবীয় দুর্বলতা নিয়ে খেলতে পারঙ্গম তারা।

আন-নাসের থ্রেসার সম্মুখ থেকে উঠে যায়। এখন সে বাতাসে উড়ছে যেনো। কক্ষে ফিরে গেলে সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিয়েছিলেন? আন-নাসের মিথ্যা জবাব দেয় এবং তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আন-নাসের আপন কর্তব্য থেকে সরে যেতে শুরু করেছে।

খৃস্টান লোকটি গোমস্তগীনের নিকট উপবিষ্ট। গোমস্তগীন তাকে বলেছিলেন, আমি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে এক-দু'দিনের মধ্যে হাররান নিয়ে যেতে চাই। ইত্যবসরে থ্রেসাও এসে পড়ে। সে বললো– ‘গেরিলাদের কমান্ডার আমাদের জালে এসে পড়েছে।’

লিজা কীভাবে আন-নাসেরের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং নিজে কীভাবে তাতে পূর্ণতা দান করেছে, তার বিবরণ দেয়। থ্রেসা বললো– ‘এই লোকটাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন দেখার বিষয় হলো, নিজের আসল পরিচয় ভুলে গিয়ে এ কাজের জন্য প্রস্তুত হতে তার কতো সময়ের প্রয়োজন হবে।’

'আমি এই চারজনকে এক-দু'দিনের মধ্যে হাররান নিয়ে যেতে চাই'– গোমস্তগীন বললেন– 'তোমরা উভয়ে কিংবা শুধু লিজা আমার সঙ্গে যাবে কি? খুনের জন্য আন-নাসেরকে লিজাই প্রস্তুত করতে পারে।'

'মেয়েদেরকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি'– খৃস্টান বললো– 'আমি বেশিদিন থাকতে পারবো না। সম্রাটদেরকে আমার তাড়াতাড়ি সংবাদ পৌঁছাতে হবে, হাল্‌ব, হাররান ও মসুলের ফৌজ সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে এবং সেসব বাহিনীর সালারগণ পলায়ন ছাড়া আর কিছুই জানে না। পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে আমি তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করার জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেবো। হতে পারে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা যে সহায়তা পাচ্ছেন, তা বন্ধ করে দেয়া হবে।'

'এ কথা বলবেন না'– গোমস্তগীন অনুনয়ের সুরে বললেন– 'আমাকে একটি মাত্র সুযোগ দিন। আমি আইউবীকে হত্যা করিয়ে দেবো। তারপর দেখবেন, কীভাবে আমি বিজয়ী বেশে দামেশ্‌ক প্রবেশ করি। এই মেয়ে দু'টোকে কিংবা শুধু লিজাকে আমাকে দিয়ে দিন। মেয়েটা গেরিলাদের কমান্ডারকে মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। সে-ই তাকে প্রস্তুত করবে। আন-নাসের সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে বিনা বাঁধায় যেতে পারবে। আইউবীকে অনায়াসে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব। তাছাড়া চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি লিজাকে নিয়ে যান, তাহলে আন-নাসের আমার কোন কাজের থাকবে না।'

খানিক তর্ক-বিতর্কের পর খৃস্টান বললো– হাররান যাওয়ার পরিবর্তে আমরা এখানেই থাকি। মেয়ে দু'টো আন-নাসেরকে প্রস্তুত করুক। হতে পারে তার সঙ্গী তিনজনকেও প্রস্তুত করে নেয়া যাবে। তাদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।'

'আন-নাসের সম্পর্কে আমার অভিমত হলো, লোকটা অপরিপক্ক মানুষ। লিজা তার বিবেক কব্জা করে নিয়েছে। দু'-তিনটি সাক্ষাতের পরই সে লিজার আঙুলের ইশারায় নাচতে শুরু করবে।'

'আজ তাদের চারজনকেই সঙ্গে বসিয়ে আহার করাও।' খৃস্টান বললো।

খাওয়ার সময় হলে আন-নাসের এবং তার সঙ্গীদেরকেও খাওয়ার কক্ষে ডেকে নেয়া হলো। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে তোলা হলো। এখনো খাবার এনে রাখা হয়নি। শেখ সান্নানের এক চাকর এসে খৃস্টান লোকটিকে বললো, শেখ সান্নান আপনাকে যেতে বলেছেন।

খৃস্টান চলে যায়।

‘ঐ মেয়েটির ব্যাপারে আপনি কী চিন্তা করেছেন?’ শেখ সান্নান জিজ্ঞাসা করে।

‘আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।’ খৃস্টান জবাব দেয়।

‘তোমার যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে আমার কাছে থাকবে।’ সানান বললো।

‘আমি আজই চলে যাবো।’

‘যাও’— শেখ সান্নান বললো— ‘আর মেয়েটিকে এখানে রেখে যাও। তুমি তাকে দুর্গ থেকে বের করতে পারবে না।’

‘সান্নান!’ খৃস্টান বললো— ‘এই দুর্গের প্রতিটি ইট বালিকণা হয়ে যাবে। আমাকে হুমকি দেয়ার দুঃসাহস দেখিও না।’

‘মনে হচ্ছে, তোমার মাথাটা এখনো ঠিক হয়নি’— সান্নান বললো— ‘আজ রাত তুমি নিজে লিজাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর তুমি ইচ্ছে হয় থাকো, ইচ্ছে হয় যাও। এর অন্যথা হলে তুমি যাবে আমার পাতাল কক্ষে আর লিজা আসবে আমার শয়নকক্ষে। যাও, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো।’

খৃস্টান লোকটি খাওয়ার রুমে প্রবেশ করে। সকলে অস্থিরচিত্তে তার অপেক্ষা করছিলো। কক্ষে প্রবেশ করেই লোকটি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতে শুরু করে— ‘বন্ধুগণ! শেখ সান্নান আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, আজ রাত লিজা তার কাছে থাকবে। তিনি এতোটুকুও বলেছেন, মেয়েটাকে আমি নিজে তার কক্ষে দিয়ে আসবো। অন্যথায় আমাকে পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করে লিজাকে ছিনিয়ে নেবেন।’

‘আপনাকে পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করা হবে, আর আমরা বুঝি মরে যাবো!’— আন-নাসের বললো— ‘লিজাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।’

‘মেয়েটা তোমার আবার কী লাগে আন-নাসের?’ আন-নাসেরের এক সঙ্গী জিজ্ঞাসা করে।

‘তোমরা নিজেদেরকে আমাদের কয়েদি ভেবো না’— গোমস্তগীন বললেন— ‘বিপদটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আসছে।’

‘তোমরা আমাদের নয়— শেখ সান্নারের কয়েদি’— খৃস্টান বললো— ‘তোমরা আমাদের সঙ্গ দাও। বাইরে গিয়ে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো। এখন এখান থেকে বের হওয়ার পন্থা খুঁজে বের করো।’

‘শেখ সান্নান আমাকে এই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন’— গোমস্তগীন বললেন— ‘আমি তাদেরকে আজই নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা

তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমাদেরকে সন্ধ্যার অনেক আগেই রওনা হতে হবে।'

গোমস্তগীনের মেজাজটা বেশ চড়া। খাওয়ার মাঝে তিনি সবাইকে তার পরিকল্পনার কথা বলে দেন। আহার শেষে তিনি তার খাদেম ও দেহরক্ষীদের ডেকে বললেন, আমি এক্ষুনি দুর্গ থেকে রওনা হচ্ছি। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র বেঁধে নাও।

তৎক্ষণাৎ কাফেলা প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। গোমস্তগীনের নিজের ঘোড়া ছাড়াও দেহক্ষীদের চারটি ঘোড়া। চারটি উটও আছে, যেগুলোতে খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও তাঁবু বোঝাই করা। সফর দীর্ঘ। তাই সঙ্গে তাঁবু রাখা আছে।

গোমস্তগীন শেখ সান্নানের নিকট গিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি এবং চার গেরিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

সুলতান আইউবীর চার গেরিলার ব্যাপারে গোমস্তগীনের লেন-দেন চূড়ান্ত হয়ে আছে। মূল্য তিনি পরিশোধ করে দিয়েছেন।

'আমার আশা, আমি যে চার ব্যাক্তিতে প্রেরণ করে রেখেছি, তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে শেষ করেই তবে ফিরবে'– শেখ সান্নান বললো– 'তুমি এদের দ্বারা সাইফুদ্দীনকে খুন করাও। তোমরা লড়াই করতে জানো না। তাই শত্রুকে গোপনে হত্যা করা ছাড়া তোমাদের উপায় নেই। ও আচ্ছা, তোমার খৃস্টান বন্ধু আর পরী দু'টি কোথায়?'

'তাদের কক্ষে।' গোমস্তগীন উত্তর দেন।

খৃস্টান মেহমান কি ছোট মেয়েটি সম্পর্কে কিছু বলেনি?'

'হ্যা, শুনলাম তাকে বলছে, আজ রাত তুমি শেখ সান্নানের কাছে থাকো– গোমস্তগীন বললেন– 'লোকটাকে আপনার ভয়ে বেশ ভীত মনে হয়েছে।'

'এখানে বড় বড় প্রতাপশালী লোকও ভয় পেয়ে থাকে'– শেখ সান্নান বললো– 'লোকটা মেয়েটাকে আমার থেকে এমনভাবে লুকাচ্ছিলো, যেনো ও তার কন্যা।'

গোমস্তগীন শেখ সান্নান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কাফেলা প্রস্তুত দন্ডায়মান। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তার দেহরক্ষীরাও ঘোড়ায় চড়ে বসে। দু'জন গোমস্তগীনের সম্মুখে চলে যায়। দু'জন পেছনে। তাদের হাতে বর্শা। ঘোড়ার পেছনে আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা এবং তাদেরপেছনে মাল বোঝাই উটের পাল। দুর্গের ফটক খুলে যায়। কাফেলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায় এবং ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

শেখ সান্নানের আসিয়াত দুর্গ আর গোমস্তগীনের কাফেলার মাঝে দূরত্ব বাড়ছে। আকাশের সূর্যটা দিগন্তের পেছনে চলে যাচ্ছে। এক সময়ে সূর্য অস্তমিত হয়ে কাফেলা ও দুর্গকে লুকিয়ে ফেলে। দুর্গে প্রদীপ জ্বলে ওঠে। পুরোপুরি রাত নেমে এলে শেখ সান্নান দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে– 'খৃস্টান লোকটি মেয়েটিকে নিয়ে আসেনি?' সে 'না' সূচক জবাব পায়। পরপর তিন-চারবার জিজ্ঞাসা করার পরও একই উত্তর মিলে। খাস খাদেমকে ডেকে বললো– 'তুমি গিয়ে খৃস্টান মেহমানকে বলো, যেনো সে ছোট মেয়েটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আসে।'

খাদেম খৃস্টানদের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলোতে প্রবেশ করে। সেখানে কেউ নেই। মেয়ে দু'টোও নেই। সবগুলো কক্ষ শূন্য। সে ওদিক-ওদিক তাকায়। দুর্গের বাগিচায় ঘুরে-ফিরে দেখে। টিলার আশপাশে ঘুরে দেখে। কোথাও কেউ নেই। ফিরে এসে শেখ সান্নানকে জানায়, কাউকে পাওয়া যায়নি– খৃস্টান মেহমান এবং দুই মেয়ে কাউকেই নয়। সান্নান আকাশটা মাথায় তুলে নেয়। বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দেয়, দুর্গের কোণায় কোণায় তল্লাশী চালাও। খৃস্টান লোকটাকে খুঁজে বের করো। বাহিনীতে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। দুর্গের প্রতি ইঞ্চি জায়গায় অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়। সর্বত্র প্রদীপের ও মশালের আলো ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোন স্থান থেকে খৃস্টান লোকটাকে বের করা গেলো না।

শেখ সান্নান ফটকের প্রহরীদের তলব করে। তাদের জিজ্ঞাসা করে, গোমস্তগীনের কাফেলা ব্যতীত আর কার জন্য ফটক খোলা হয়েছে? তারা জানায়, আপনার আদেশ ব্যতীত কারো জন্য ফটক খোলা হয়নি এবং গোমস্তগীন ও তার কাফেলা ব্যতীত আর কেউ বেরও হয়নি। তারা গোমস্তগীনের কাফেলার হিসাব প্রদান করে। রেকর্ডে খৃস্টান লোকটি ও মেয়ে দু'টো নেই।

শেখ সান্নান নিজ কক্ষে ফোঁস ফোঁস করছে।

রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গোমস্তগীনের কাফেলা এগিয়ে চলছে। তিনি এক স্থানে ঘোড়া থামিয়ে উষ্ট্রচালকদের বললেন– 'উটগুলোকে বসাও। ওদেরকে বের করো, আবার মরে যায় না যেনো।'

কাফেলার উটগুলোকে বসিয়ে পিঠ থেকে তাঁবুগুলো নামানো হলো। পুটুলিবাঁধা তাঁবু খোলা হলে সেগুলোর মধ্য থেকে খৃস্টান লোকটি, থ্রেসা ও লিজা বেরিয়ে আসে। ঘামে ভিজে চিপপিপে হয়ে গেছে তারা। গোমস্তগীন তাদেরকে তাঁবুর মধ্যে পেচিয়ে পুটুলির মতো বেঁধে আসিয়াত দুর্গ থেকে বের করে এনেছেন।

এখন তারা দুর্গ থেকে বহুদূর চলে এসেছে। ফেদায়ীদের ব্যাপারে কোন আশংকা নেই। তারা মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি বরণ করে না। তথাপি গোমস্তগীন কাফেলাকে যাত্রাবিরতি দেয়ার সুযোগ দেননি। মেয়ে দু'টোকে উটের পিঠে বসিয়ে দেয়া হলো। খৃস্টান লোকটি গেরিলাদের সঙ্গে পায়ে হাঁটছে। তার ও মেয়েদের ঘোড়া দুর্গে রয়ে গেছে। খৃস্টান এই অঞ্চলের ভাষা অনর্গল বলতে পারে। সে আন-নাসেরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে ,যাতে বন্ধুত্ব-ভালোবাসার রং-ই প্রবল। আন-নাসেরের মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। লিজাকে কাছে পাওয়াই এখন তার একমাত্র কাম্য।

মধ্যরাতের পর অবস্থানের জন্য কাফেলা এক স্থানে থেমে গেলে এই সুযোগটা হাতে আসে। গোমস্তগীনের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। অন্য সকলের জন্য আলাদা আলাদা তাঁবু দাঁড় করানো হয়। চার গেরিলা, গোমস্তগীনের দেহরক্ষী ও অন্যান্যরা খোলা আকাশের নীচে শুয়ে পড়ে। তারা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে ঘুম এসে যায়।

আন-নাসেরের ঘুম আসছে না। সে ভাবছে, লিজাকে তাবু থেকে ডেকে আনতে হবে নাকি সে নিজেই এসে যাবে। আন-নাসের ভুলে গেছে, সে সুলতান আইউবীর গেরিলা সৈনিক এবং তার বাহিনী কোন এক স্থানে যুদ্ধ করছে। তার মাথায় এই ভাবনাটাও জাগেনি যে, তাকে ফৌজে ফিরে যেতে হবে এবং পলায়নের এটাই মোক্ষম সুযোগ। এখন সবাই অচেতনের ন্যায় ঘুমিয়ে আছে। অস্ত্রও আছে। খাদ্য-পানীয় আছে। তার সঙ্গীরা তারই উপর নির্ভর করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা তো তাদের কমান্ডারের নির্দেশনা মান্য করতে বাধ্য। তাদের জানা নেই, তাদের কমান্ডার নিজের বিবেক, ঈমান ও চেতনা এক যুবতীর হাতে তুলে দিয়েছে। এক নারী চরম এক বিধ্বংসী পরিকল্পনা নিয়ে তার বিবেক কব্জা করে নিয়েছে।

আন-নাসের একটি ছায়া এগিয়ে আসছে দেখতে পায়। ছায়াটা তারই দিকে আসছে। খানিক পর দু'টি ছায়া পরস্পর একাকার হয়ে যায়।

লিজা আন-নাসেরকে ঘুমন্ত কাফেলার মধ্য থেকে তুলে সামান্য দূরে একটি টিলার আড়ালে নিয়ে যায়। মেয়েটিকে আজ পূর্বাপেক্ষা বেশি আবেগময় মনে হলো। আন-নাসের পাগলের মতো হয়ে যায়—প্রেমপাগল। লিজা তার আবেগের প্রকাশ উচ্চারণের চেয়ে আচরণ দ্বারা বেশি করছে। হঠাৎ সে সামান্য দূরে গিয়ে বলে ওঠলো— 'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও নাসের! তোমার জীবনে কখনো কোন নারী প্রবেশ করেছে কি?'

'মা এবং বোন ব্যতীত আমি কখনো কোন নারীর ছোয়া পাইনি'– আন-নাসের উত্তর দেয়– 'যৌবনের শুরুতেই আমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর ফৌজে ঢুকে গিয়েছিলাম। অতীতের উপর চোখ বুলালে আমি নিজেকে যুদ্ধের ময়দানে, বালুকাময় প্রান্তরে এবং সঙ্গীদের থেকে দূরে শত্রুর এলাকায় রক্ত ঝরাতে এবং ব্যাঘ্রর ন্যায় শিকারের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি দেখতে পাই। আমি যখন যেখানে ছিলাম, কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিনি। কর্তব্যবোধ আমার ঈমানের অংশ।'

হঠাৎ আন-নাসেরের দেহটা ঝাকুনি দিয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো– 'লিজা! তুমি বোধ হয় আমার ঈমানের ভিত টলিয়ে দিয়েছো। বলো, তোমরা আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'তার আগে বলো, তোমার হৃদয়ে আমার ভালোবাসা আছে, নাকি আমাকে দেখে তুমি পশু হয়ে যাও?' লিজা এমন এক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, যাতে ভালোবাসা এবং রসিকতার বাষ্পও নেই। তার বলার ধরনটা গত রাতের তুলনায় এখন ভিন্ন।

'তুমি বলেছিলে, আমি ভালোবাসাকে যেনো অপবিত্র না করি'– আন-নাসের বললো– আমি প্রমাণ দেবো, আমি পশু নই। তুমি আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক সুশ্রী, বীর যোদ্ধা, সুঠামদেহী ও মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ আছে। তুমি কোনো রাজার দরবারে ঢুকে পড়লে তিনি সিংহাসন থেকে নেমে এসে তোমাকে স্বাগত জানাবেন। তারপরও তুমি আমার মধ্যে কী দেখেছো?

লিজার মুখে কোন উত্তর নেই। আন-নাসের মেয়েটার কাঁধে হাতে রেখে বললো– 'উত্তর দাও লিজা!' লিজা মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে দেয়। আন-নাসের তার হেঁচকি শুনতে পায়। সে অস্থির হয়ে ওঠে। বার বার জিজ্ঞেস করে, কাঁদছো কেনো লিজা! কিন্তু লিজা কাঁদতেই থাকে। আন-নাসের স্বস্নেহে তাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে। লিজা তার মাথাটা আন-নাসেরের বুকের উপর রেখে দেয়। আন-নাসের বুঝতে পারেনি, যেভাবে তার ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে মানবীয় দুর্বলতা জেগে ওঠে তার বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, তেমিন লিজাও একটি দুর্বলতার কবলে পড়ে গেছে। এ সেই দুর্বলতা, যা একজন রাণীকে তার ক্রীতদাসের সম্মুখে অবনত করে তোলে এবং যার কারণে সম্পদের প্রাচুর্যকে পাথরের স্তূপ জ্ঞান করে হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য মানুষ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

লিজা ভালোবাসার পিয়াসী– সেই ভালোবাসা, যা আত্মাকে প্রশান্ত করে

দেবে। দৈহিক ভালোবাসা পেয়েছে লিজা এবং পেয়েছে সেই পুরুষরে থেকে, যাদের প্রতি তার ঘৃণা ছিলো। আসিয়াত দুর্গে যাওয়ার সময় এবং দুর্গে পৌঁছেও সে থ্রেসার কাছে তার এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলো। তখন কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে আন-নাসেরের কাছে গিয়ে বসেছিলো এবং বলেছিলো– 'আমার উপর ভরসা রাখো।'

সেসময় তার মনে কোন প্রতারণার পরিকল্পনা ছিলো না। সেটা ছিলো তার হৃদয়ের আওয়াজ। তখন সে তার আত্মার নির্দেশনায় আন-নাসেরের কাছে চলে গিয়েছিলো। থ্রেসা যদি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেতো, তাহলে না জানি মেয়েটি আরো কতো কথা বলতো। পরে তাকে আন-নাসেরকে জালে আটকানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। একাজে পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেছে সে। কিন্তু মন তার সঙ্গ দিচ্ছিলো না। এখন কর্তব্য আর হৃদয়ের মাঝে ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে লিজা।

আন-নাসের জানে না, কাফেলা অবতরণ করে এখানে তাঁবু স্থাপনের সময় গোমস্তগীন লিজাকে কানে কানে বলেছিলেন– 'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার তাঁবুতে চলে এসো। আমি তোমাকে তোমার জাতির প্রেরিত উন্নত মদ পান করাবো। আমি বড় কৌশলে তোমাকে শেখ সান্নানের কবল থেকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছি।'

লিজা গোমস্তগীনকে কোন উত্তর দেয়নি। তার নিকট থেকে সরে এলে খৃস্টান তাকে বললো– 'খোদা তোমাকে এই বৃদ্ধ হায়েনাটার পাঞ্জা থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন। থ্রেসা ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার তাঁবুতে চলে আসবে; ফূর্তি করবো।'

লিজার নিজের রূপ-যৌবন আর দেহটার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে। সে নিজের তাঁবুতে চলে যায় থ্রেসা ঘুমিয়ে পড়ে। লিজার দু'চোখের পাতা এক হয় না। সে শয্যা থেকে উঠে পা টিপে টিপে আন-নাসেরের দিকে হাঁটা দেয়। আন-নাসেরও তারই অপেক্ষায় জেগে আছে।

লিজা আন-নাসেরের পার্শ্বে উপবিষ্ট। হঠাৎ আন-নাসের চমকে ওঠে বললো– 'দেখো তো কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছো নাকি? ঘোড়া আসছে!'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি'– লিজা বললো– 'সকলকে জাগিয়ে দাও। শেখ সান্নান আমাদের ধরার জন্য সৈন্য পাঠাতে পারে!'

আন-নাসের দৌড়ে টিলার উপর উঠে যায়। সে অনেকগুলো প্রদীপ দেখতে পায়। সেগুলো ধাবমান অশ্বের চলনের সাথে সাথে উপর-নীচ

হচ্ছে। ঘোড়ার পদশব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। আন-নাসের দৌড়ে নীচে নেমে আসে। লিজাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমন্ত কাফেলার দিকে ছুটে যায়। সকলকে জাগিয়ে তোলে। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে টিলার নিকটে চলে যায়। লিজাকে সঙ্গে রাখে। সকলের হাতে বর্শা ও তরবারী আছে। গোমস্তগীনের দেহরক্ষী এবং উষ্ট্রচালকরাও বর্শা-তরবারী হাতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

তারা পনের-ষোলজন। অশ্বারোহী। ছয়-সাতজনের হাতে প্রদীপ। এসেই তারা গোমস্তগীনের কাফেলাটি ঘিরে ফেলে। একজন হুংকার দিয়ে বললো– 'মেয়ে দু'টোকে আমাদের হাতে তুলে দাও। শেখ সান্নান বলেছেন, মেয়েদেরকে দিয়ে দিলে তোমরা নিরাপদে চলে যেতে পারবে।'

আন-নাসের অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। সে তার সঙ্গীদের আগেই সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। তিন সঙ্গীকে নিয়ে সে হামলাকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা পেছন দিক থেকে সম্মুখের আরোহীদের উপর বর্শার আঘাত হানে। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আরোহীরা মাটিতে পড়ে যায়। আন-নাসের চীৎকার করে তার সঙ্গীদের বললো– এদের ঘোড়াগুলের পিঠে চড়ে বসো। নিজে একটি ঘোড়া ধরে তাতে চড়ে বসে এবং লিজাকে পিছনে বসিয়ে নেয়। লিজা আন-নাসেরের কোমর শক্ত করে ধরে বসে থাকে।

সান্নানের ফেদায়ীরা এলোপাতাড়ি আক্রমণ শুরু করে। তারা হাতের প্রদীপগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রদীপগুলো জ্বলতে থাকে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যথাসাধ্য মোকাবেলা করে। একটি ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দ কানে আসে, যা দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। ঘোড়ার আরোহী গোমস্তগীন, যিনি নিজের জীবন রক্ষা করে পালিয়ে যাচ্ছেন। ফেদায়ীরা আন-নাসেরের ঘোড়ার পিঠে লিজাকে দেখে ফেলে। তারা মেয়েটাকে জীবিত ধরে ফেলার চেষ্টা করছে। তিন-চারটি ঘোড়া তাকে ঘিরে ফেলেছে এবং ঘোড়াটাকে আহত করার জন্য বর্শা দ্বারা আঘাত করছে। আন-নাসের অভিজ্ঞ যোদ্ধা। সে ঘোড়াটাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দু'জন ফেদায়ীকে ফেলে দেয়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। দ্রুততার সাথে ঘোড়ার মোড় ঘোরানোর কারণে লিজা পা রেকাবে রাখতে পারছে না। হঠাৎ করে আন-নাসের ঘোড়ার মোড় ঘোরালে লিজা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যায়।

ফেদায়ীরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে। লিজা উঠে আন-নাসেরের দিকে দৌড় দেয়। কিন্তু দু'জন ফেদায়ী তাকে ধরে ফেলে। আন-নাসের ঘোড়া

হাঁকায় এবং বর্শা দ্বারা আঘাত হানতে উদ্যত হয়। ফেদায়ীরা ঢালস্বরূপ লিজাকে সম্মুখে এনে ধরে।

আন-নাসের তাঁর সঙ্গীদের কোন খোঁজ জানে না। ধাবমান ও পলায়নপর ঘোড়া এবং তরবারী ও বর্শার সংঘর্ষের শব্দ কানে আসছে তার। তিন-চারজন ফেদায়ীর মোকাবেলায় আন-নাসের একা। প্রতিটি আঘাতই ব্যর্থ যাচ্ছে তার। কারণ, সে আঘাত হানলেই ফেদায়ীরা লিজাকে ঢাল হিসেবে সম্মুখে এগিয়ে ধরে। অবশেষে সেও ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। প্রাণপণ লড়াই করে। নিজে আহত হয় এবং দুই ফেদায়ীকে আহত করে ফেলে দেয়। এমনি অবস্থায় লিজা চীৎকার দিয়ে বলতে থাকে– 'নাসের! তুমি বেরিয়ে যাও। তুমি একা।' কিন্তু আন-নাসের দিক-দিশা হারিয়ে ফেলেছে যেনো। সেও চীৎকার করে বলে ওঠে– 'চুপ থাকো লিজা! এরা তোমাকে নিতে পারবে না।'

আন-নাসের তাঁর ঘোষণা সত্যে প্রমাণিত করে দেখায় যে, ফেদায়ীরা লিজাকে নিতে পারেনি। সে ফেদায়ীদেরকে গুরুতর জখম করে অবস্থা শোচনীয় করে তোলে।

এই যুদ্ধ লড়তে গিয়ে আন-নাসের কাফেলার অবস্থান থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো। সে একটি ঘোড়া ধরে লিজাকে তার উপর বসিয়ে ঘোড়া হাঁকায়। কিন্তু পলায়ন করেনি। রণাঙ্গন এখন নীরব। আন-নাসের নিকটে গিয়ে দেখে। ওখানে কয়েকটি লাশ পড়ে আছে এবং দু'-তিনজন ফেদায়ী আহত হয়ে ছটফট করছে। তার সঙ্গী তিনজন মারা গেছে। খৃস্টান লোকটিরও লাশ পড়ে আছে। থ্রেসা নিখোঁজ। আন-নাসের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি। সে আকাশের পানে তাকায়। ধ্রুবতারা দেখে দিক নির্ণয় করে ঘোড়া হাঁকায়। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে সে ঘোড়ার গতি থামায়।

'এবার বলো তুমি কোথায় যেতে চাও?'– আন-নাসের লিজাকে জিজ্ঞাসা করে– একটি অসহায় মেয়ে বিবেচনা করে আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই না। যদি বলো, তাহলে আমি তোমাকে তোমার এলাকায় পৌঁছিয়ে দেবো। তাতে যদি আমি বন্দিও হই, পরোয়া করবো না। তুমি আমার আমানত।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও'– লিজা বললো– 'আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে যাও আন-নাসের!'

ঘোড়া রাতভর চলতে থাকে। রাত পোহাবার পর আন-নাসের এলাকা চিনতে পারে। এ অঞ্চলেরই কোন এক স্থানে সে নিজ বাহিনীর সঙ্গে

গেরিলা হামলা করেছিলো। এখানে মাটির টিলা ও বড় বড় পাথর আছে। চলতে চলতে সে একটি কূপের নিকট গিয়ে উপনীত হয়। কূপটি একটি টিলার পাদদেশে অবস্থিত। আন-নাসের নিজের জখম দেখে। কোনো জখমই গুরুতর নয়। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় রক্ষক্ষরণ শুরু হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে জখম ধৌত করলো না। এই ফাঁকে লিজা হাঁটতে হাঁটতে এক দিকে চলে যায়। আন-নাসের তাকে টিলার অপর প্রান্ত থেকে খুঁজে বের করে। সেখানে গিয়ে লিজা বসে পড়ে। তার পিঠটা আন-নাসেরের দিকে। সেখানে অনেক হাড়-গোড় ছড়িয়ে আছে, যেগুলো মানুষের হাড় বলে মনে হলো। আছে অনেক খুলিও। আছে কংকাল। হাত-পা ও বাহুর হাড়। সেগুলোর মাঝে পড়ে আছে তরবারী ও বর্শা।

লিজা একটি খুলিকে সামনে নিয়ে বসে আছে। কোন এক নারীর খুলি বলে মনে হচ্ছে। মুখমন্ডলে কোথাও কোথাও চামড়া আছে। মাথার দীঘল চুলগুলোর কিছু এখনো মাথার সঙ্গে আঁটা আছে। অবশিষ্টগুলো এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। বুকের খাচায় চামড়া নেই। পাজরে একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। গলার হাড়ে একটি সোনার হার লেপ্টে আছে। লিজা একদৃষ্টে খুলিটার দিকে তাকিয়ে আছে।

আন-নাসের ধীরপায়ে লিজার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ লিজা তার উভয় হাত কানের উপর রেখে সজোরে একটা চীৎকার দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে উঠে মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। আন-নাসের তাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেয়। লিজা তার মুখটা আন-নাসেরের বুকে লুকিয়ে ফেলে। শরীরটা তার থর থর করে কাঁপছে। আন-নাসের তাকে কূপের নিকট নিয়ে যায়।

লিজার চৈতন্য ফিরে আসার পর আন-নাসের জিজ্ঞাসা করে, তুমি চীৎকার দিলে কেন?

'স্বচক্ষে নিজরে পরিণতি দেখে'– লিজা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো– 'তুমি নিশ্চয় সেই শুষ্ক লাশটা দেখে থাকবে– কোনো এক নারীর লাশ। আমার মতো কেউ হবে। সেও আমার ন্যায় রূপের যাদু প্রয়োগ করেছিলো। যে কোন পুরুষের প্রতারণার একটি ফাঁদ ছিলো। বিশ্বাস ছিলো, তার এই রূপ কখনো নিঃশেষ হবে না। এই তরতাজা যৌবন আজীবন টাটকাই থাকবে। তার পাজরের খাচায় খঞ্জর বিদ্ধ দেখেছো? গলায় হার দেখেছো? এই হার

ও খঞ্জর যে কাহিনী শোনাচ্ছে, তা আমারই কাহিনী। অন্য যেসব খুলি আর তাদের সঙ্গে পড়ে থাকা তরবারী-বর্শা পড়ে আছে, সেসব আমাকে শতবার শোনা কাহিনী ব্যক্ত করছে। সেসব কাহিনী আমি কখনো মনোযোগ সহকারে শুনিনি। আজ এই নারীর মাথার খুলি দেখে আমার মনে হলো, যেনো এটি আমার খুলি। শুষ্ক এই খুলিটায় গোশত চড়ানো হলে তা আমার চেহারা হয়ে যাবে। আমি একটি শকুনকে দেখেছি আমার চোখ দু'টো খুলে ফেলছে। একটি সিংহকে দেখেছি, যে আমার গোলাপী গন্ডদেশ খাবলে খাবলে খাচ্ছে। ঐ হায়েনাগুলো আমার মুখমন্ডলটা খেয়ে ফেলেছে। এখন শুধু খুলিটা পড়ে আছে। আমি দেখতে পেলাম, আমার চোয়াল আর ভয়ানক দাঁতগুলো নড়ছে। আমার কানে শব্দ ভেসে আসে– 'এই হলো তোমার পরিণতি।' তারপর আমার হৃদয়টাকে একটি ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরেছে।'

'ফেদায়ীরা যেখানে আমাদের উপর আক্রমণ করেছিলো, কয়েকদিন পর সেখানে গিয়ে দেখো'– আন-নাসের বললেন– 'সেখানেও তুমি এ দৃশ্যই দেখতে পাবে। লাশের কংকাল, মাথার খুলি, তরবারী ও বর্শা এবং সম্ভবত তাদের থেকে খানিক দূরে থ্রেসার খুলিও পড়ে আছে দেখবে। তার বুকেও খঞ্জর বিদ্ধ থাকবে। তারা সকলে নারীর জন্য মরেছে। এরাও নারীর জন্যই মরেছে।'

'আমি যদি আমার নীতি পরিবর্তন না করি, তাহলে নিজের যে দেহটা নিয়ে আমি আজ গৌরব করছি, যার প্রাপ্তির জন্য কেউ জীবনের নজরানা পেশ করছে, কেউ সম্পদ পেশ করছে, শৃগাল-শকুনরা একদিন মরুভূমিতে এমনি সেই দেহের গোশতও খাবলে খাবে'– লিজা বললো– কিন্তু মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না, নিজেদের ধ্বংস চোখে দেখে না। আমি নিজেকে চিনে ফেলেছি। লিজার আসল পরিচয় পেয়ে গেছি। তুমিও শুনে নাও আন-নাসের! খোদা তোমাকে পুরুষের শক্তি ও পুরোষিত সৌন্দর্য দান করেছেন। যে নারীই দেখবে, সে-ই তোমার নিকটে আসবার আকাংখা ব্যাক্ত করবে। যাও, দেখে আসো, তুমিও তোমার পরিণতি দেখো আসো।'

লিজা এমন ভঙ্গিতে বলছিলো, যেনো তার উপর প্রেতাত্মা ভর করেছে। তার সব চতুরতা ও প্রতারণা-ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে গেছে। এখন একজন দুনিয়াত্যাগী সূফী-দরবেশের ন্যায় কথা বলছে লিজা।

'আমি কি তোমাকে আমার আসল পরিচয় বলে দেবো?'– লিজা আন-নাসেরকে জিজ্ঞাসা করে– 'আমি কি তোমাকে দেখিয়ে দেবো, আমার

পাজরের খাচায় কী আছে?' মেয়েটি তার বুখে হাত মারে এবং চুপ হয়ে যায়। হাতটা তার সোনার হারের উপর গিয়ে পড়ে, যাতে হীরার মিশ্রণও আছে। সে হারটা মুঠি করে ধরে সজোরে টান দেয়। ছিঁড়ে হারটা হাতে চলে আসে। লিজা হারটা কূপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। হাতের আঙুল থেকে হীরার আংটিগুলো খুলে ফেলে। এগুলোও কূপে ছুড়ে ফেলে লিজা। তারপর বলতে শুরু করে- 'আমি একটি প্রতারক ছিলাম আন-নাসের! আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসাও জন্ম নিয়েছিলো। কিন্তু তার উপর আমার কর্তব্যের প্রেতাত্মারও প্রভাব ছিলো। ফেদায়ীরা আমাদের উপর হামলা করে খুবই ভালো করেছে। তার চেয়েও ভালো হয়েছে, আমি জীবদ্দশায়ই নিজের মাথার খুলি দেখে নিয়েছি। অন্যথায় আমি বলতে পারতাম না, আমরা তোমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে তোমাদের পরিণতি কী ঘটতো! আমার ভালোবাসার শেষ ফল কী দাঁড়াতো! তুমি ভয়াবহ একটি প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছিলে। আজ আমি মিথ্যা বলবো না। তোমাদের নিয়ে পরিকল্পনা ছিলো, আমি আমার রূপ ও প্রেমের ফাঁদে ফেলে তোমার বিবেক কব্জা করে নেবো এবং তোমাদের হাতে তোমাদেরই রাজা সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাবো।' গোমস্তগীন আসিয়াত দুর্গে এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, যেনো শেখ সান্নান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য তাকে কয়েকজন ঘাতক প্রদান করেন। সান্নান বলেছেন, তিনি চারজন ফেদায়ী প্রেরণ করে রেখেছেন। তারাও যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ভবিষ্যতে এ কাজের জন্য আর তিনি লোক প্রেরণ করবেন না। কেননা, এই মিশনে তিনি তার অনেক দক্ষ ও মূল্যবান ফেদায়ী খুইয়ে ফেলেছেন। শেষে লেনদেনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, গোমস্তগীন তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে নিয়ে যাবেন এবং সাইফুদ্দীনকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের অফিসার এসে পড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাই বেশি জরুরি।'

আমার পক্ষে এটুকুও সম্ভব হবে না যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ছায়াকে বক্র চোখে দেখবো- আন-নাসের বললো- 'পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে এমন নির্বোধ বানাতে পারবে না।'

লিজা হেসে ওঠে। বলতে শুরু করে- 'আমি যে দায়িত্ব পালন করছিলাম, তার প্রতি আমার মন ছিলো না। অন্যথায় আমি সীসাকেও পানিতে পরিণত করতে জানি।'

লিজা আন-নাসেরকে অবহিত করে তার কর্তব্য আর চেতনার মাঝে কতোখানি পার্থক্য। সে জানায়, 'আমি সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার ন্যায় একটি অপবিত্র মেয়েকে বরণ করে নেবে কি? আমি সত্যমনে ইসলাম গ্রহণ করবো।'

'তুমি যদি সত্যমনে ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তাহলে তোমাকে বরণ না করা আমার জন্য পাপ হবে'– আন-নাসের বললো– 'কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অনুমতি ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।'

'তুমি শান্ত হও। মন থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা ফেলে দাও। তুমি যদি পবিত্র জীবন লাভ করতে চাও, তাহলে এমন জীবন একমাত্র আমাদের ধর্মেই পাবে।' আন-নাসের জিজ্ঞাসা করে– 'তোমার কি জানা আছে, যে চারজন ফেদায়ী সুলতান আইউবীকে হত্যার উদ্দেশ্যে গেছে, তারা কোন্ বেশে গেছে এবং সংহারী আক্রমণ কোন্ পন্থায় করবে?'

'না, জানি না'– লিজা উত্তর দেয়– 'আমার উপস্থিতিতে শুধু এটুকু কথা হয়েছে যে, চারজন ফেদায়ী পাঠানো হয়েছে।'

আমাদেরকে উড়ে তুর্কমান পৌঁছতে হবে'– আন-নাসের বললো– 'সুলতান এবং তাঁর দেহরক্ষীদেরকে সতর্ক করতে হবে।'

আন-নাসের লিজাকে পেছনে বসিয়ে ঘোড়া হাঁকায়। একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে তার বুকের সঙ্গে লেগে আছে। মেয়েটির রেশমকোমল চুলগুলো তার গন্ডদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে। কিন্তু মস্তিষ্কে তার সুলতান আইউবী। কর্তব্যবোধ লোকটার আবেগ– স্পৃহাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। পবিত্র একটি লক্ষ তাকে রণাঙ্গনের পুরুষ এবং পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করেছে। একটি সুন্দরী অসহায় যুবতী হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও তার এই অনুভূতিটুকু যেনো নেই যে, সে পুরুষ এবং তার মধ্যে যৌনতা আছে। একজন খ্যাতিমান বক্তা যদি কয়েক বছরও ওয়াজ করে শোনাতেন, তা লিজার উপর ক্রিয়া করতে না। কিন্তু আন-নাসের ছোট্ট একটি বাক্যে তার হৃদয়ে এই বাস্তবতাকে প্রোথিত করে দিয়েছেন যে, পবিত্র জীবন যাপন করতে চাইলে তাকে ইসলামের ছায়াতলেই আশ্রয় নিতে হবে।

এজাজ দুর্গের অধিপতির জবাব সুলতান আইউবীকে অগ্নিশর্মা করে তোলে। এই দুর্গটা তাঁকে জয় করতেই হবে এবং এক্ষুনি হাল্‌ব অবরোধ করে নগরীটা দখল করে নিতে হবে। তিনি মাম্বাজ ও বুযার দুর্গ দু'টি যুদ্ধ

ছাড়াই পেয়ে গেছেন। সে গুলোতে যেসব সৈন্য ছিলো– তাদেরকে নিজ বাহিনীতে যুক্ত করে তাদের স্থলে আপন বাহিনী মোতায়েন করেছেন। এখন তিনি এজাজ ও হাল্‌বের উদ্দেশ্যে অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। যে স্থান দু'টো অবরোধ করবেন, খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে রেখেছেন। গোয়েন্দারা তাঁকে হাল্‌ব ও এজাজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছে। সুলতান আইউবী নিজেও ঘুরে-ফিরে এবং সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে স্বচক্ষে পরিস্থিতি অবলোকন করতেন। এ জাতীয় ভ্রমণের সময় তিনি সঙ্গে পতাক রাখতেন না এবং দেহরক্ষীদেরও সঙ্গে নিতেন না, যাতে দুশমন চিনতে না পারে ইনি সালাহুদ্দীন আইউবী। এ সময় তিনি অন্যের ঘোড়া ব্যবহার করতেন। দুশমনের প্রধান সেনাপতি তাঁর ঘোড়াটা চিনে।

দেহরক্ষী ছাড়া এভাবে দূরে যেতে তাঁকে বারণ করা হতো। কিন্তু তাঁর নিজের নিরাপত্তার কোনোই পরোয়া ছিলো না। এখনো তিনি পুরোপরি ক্ষিপ্ত। তিনি তাঁর মুসলমান দুশমনকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। তাদের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকার কাজটা বাকি আছে শুধু। এলাকাটি এমন যে, কোথাও টিলা-পর্বত কোথাও ঝোপালো গাছ-গাছালি। কোথাওবা গভীর খানা-খন্দক। এমন একটি অঞ্চলে রক্ষী বাহিনীর পাহারা ব্যতীত ঘোরা-ফেরা করা সুলতান আইউবীর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

'সুলতানে মুহতারাম!'– আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ একদিন তাঁকে বললেন– 'আল্লাহ না করুন আপনার উপর পরিচালিত কোন সংহারী আক্রমণ যদি সফলই হয়ে যায়, তাহলে সালতানাতে ইসলামিয়া আপনার ন্যায় আর কোনো মর্দে মুমিন জন্ম দিতে পারবে না। আমরা জাতিকে মুখ দেখাতে পারবো না। অনাগত প্রজন্ম আমাদের কবরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে যে, আমরা আপনাকে রক্ষা করতে পারিনি।'

'আল্লাহর এটাই যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, কোনো ফেদায়ী কিংবা ক্রুসেডারের হাতে আমার মৃত্যু হবে, তা হলে এমন মৃত্যুকে আমি কীভাবে প্রতিহত করতে পারি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'রাজা যখন আপন জীবনের হেফাজত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন আর তিনি দেশ ও জাতির মর্যাদা হেফাজতের যোগ্য থাকেন না। আমি যদি খুনই হতে হয়, তাহলে আমাকে তাড়াতাড়ি দায়িত্ব পালন করে ফেলতে দাও। তোমরা আমাকে রক্ষীদের

কয়েদিতে পরিণত করো না। আমার উপর রাজত্বের নেশা সৃষ্টি করো না। তুমি তো জানো, আমার উপর কতোবার সংহারী আক্রমণ হয়েছে। প্রতিবারই আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। এখনো রক্ষা করবেন।'

সুলতান আইউবীর ব্যক্তিগত আমলারা সর্বদা তাঁর নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকতো। তাঁর উপর পরিচালিত প্রতিটি হামলার সময়ই তিনি একাকি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রক্ষীসেনারা নিকটেই ছিলো। প্রতিবারই তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলো।

এখন তিনি পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, ব্যক্তিগত আমলা ও রক্ষীদের কোনো এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে টিলা ও পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তারপরও হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, রক্ষী বাহিনীর কতক সদস্য দূরে দূরে থেকে সুলতানের উপর দৃষ্টি রাখছে। কিন্তু কেউ জানে না, দীর্ঘদিন যাবত চারজন লোক এই বিজন ভূমিতে ঘোরাফেরা করছে এবং সুলতান আইউবীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

এরাই সেই চার ফেদায়ী, যাদের সম্পর্কে আসিয়াত দুর্গে শেখ সান্নান গোমস্তগীনকে বলেছিলো, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য আমি চারজন ফেদায়ীকে প্রেরণ করেছি।

শেখ সান্নানের এই চার ঘাতক সদস্য জেনে ফেলেছে, সুলতান আইউবী রক্ষী বাহিনী ছাড়া ঘোরাফেরা করে থাকেন। তাদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা যুদ্ধকবলিত অঞ্চলের উদ্বাস্তুর বেশে সুলতান আইউবীর নিকট যাবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু আইউবীর নিরাপত্তাবিহীন চলাফেলার তথ্য জেনে তারা পূর্বেকার এই পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে।

সুলতান আইউবী ঘাতকদের বড় মোক্ষম সুযোগ দিয়ে চলছেন। চার ঘাতকের পরিকল্পনা যথাযথ। কিন্তু তারা তীর-ধনুক সঙ্গে নিয়ে আসেনি। থাকলে তাদের ধরা পড়ার আশংকা ছিলো। যদি একটি তীর আর ধনুক থাকতো, তাহলে কোনো এক স্থানে বসেই তারা সুলতান আইউবীকে নিশানা বানাতে পারতো। এলাকাটায় লুকিয়ে থাকার জায়গা অনেক। কাজ সমাপ্ত করে অনায়াসে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগও আছে। তাদের সঙ্গে আছে লম্বা খঞ্জর।

ওদিক থেকে আন-নাসের লিজাকে নিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। লিজা আন-নাসেরকে বলে দিয়েছিলো, চারজন ফেদায়ী সুলতান আইউবীকে হত্যা করতে গেছে। আন-নাসের অতি দ্রুত সুলতান

আইউবীর নিকট পৌঁছাতে এবং তাঁকে সতর্ক করতে চাচ্ছে। কিন্তু সফর ছিলো দীর্ঘ। ঘোড়ার পিঠে দু'জন আরোহীর বোঝা। এতো দ্রুত পথ অতিক্রম করা ঘোড়ার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথে তিনি ঘোড়াকে বিশ্রাম দেন এবং পানি পান করিয়ে আবার ছুটতে শুরু করেন।

সুলতান আইউবী নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। চার ঘাতক লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখছে। এই অঞ্চলে কোন বাহিনী নেই। নেই কোন বসতিও। ফেদায়ীরা বনের হিংস্র পশুর ন্যায় দিনভর শিকারের সন্ধান করে ফিরছে আর রাতে সেখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকছে।

সূর্য অস্ত গেছে। আন-নাসের ও লিজার ঘোড়া এগিয়ে চলছে। কিন্তু গতি তার কমে গেছে এবং ক্রমান্বয়ে কমছে। আন-নাসের ওজন কমানোর জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। রাত কেটে যাচ্ছে। লিজা কয়েকবার বলেছে, আমি আর আরোহণ করতে পারছি না। মেয়েটা এখন হাড়েও ব্যাথা পাচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাচ্ছে সে। কিন্তু আন-নাসের নিজে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে বেহাল হয়ে পড়লেও থামলো না। লিজাকে বললো– 'তোমার-আমার জীবন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবী অনেক বেশি মূল্যবান। আমি যদি বিশ্রামের জন্য এখানে থেমে যাই আর সুলতান আইউবী শত্রুর ঘাতকদের দ্বারা খুন হয়ে যান, তাহলে আমি মনে করবো, আমিই সুলতান আইউবীর খুনী।'

পরদিন ভোর বেলা। আন-নাসের এখন পা টেনে টেনে হাঁটছে। লিজা ঘোড়ার পিঠে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। ঘোড়া ধীর গতিতে হাঁটছে। এক স্থানে ঘাস-পানি দেখে ঘোড়া দাঁড়িয়ে যায়। লিজা সজাগ হয়ে হঠাৎ চকিত হয়ে বললো– 'আল্লাহর দোহাই, তুমি পশুটাকে টেনে নিও না। একে একটু পানাহার করতে দাও।'

ঘোড়ার পানাহার শেষ হলে আন-নাসের তার লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করে। ছুটে চলার মতো অবস্থা নেই ঘোড়াটার। আন-নাসেরও পরিশ্রান্ত দেহে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। লিজার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার মুখ থেকে এখন কথা সরছে না। আন-নাসের জানে না, সুলতান আইউবী কোথায় আছেন। তিনি তুর্কমানের দিকে এগিয়ে চলছেন। সুলতান আইউবী আরো সম্মুখে চলে গিয়েছিলেন। পরে সে স্থানটির 'কোহে সুলতান' তথা 'সুলতান পর্বত' নামকরণ হয়েছিলো। কিন্তু এখন তিনি

সেখানেও নেই। তারও আগে চলে গেছেন তিনি। আন-নাসেরের তুর্কমান ও কোহে সুলতানের টিলা চোখে পড়তে শুরু করে। সূর্য অনেক উপরে উঠে এসেছে।

এই মুহূর্তে সুলতান আইউবী টিলাময় একটি বিজন অঞ্চলে কর্মকর্তাদের নিয়ে এলাকাটার পরিসংখ্যান ঠিক করছেন। তিনি আমলাদেরকে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে একাকি একদিকে চলে যান। তাঁর মাথায় সম্ভবত বাহিনীর অগ্রযাত্রার কোনো পরিকল্পনা ছিলো। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটি টিলার উপর আরোহণ করেন। চার ফেদায়ী সেখান থেকে সামান্য দূরে এক স্থানে চুপিচুপি তাঁকে দেখছে। তিনি অনেক সময় পর্যন্ত টিলার উপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকেন।

'নীচে আসতে দাও।' এক ফেদায়ী তার সঙ্গীদের বললো।

'দেহরক্ষীরা কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে হয়তো।' আরেকজন বললো।

'বেটা আজ রক্ষা পাবে না।' অপর একজন বললো।

'শুধু একজন এগিয়ে যাবে'– চতুর্থজন বললো– 'আক্রমণ পেছন থেকে করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরে অন্যরা এগিয়ে যাবো।'

সুলতান আইউবী টিলার উপর থেকে নেমে আসেন এবং ঘোড়ায় চড়ে অন্য একদিকে চলে যান। ঘাতকদল তাঁর পেছনে পেছনে এগিয়ে যায়। আক্রমণের জন্য এই জায়গাটা উপযোগী নয়।

আন-নাসের এখনো অনেক দূরে। সুলতান আইউবী পুনরায় ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। অন্য একটি টিলায় আরোহণ করেন। খানিক পর সেখান থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে রওনা দেন। ফেদায়ীরা তার থেকে সামান্য দূরে লুকিয়ে আছে। এক স্থানে এসে সুলতান ডান দিকে মোড় নেন। সম্মুখে খোলা মাঠ। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করতে উদ্যত হন। এমন সময় তিনি ধাবমান পায়ের শব্দ শুনতে পান। এক ফেদায়ী এক ফুট লম্বা একটা খঞ্জর হাতে তাঁর থেকে দু'-তিন পা দূরে এসে উপনীত হয়ে। সুলতান তাকে দেখে ফেলেন।

সুলতান আইউবী নিজের খঞ্জরটা বের করে হাতে নেন। দেখতে না দেখতে ফেদায়ী তাঁর উপর আক্রমণ করে বসে। সুলতান নিজের খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। আক্রমণকারী ফেদায়ী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। আঘাতটা সে শক্তির সাথেই করেছে। সুলতানের আক্রমণ ব্যর্থ যায়। টিলার আড়াল থেকে আরেক ফেদায়ী

বেরিয়ে আসে। সেও আক্রমণ চালায়। সুলতান তার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেন বটে; কিন্তু আঘাতে তাঁর গায়ের চামড়া কেটে যায়। তিনি টিলার আড়ালে চলে যান। এক ফেদায়ী তাঁর দিকে এগিয়ে এলে তিনি বাঁ হাতে তার মুখে ঘুষি মারেন। লোকটা ধাক্কা খেয়ে পেছনে গিয়ে পড়ে যেতে উদ্যত হয়। সুলতান তার বুকে খঞ্জরের আঘাত হেনে ঠেলা দিয়ে তাকে একদিকে ফেলে দেন। এই ফেদায়ী খতম হয়ে যায়।

অপরজন পেছন দিক থেকে সুলতানের উপর হামলা করে। কিন্তু তিনি যথাসময়ে নিজেকে সামলে নেন। সুলতান আইউবীর এক বাহুতে ফেদায়ীর খঞ্জরের আগার খোঁচা লাগে।

অপর দুই ফেদায়ীও বেরিয়ে এগিয়ে আসে। অপর দিকে ধাবমান কতগুলো ঘাড়ার পদশব্দ কানে আসে, যা মুহূর্তের মধ্যে সুলতান আইউবীর নিকটে এসে পৌঁছে যায়। ফেদায়ীরা পালিয়ে যায়। একজন ধাবমান ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। একজনকে অশ্বারোহীরা ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলে। সর্বশেষ ফেদায়ীকে জীবিত ধরে ফেলা হয়।

আল্লাহ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই আক্রমণ থেকেও রক্ষা করেন। ফেদায়ীরা যে সময় তাঁর উপর আক্রমণ চালায়, তখন তাঁর আমলারা তাঁর থেকে সাত-আটশত গজ দূরে এক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো। সুলতান তাদেরকে সেই স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে তাদের একজন আক্রমণটা দেখে ফেলে। অন্যথায় এই আক্রমণ ব্যর্থ যাওয়ার মতো ছিলো না।

এটি ১১৭৬ সালের মে মোতাবেক ৫৭১ হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। ইতিহাসে এই ঘটনার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর ডাইরীতে শুধু লিখেছেন– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এজাজ দুর্গ অবরোধ করতে যাওয়ার পথে চার ফেদায়ী তার উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিলো। মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন।'

মেজর জেনারেল আকবর খান বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ্য করে লিখেছেন– 'এজাজ দুর্গ অবরোধ করার সময় সুলতান আইউবী দিনের বেলা তাঁর এক সালার জাদুল আসাদীর তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন এক ফেদায়ী তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর উপর খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ চালায়। ঘটনাক্রমে সে সময়ে তাঁর মাথায় সেই বিশেষ পাগড়িটা ছিলো, যেটা তিনি রণাঙ্গনে ব্যবহার

করতেন। পাগড়িটার নাম ছিলো তারবুশ। আক্রমণকারীর খঞ্জর তারবুশে আঘাত হানে এবং সুলতান আইউবী সজাগ হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন ফেদায়ী ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ সুলতানের দেহরক্ষীরাও এসে পড়ে। তারা আক্রমণ করে ঘাতকদের মেরে ফেলে।'

জনাব আকবর খান লিখেছেন, কিছুদিন আগে এই ফেদায়ীরা প্রতারণার মাধ্যমে সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে গিয়েছিলো।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আক্রমণকারীরা সুলতান আইউবীরই দেহরক্ষী ছিলো। এই ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে, নিজ বাহিনীতে তিনি মোটেও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। এমনকি তাঁর দেহরক্ষীরা পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিলো না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, ঘাতকরা না তার নিজস্ব লোক ছিলো, না তারা কারো প্রতারণার শিকার হয়ে আক্রমণ করেছিলো। তারা ছিলো কাপুরুষ ক্রুসেডারদের মদদপুষ্ট ভাড়াটে খুনী চক্র।

ধৃত ফেদায়ী স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, তারা চারজন আসিয়াত দুর্গ থেকে এসেছে। তাকে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেয়া হয়। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাবাদ করে তার থেকে আসিয়াত দুর্গের সকল তথ্য জেনে নেন। ভেতরে কতোজন সৈন্য আছে, তাদের লড়াই করার যোগ্যতা ও শক্তি কতখানি, তাও তিনি সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি সুলতান আইউবীকে অবহিত করা হয়।

'আগামীকাল রাতের শেষ প্রহরে আমরা আসিয়াতের উদ্দেশ্যে রওনা হবো'– সুলতান আইউবী বললেন। তিনি তাঁর হাই কমান্ডের সালারদের তলব করে বললেন– 'ফেদায়ীদের এই আস্তানাটি গুড়িয়ে দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। দুর্গটি এক্ষুনি দখল করতে হবে। ফৌজের এক তৃতীয় অংশই যথেষ্ট। সৈন্য কতজন যাবে এবং তাদের বিন্যাস কীরূপ হবে সুলতান তা-ও বলে দেন।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা। সুলতান আইউবী সংবাদ পান, আন-নাসের নামক এক গেরিলা কমান্ডার ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তার থেকে পূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে ফেলেছেন। তাকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা জরুরি।

আন-নাসেরকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। বিরামহীন সফর ও পিপাসা তাকে আধমরা করে

তুলেছে। লিজা তার সঙ্গে। তার গায়ের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

আন-নাসের সুলতান আইউবীকে বিস্তারিত কাহিনী শোনায়। কোন কথাই সে গোপন রাখলো না। লিজা সম্পর্কেও খোলামেলা তথ্য প্রদান করে। সুলতান লিজাকে বললেন, নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। মেয়েটি সম্ভবত নিজেকে বন্দি মনে করছিলো এবং অসদাচরণের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলো। কিন্তু এখন দেখছে তার উল্টোটা। সে আন-নাসেরের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তাকে বলা হলো, তোমাকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানে তুমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে এবং কিছুদিন পর আন-নাসের তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।

আবেগময় বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে সুলতান আইউবী এরূপ মেয়েদের বিশ্বাস করতেন না। তাদেরকে সম্মান ও শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করতেন এবং গোপনে তাদের উপর নজর রাখতেন।

জখমের চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য আন-নাসেরকে পেছনের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

শেখ সান্নানের মেজাজ এখনো ঠান্ডা হয়নি। গোমস্তগীন তাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছেন। গোমস্তগীনের কাফেলাকে ধাওয়া করতে যাদের প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মাত্র দু'জন ফেরত এসেছে। তারা থ্রেসাকে তুলে নিয়ে এসেছে। লিজাকে আন-নাসের রক্ষা করে নিয়ে গেছে। থ্রেসা শেখ সান্নানের কোপানলে পড়ে যায়। মেয়েটিকে তিনি কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন। থ্রেসাও রূপসী। কিন্তু শেখ সান্নানের কামনার দৃষ্টি লিজার উপর নিবদ্ধ।

দিবসের শেষ প্রহর। আসিয়াত দুর্গের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে সান্ত্রীরা দূর দিগন্তে ধূলি-মেঘ দেখতে পায়। মেঘমালা এদিকেই এগিয়ে আসছে। সান্ত্রীরা তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণে মেঘের অভ্যন্তরে হাজার হাজার ঘোড়া চোখে পড়তে শুরু করে। সান্ত্রীরা ডংকা বাজায়। কমান্ডারগণ উপরে গিয়ে দেখে। শেখ সান্নানকে সংবাদ জানায়। এসে সে-ও সম্মুখের দেয়ালের উপর উঠে যায়।

এতোক্ষণে ফৌজ দুর্গের কাছাকাছি এসে অবরোধের বিন্যাসে বিন্যস্ত

হতে শুরু করেছে। শেখ সান্নান মোকাবেলার নির্দেশ দেয়। দুর্গের পাঁচিলের উপর তীরন্দাজ বাহিনী পৌঁছে যায়। কিন্তু তারা তীর ছুঁড়ছে না। তারা বাইরের বাহিনীর গতিবিধি অনুধাবন করতে চাচ্ছে। সুলতান আইউবী দুর্গের ভেতরকার সব তথ্য আগেই সংগ্রহ করেছেন। আন-নাসের তাঁর সঙ্গে আছে। দু'টি মিনজানিক স্থাপন করা হয়েছে। শেখ সান্নানের মহল কোথায় এবং কতো দূর আন-নাসের তা জানিয়ে দেয়। তার নির্দেশনা মোতাবেক প্রথমে বড় পাথর ছোঁড়া হয়, যা লক্ষে গিয়ে আঘাত হানে। শেখ সান্নানের শক্ত দেয়াল ফেটে যায়।

দুর্গ থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সুলতান আইউবীর নির্দেশে মিনজানিকের সাহায্যে দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল ভেতরে নিক্ষেপ করা হয়। পাতিলগুলো শেখ সান্নানের মহলের সন্নিকটে গিয়ে ভেঙে যায়। তরল দাহ্য পদার্থগুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাতে আগুন ধরানোর জন্য সলিতাওয়ালা তীর ছোঁড়া হয়। কিন্তু তীর তরল দাহ্য পদার্থের উপর গিয়ে পড়ছে না। এখান থেকে তীর ছুঁড়ে লক্ষে আঘাত হানা সহজ নয়। দুর্গের দেয়াল টপকে ভেতরে না ঢুকে সুবিধা করা যাবে না। ঘটনাক্রমে এক স্থানে আগুন জ্বলছিলো। একটি পাতিল তার এতো কাছে গিয়ে ফেটে যায় যে, দাহ্য পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ামাত্র দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। দেখতে না দেখতে শেখ সান্নানের মহলে আগুন ধরে যায়।

প্রজ্বলমান অগ্নিশিখা শেখ সান্নানের মনে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। তার বাহিনী খৃস্টান-মুনাফিক সৈন্যদের ন্যায় দক্ষ যোদ্ধা নয়। মদ্যপ আর চরম অলস সৈনিক তারা।

শেখ সান্নান বাস্তবতাকে মেনে নেয়। সে দুর্গের উপর সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়। সুলতান আইউবী যুদ্ধ বন্ধের আদেশ প্রদান করে বললেন, শেখ সান্নানকে বাইরে আসতে বলো।

সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে যায়।

খানিক পর দুর্গের ফটক খুলে যায়। শেখ সান্নান দু'-তিনজন সালারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। সুলতান আইউবী তাকে স্বাগত(!) জানানোর জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁর দৃষ্টিতে সান্নান অপরাধী। সান্নান যখন সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, সুলতান তাকে ও তার সালারদেরকে এতোটুকুও বললেন না যে, বসো।

'সান্নান!'— সুলতান আইউবী জিজ্ঞাসা করেন— তুমি কী চাও?'

'জীবনের নিরাপত্তা।' শেখ সান্নান পরাজিত কণ্ঠে বললো।

'আর দুর্গ?' সুলতান জিজ্ঞাসা করেন।

'আমি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবো।'

'এক্ষুনি বাহিনীসহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাও'— সুলতান আইউবী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন— 'সঙ্গে কোন মাল-সরঞ্জাম নিতে পারবে না। যাও, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কোন কমান্ডার, কোন সৈনিকের সঙ্গে যেনো কোন অস্ত্র না থাকে। এখান থেকে শূন্য হাতে বেরিয়ে যাও। পাতাল কক্ষে যেসব কয়েদি আছে, তাদেরকে সেখানেই থাকতে দাও। সালতানাতে ইসলামিয়ার কোথাও থাকবে না। খৃস্টানদের নিকট পৌঁছে শ্বাস ফেলবে। আমাকে হত্যা করার লক্ষ্যে সর্বশেষ যে চার ঘাতককে প্রেরণ করেছিলে, তারাও মারা পড়েছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তোমার সাদা পতাকার লাজ রাখলাম। আমি কুরআনের অনুসারী। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন কিনা, আমি বলতে পারবো না। নিজেকে মুসলমান দাবি করা পরিত্যাগ করো। অন্যথায় আমি তোমাকে এবং তোমার চক্রকে রোম সাগরে ডুবিয়ে মারবো।'

দিনের শেষ বেলা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূর-দিগন্তে মানুষের দীর্ঘ সারি অবনত মস্তকে পথ চলছে। শেখ সান্নান এই মানব সারির প্রধান পুরুষ। আছে তার সালার, কমান্ডার ও সিপাহীরা। আছে পেশাদার খুনীরাও। সবাই নিঃস্ব। কারো সঙ্গে কোন সামান-সম্পদ নেই। বাহন উট-ঘোড়াগুলোও দুর্গে রেখে এসেছে।

সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সুলতান আইউবীর বাহিনী দুর্গের দখল সম্পন্ন করে ফেলেছেন। পাতাল কক্ষের কয়েদিদের বের করে আনা হয়েছে। উদ্ধারকৃত সোনা-জহরত, মণি-মাণিক্য, অর্থ ও মালপত্রের কোন হিসাব নেই।

সুলতান আইউবী দুর্গটা এক সালারের হাতে তুলে দিয়ে রাতারাতি কোহে সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। তিনি এখন আর বেশি অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন না। দিন কয়েকের মধ্যেই অগ্রযাত্রা শুরু করেন এবং এজাজ দুর্গ অবরোধ করেন। হাল্‌ববাসীরা নিরাপত্তার দিক থেকে এই দুর্গটাকে অতিশয় দুর্ভেদ্যরূপে গড়ে তুলেছিলো। এটা ছিলো মূলত হাল্‌বেরই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তাতে যে বাহিনী ছিলো, তারা একেবারে নবীন। তারা কখনো ময়দানে যায়নি। সুলতান আইউবীর এমন আত্মবিশ্বাস নেই যে, তিনি অনায়াসে দুর্গটা কব্জা করে ফেলবেন। পেছন

থেকে হালবের ফৌজ আক্রমণ করে বসতে পারে, এই আশংকাও তাঁর মাথায় আছে। তবে এই আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। তবে আশার কথা হলো, হালবের বাহিনী এই কিছুদিন আগে তুর্কমানের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে। তাদের যুদ্ধ করার স্পৃহা-মনোবল ভেঙে পড়েছে।

এজাজ দুর্গের প্রতিরক্ষায় সৈন্যরা প্রাণপণ লড়াই করে। তারা সারাদিন ও সারারাত সুলতান আইউবীর বাহিনীকে দুর্গের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কোনোদিক থেকে নিকটে গিয়ে দেয়াল ভাঙা যায় কিনা চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্গের তীরন্দাজ সৈন্যরা তাদেরকে এক পা-ও এগুতে দেয়নি। পরদিন বড় মিনজানিকের সাহায্যে দুর্গের ফটকের উপর ভারি পাথর ছোঁড়া হয়। দাহ্য পদাথ্য ভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে অগ্নিতীরও ছোঁড়া হয়। আগুনের লেলিহান জিহ্বা ফটক চাটতে শুরু করে। উপর থেকে দুর্গের তীরন্দাজরা মিনজানিক নিক্ষেপকারীদের উপর বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করে। বড় ধনুক দ্বারা ছোঁড়া এই তীরগুলো অনেক দূরে এসে আঘাত হানছে। তাতে মিনজানিকের দায়িত্বে নিয়োজিত আইউবীর কয়েকজন সৈন্য আহত ও শহীদ হয়। কিন্তু এই কুরবানী ব্যতীত দুর্গ জয় করাও সম্ভব নয়। একজন শহীদ হচ্ছে তো অপর একজন এসে তার স্থান পূরণ করছে।

দুর্গের ফটক জ্বলছে। তার উপর অবিরাম পাথর এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ পর ফটক ভেদ করে পাথর ভেতরে গিয়ে আঘাত হানতে শুরু করে। আগুনে ফটকের কাঠ জ্বলে গেছে। লোহার পেরেকগুলো পাথরের আঘাতে বাঁকা হয়ে গেছে।

রাতে আগুন নিভে যায়। ফটকের লোহার কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে শুধু। পুড়ে যাওয়া ফটকের মধ্য দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারলেও ঘোড়া ঢুকতে পারবে না। দুর্গ জয় করতে হলে জীবন বাজির খেলা খেলতে হবে। পদাতিক বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত পোড়া ফটকের কাঠামোর মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এটা সুলতান আইউবীর পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। আদেশ পাওয়ামাত্র সৈন্যরা হুড় হুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু তাদেরকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হয়। এজাজের সৈন্যরা তাদের সম্মুখের অংশটাকে সেখানেই খতম করে ফেলে। পেছনের অংশ সঙ্গীদের লাশের উপর দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়।

অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। জীবিত পদাতিক সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে

ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণপণ লড়াই করে। তারপর অশ্বারোহী বাহিনী ভিতরে ঢোকার নির্দেশ লাভ করে। সুলতান আইউবী দুর্গের ভেতরে অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দেন। এক একটি ইউনিট এক এক স্থানে আগুন লাগাতে শুরু করে। এজাজের সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করার কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না।

দুর্গটি হাল্ব থেকে দেখা যায়। রাতের বেলা হাল্বের মানুষ দেখতে পায়, দুর্গের স্থানে আকাশটা জ্বলছে। আগুনের শিখা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে। তারা সুলতান আইউবীর এজাজ দুর্গ অবরোধের সংবাদ পেয়ে গেছে। হাল্বের হাই কমান্ড পেছন থেকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা আঁটে। কিন্তু সালারগণ জানায়, ফৌজ যুদ্ধের সমর্থ নয়।

এ সময়ে সাইফুদ্দীন হাল্বেই অবস্থান করছিলেন। গোমস্তগীনও সেখানে চলে গেছেন। দু'জনের মাঝে এজাজ ও হাল্বের প্রতিরক্ষার বিষয়ে উত্তপ্ত বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে গোমস্তগীন সাইফুদ্দীনকে হত্যা করার হুমকি প্রদান করেন। সাইফুদ্দীন ঐক্য ভেঙে দেন এবং নিজের অবশিষ্ট যৎসামান্য সৈন্যকে হাল্ব থেকে বের করে নিয়ে যান। তারা মূলত একে অপরের শত্রু ছিলো। আল-মালিকুস সালিহ'র বয়স এখন তের বছর অতিক্রম করেছে। কিছু বুঝ-বুদ্ধি হয়েছে তার। গোমস্তগীনের বক্তব্য ও আচরণে তিনি বুঝে ফেললেন, তার এই বন্ধুটা কুচক্রী। তিনি গোমস্তগীনকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন।

ইতিহাসে লিখিত আছে, হাল্ব-এজাজের অবরোধ অবস্থায় গোমস্তগীন আল-মালিকুস সালিহ'র বিরুদ্ধে নতুন এক ষড়যন্ত্র এঁটেছিলো, যা ফাঁস হয়ে যায়। আল-মালিকুস সালিহ তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দু'-তিনদিন পর হত্যা করে ফেলেন।

শেষ পর্যন্ত এজাজের রক্ষীরা অস্ত্র ত্যাগ করে। এর জন্য সুলতান আইউবীকে বহু মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিলো। তাঁর সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। এজাজবাসীরা প্রমাণ করেছে, তারা কাপুরুষ নয়। সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ হাল্ব অবরোধ করে ফেলেন। হাল্বের অবস্থান এজাজের নিকটেই। এজাজের অগ্নিশিখা হাল্বাসীদের রাতেই আতঙ্কিত করে ফেলেছিলো। তাদের জানা ছিলো, নগরী রক্ষা করার মতো শক্তি তাদের সৈন্যদের নেই। এই নগরবাসীরাই তাঁকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলো, যার ফলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই নগরীটা যেনো এক মৃত্যুপুরী।

অবরোধের দ্বিতীয় দিন আল-মালিকুস সালিহ'র এক দূত সুলতান আইউবীর নিকট আসে। সে যে বার্তা নিয়ে আসে, সেটি সন্ধির প্রস্তাব নয়। সেটি ছিলো একটি আবেগময় পয়গাম, যা সুলতান আইউবীকে নাড়িয়ে তোলে। বার্তাটা হলো, নুরুদ্দীন জঙ্গীর কিশোরী কন্যা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। মেয়েটির নাম শামসুন্নিসা। শামসুন্নিসা আল-মালিকুস সালিহ'র ছোট বোন। বয়স দশ-এগারো বছর। আল-মালিকুস সালিহ যখন হাল্‌ব চলে গিয়েছিলেন, তখন এই বোনটিকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাদের মা রোজী খাতুন বিনতে মঈনুদ্দীন দামেশ্‌কেই থেকে গিয়েছিলেন। তিনি সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সমর্থক ছিলেন।

সুলতান আইউবী দূতকে জবাব দেন, মেয়েটাকে নিয়ে আসো।

শামসুন্নিসা সুলতান আইউবীর দরবারে এসে উপস্থিত হয়। তার সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহ'র দু'জন সালার। সুলতান আইউবী জঙ্গীর এতীম মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত অঝোরে ক্রন্দন করেন। মেয়েটির হাতে আল-মালিকুস সালিহ'র লিখিত বার্তা।

সুলতান আইউবী পত্রখানা হাতে নিয়ে খুলে পড়েন। আল-মালিকুস সালিহ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি সুলতান আইউবীকে 'সুলতান' মেনে নিয়েছেন। তাঁর আনুগত্যও বরণ করে নিয়েছেন। পত্রে তিনি এ-ও লিখেছেন, আমি গোমস্তগীনকে হত্যা করে ফেলেছি। তাই আপনি হাররানকেও নিজের রাজ্য ভাবতে পারেন।

'তোমরা মেয়েটাকে কেনো সঙ্গে এনেছো?'– সুলতান আইউবী সালারদের জিজ্ঞাসা করেন– 'এই বার্তা তো তোমরা নিজেরাই নিয়ে আসতে পারতে?'

উত্তর সালারদেরই দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তারা নিজেরা কিছু না বলে মেয়েটির দিকে তাকায়। জঙ্গীকন্যা সুলতান আইউবীকে বললেন– 'মামাজান! আমাদেরকে এজাজ দুর্গটা দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে হাল্‌বে থাকতে দিন। আগামীতে আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।'

সুলতান আইউবী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সালারদের প্রতি তাকান। তারা দাবি আদায়ের কৌশল হিসেবে জঙ্গীর মেয়েকে সঙ্গে এনেছে।

'আমি এজাজ দুর্গ ও হাল্‌ব তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম শামসুন্নিসা!' –সুলতান আইউবী মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ জারি করেন, এজাজ দুর্গ থেকে আমাদের সৈন্যদের বের করে হাল্‌বের

অবরোধ তুলে নেয়া হোক। তিনি হাল্‌বের সালারদের বললেন– 'আমি এজাজ ও হাল্‌ব এই মেয়েটাকে দান করেছি। তোমরা কাপুরষ, আত্মমর্যাদাহীন ও বিশ্বাসঘাতক। তোমরা আমার বাহিনীতে থাকার উপযুক্ত নও।'

১১৭৬ সালের ২৪ জুন মোতাবেক ৫৭১ হিজরীর ১৪ যিলহজ চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়। সুলতান আইউবী এজাজ ও হাল্‌বকে সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং আল-মালিকুস সালিহকে স্বায়ত্বশাসন দান করেন।

তার অব্যবহিত পর সাইফুদ্দীনও সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু জাতির অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক ও ঈমান বিক্রয়কারীদের তৎপরতা যথারীতি অব্যাহত থাকে।
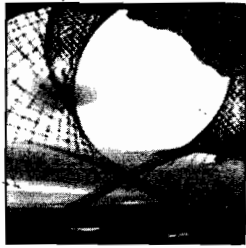
আলোর ঝিলিক

বিশাল বিস্তৃত এক কবরস্তান। সবগুলো কবর এখনো তরতাজা। মাটির স্তূপগুলো অগোছালো-বিক্ষিপ্ত। কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। কোন কোন কবর একটি অপরটির সঙ্গে লাগোয়া। যুদ্ধক্ষেত্রের কবর এরূপই হয়ে থাকে। হামাত থেকে হাল্ব পর্যন্ত এরূপ তিনটি কবরস্তান গড়ে ওঠেছে। এই সেদিনের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলটা এখন নির্জন-নিস্তব্ধ। এখানকার বাতাসে এখন শুধুই রক্তের গন্ধ। পাখিরা কিচির মিচির করছে, শুকুনরা উড়ছে।

এমনি একটি কবরস্তান হাল্ব শহরতলীর এজাজ দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত। কবরগুলোর মাটি এখনো আর্দ্র। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের শ্রদ্ধেয় ইমাম জনাকয়েক সৈন্যসহ সেখানে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করছেন। দু'আ শেষে যখন তিনি মুখমন্ডলে হাত বুলাতে গেলেন, ততোক্ষণে তাঁর দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেছে।

'এই ভূখন্ডটি এখন বন্ধ্যা হয়ে যাবে। এখন আর এখানে সবুজ পাতা গজাবে না'– ইমাম বললেন– 'এখানে এক কুরআনের অনুসারীগণ একে অপরের ঘাতক হয়ে গিয়েছিলো। যে মাটিতে ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত ঝরে, সে মাটি শুকিয়ে যায়। এখানে আল্লাহু আকবার ধ্বনি আল্লাহু আকবর ধ্বনির মোকাবেলা করেছে। তারা সবাই মুসলমান ছিলো। তারা একজন অপরজনের হাতে নিহত হয়েছে। হাশরের দিন তারা প্রত্যেকে একত্রিত উত্থিত হবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমরা এক ভাই অপর ভাইয়ের যে পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছো, সেই পরিমাণ রক্ত যদি তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের শত্রুদের ঝরাতে, তাহলে শুধু ফিলিস্তীন নয়– স্পেনও পুনরায় তোমাদের হাতে চলে আসতো।'

ইতিমধ্যে কতগুলো ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতে শুরু করেছে। ইমামের সঙ্গে দন্ডায়মান এক সেনা বললো– 'সুলতান আসছেন।' ইমাম মোড় ঘুরিয়ে তাকান। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আসছেন। তাঁর সঙ্গে

সালার ও রক্ষী বাহিনীর ছয়জন আরোহী। কবরস্তানের নিকটে এসে সুলতান আইউবী ঘোড়া থামান। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ইমামের কাছে এসে ফাতিহা পাঠ করে ইমামের সঙ্গে মুসাফাহা করেন।

'মহামান্য সুলতান!'– ইমাম সুলতান আইউবীকে বললেন– 'এটা তো ঠিক যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারাও মুসলমান ছিলো। কিন্তু তাদের কবরে ফাতিহা পাঠ করা হবে, আমি তাদেরকে এর যোগ্য মনে করি না। তাদেরকে শহীদদের সঙ্গে দাফন না করা উচিত ছিলো। আমাদের মুজাহিদগণ সত্যের পক্ষে লড়াই করেছে। কিন্তু আপনি তাদেরকে দুশমনের নিহতদের সঙ্গে দাফন করিয়েছেন।'

'যারা মিথ্যার পক্ষে লড়াই করেছে, আমি তাদেরকেও শহীদ মনে করি– সুলতান আইউবী বললেন– 'তারা তাদের শাসকদের প্রতারণার শহীদ। আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছি। আর যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো, তাদের রাজাগণ আবেগময় স্লোগান ও মিথ্যা বার্তা শুনিয়ে তাদের অন্তরে মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তাদের ইমামগণ পুরস্কার-উপঢৌকন নিয়ে সৈন্যদেরকে বিভ্রান্ত করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়েছে। আমাদের মুসলমান শত্রুদের যারা পরে বুঝতে পেরেছিলো, তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, এখন তারা আমাদের সঙ্গে আছে। আর এই যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের পর্যন্ত আলো পৌঁছেনি। রাজত্বের নেশায় বুঁদহওয়া শাসকগণ তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দিয়েছিলো।

মুসলমান আমীরগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন হয়ে গিয়েছিলেন। তারা খেলাফত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন শাসক হতে চেয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন নুরুদ্দীন জঙ্গীর বালক পুত্র আল-মালিকুস সালিহ। দ্বিতীয়জন মসুলের আমীর সাইফুদ্দীন গাজী। তৃতীয়জন হাররান দুর্গের কেল্লাদার গোমস্তগীন। শেষোক্তজনতো স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই ফেলেছিলেন। এই তিন নেতা প্রত্যেকের সৈন্যদের দ্বারা একটি বাহিনী গঠন করে নিয়েছিলেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে এসেছিলেন। খৃস্টানরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলো। তাদের সঙ্গে খৃস্টানদের সুসম্পর্কের সূত্র কেবল এটুকু যে, এই প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা আপসে লড়াই করে করে শেষ হয়ে যাবে কিংবা দুর্বল হয়ে যাবে, যার ফলে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যোগ্যতা ও

ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। রাজত্বের নেশা, খৃস্টানদের দেয়া সম্পদ, সামরিক সাহায্য, মদ আর ইহুদীদের রূপসী মেয়েরা এই আমীরদেরকে এমন অন্ধ করে তুলেছিলো যে, তারা এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, যখন নুরুদ্দীন জঙ্গী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং সুলতান আইউবী এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মিসর থেকে এসেছেন যে, তিনি খৃস্টানদেরকে ইসলামী দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করে প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত না করে ফিরবেন না।

দেড় মাস যাবত হামাত থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এই বিশাল সবুজ ভূ-খণ্ডে মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাতে থাকে। শেষে বিজয় সত্যেরই হয়েছে। সুলতান আইউবী জয়লাভ করেছেন। দুশমনরা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। কিন্তু সুলতানের চেহারায় খুশির সামান্যতম ঝিলিকও চোখে পড়লো না। জাতির সামরিক শক্তির বৃহৎ অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এই হিসেবে এটা খৃস্টানদেরই জয় আর মুসলমানদের পরাজয়। খৃস্টানরা তাদের লক্ষ অর্জনে সফল হয়েছে। সুলতান আইউবী কয়েক বছরের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

১১৭৬ সালের জুন মাসের সেই দিনটিতে সুলতান আইউবী যখন এজাজ দুর্গের সন্নিকটস্থ বিশাল কবরস্তানে ইমামের সঙ্গে দন্ডায়মান ছিলেন, তখন তার চেহারাটা ছিলো বিমর্ষ। তিনি ইমামকে বললেন– 'প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর দু'আ করবেন, যেনো আল্লাহ সেই লোকগুলোকে ক্ষমা করে দেন, যাদের চোখে পট্টি বেঁধে তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানো হয়েছিলো।'

সুলতান ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হন এবং বিস্তৃত কবরস্তানটার প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'আল্লাহকে এতো রক্তের হিসাব কে দেবে? এই পাপ আমার আমলনামায় লেখা না হয় যেনো।'

সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'আমাদের জাতি আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেছে। কাফেররা রাসূলের উম্মতের শক্তি ও চেতনায় এতো বেশি ভীত যে, এই শক্তিটাকে নানা চিত্তাকর্ষক অস্ত্রের মাধ্যমে দুর্বল করে তুলতে বে-পরোয়া হয়ে ওঠেছে। এই একটি ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। তাদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। মুসলমানদের দুর্বলতাই তাদের শক্তি। আমাদের কোন কোন ভাই তাদের এই মাধ্যমটাকে বরণ করে নিয়েছে এবং গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আমরা যদি সেই পথ এখনই এবং এখানেই রুদ্ধ না করে দেই, তাহলে আমি ভবিষ্যৎকে যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, আমি উম্মতে রাসূলকে গৃহযুদ্ধ দ্বারা আত্মহত্যা করতে দেখতে পাচ্ছি। কাফেররা এখনকার ন্যায় অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে দিয়ে উম্মতকে আপসে লড়াতে থাকবে। গুটিকতক মানুষের উপর যখন উন্মত্ততা সওয়ার হয়, তখন তারা জাতিকে ক্রীড়নকে পরিণত করে তাদেরসহ ডুবে মরে। ক্ষমতা ও রাজত্বের মোহে মাতাল এই মানুষগুলো জাতির রক্ত এভাবেই ঝরাতে থাকবে। এই বিস্তৃত কবরস্তানটা দেখো। কবরগুলো গণনা করো। গুণে শেষ করতে পারবে না। আমরা পেছনে যেসব লাশ দাফন করে এসেছি, তাদেরও কোন সংখ্যা নেই। এতো রক্তের হিসাব আমি কার থেকে নেবো? আল্লাহকে আমি কী জবাব দেবো?'

'গৃহযুদ্ধের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে মাননীয় সুলতান!'– এক সালার বললেন– 'এখন সামনের চিন্তা করুন। বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের ডাকছে। প্রথম কেবলা আমাদের পথপানে তাকিয়ে আছে।'

'কিন্তু আমাকে ডাকছে মিসর'– সুলতান আইউবী ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে বললেন– 'ওদিক থেকে বড় উদ্বেগজনক খবরাখবর আসছে। ওখানে আমার স্থলাভিষিক্ত আমার ভাই। আমাকে অস্থিরতা থেকে রক্ষা করার জন্য সে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমার থেকে গোপন রাখছে। আলী বিন সুফিয়ান এবং নগর প্রধান গিয়াস বিলবীসও আমাকে বিস্তারিত কিছু জানাচ্ছে না। শুধু এতটুকু সংবাদ প্রেরণ করছে যে, দুশমনের গোপন নাশকতামূলক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে, আমরা যা প্রতিহত করার চেষ্টা করছি। পরশু দিনের দূত আমাকে জানিয়েছে, কায়রোতে নাশকতা দিন দিন জোরদার হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যে শেখ সান্নানকে আসিয়াত দুর্গ থেকে উৎখাত করেছি, তার কোন ঘাতক চক্র কায়রোতে নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'জন কমান্ডার এমনভাবে খুন হয়েছে যে, তাদের শরীরে জখম বা আঘাতের কোন চিহ্ন ছিলো না। মৃত্যুর পর লাশের সুরতহাল থেকে এ প্রমাণও পাওয়া যায়নি যে, তাদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এটা হাশিশিদের খুনের একটা বিশেষ পদ্ধতি।'

'তা আপনি বাহিনীকে কি এখানেই রেখে যাবেন নাকি সঙ্গে নিয়ে যাবেন?' এক সালার জিজ্ঞাসা করেন।

'এ বিষয়ে আমি এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেইনি'– সুলতান আইউবী

বললেন– 'কিছু সৈন্য নিয়ে যেতে পারি। ফৌজের প্রয়োজন এখানে বেশি। খৃস্টানরা মিসরে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড-তৎপরতা এই জন্য জোরদার করেছে, যেনো আমি ফিলিস্তীন অভিমুখে অগ্রযাত্রা করার পরিবর্তে মিসর চলে যাই। তাদের এই আকাঙ্খা আমি পূর্ণ হতে দেবো না। তবে আমার মিসর যাওয়া জরুরি।'

সুলতান আইউবীর আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। ক্রুসেডারদের চিন্তাধারা ও প্রত্যয়-পরিকল্পনা তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ বোঝে না। যে সময়ে তিনি ফাতিহা পাঠ করে কবরস্তান ত্যাগ করে নিজের সামরিক হেডকোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিলেন, ততোক্ষণে শেখ সান্নান ত্রিপোলি পৌঁছে গেছেন। আপনারা পড়ে এসেছেন, হাসান ইবনে সাব্বাহ'র পর এই চক্রটির যে গুরু সবচে' বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন শেখ সান্নান। লোকটি ফেদায়ীদের প্রধান নেতা ছিলেন। সুলতান আইউবী বনাম খৃস্টানদের বিগ্রহগুলোর সময় ফেদায়ীদের খুনী চক্রটি এই শেখ সান্নানেরই নেতৃত্বে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে ওঠেছিলো। তার ঘাতকরা একাধিকবার সুলতান আইউবীর উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিলো এবং প্রতিটি আক্রমণেরই পরিণতিতে ঘাতকরাই মারা পড়েছে। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছে, তারা ধরা পড়েছে। খৃস্টানরা শেখ সান্নানকে আসিয়াত নামক একটি দুর্গ দিয়ে রেখেছিলো, যেটি ১১৭৬ সালের মে মাসে সুলতান আইউবী অবরোধ করে দখল করে নেন। শেখ সান্নান অস্ত্রত্যাগ করে দুর্গ খালি করে দিলে সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন।

শেখ সান্নান ১১৭৬ সালের জুন মাসের একদিন ত্রিপোলী (লেবানন) গিয়ে পৌঁছেন। সঙ্গে তার ফেদায়ী চক্র ও সেনাবাহিনী। কারো সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিলো না। সুলতান আইউবী তাদেরকে নিরস্ত্র করে বিদায় করে দিয়েছিলেন। ত্রিপোলী ও তার আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলটি এক খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের দখলে ছিলো। শেখ সান্নান তার নিকট গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

দু'দিন পর রেমন্ড সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য এদিক-ওদিক থেকে অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটদের তলব করেন। তারা যথাসময়ে যথাস্থানে এসে উপস্থিত হয়। খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হারমানও এসে হাজির হন। সভা শুরু হয়ে যায়।

'আপনারা আমাকে এই সূত্রে তিরস্কার করতে পারেন না, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে পরাজিত হয়ে এসেছি'— শেখ সান্নান বললেন— 'আপনারা জানেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর ন্যায় লড়াই করতে জানি না। সুলতান আইউবীর মোকাবেলা তো আপনাদের বাহিনীও করতে পারবে না। সেখানে আমার ফেদায়ীরা কীভাবে পারবে? এখন প্রয়োজন হচ্ছে, আপনারা আইউবীর দুশমন মুসলমান আমীরদেরকে সৈন্য দিন। কিন্তু তারা সকলে মিলেও তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

'শেখ সান্নান!'— রেমন্ড বললেন— 'আইউবীর বিরুদ্ধে আমরা কী করবো, সে সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে দিন। আপনার এ ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। আপনি সর্বশেষ যে চারজন লোক প্রেরণ করেছিলেন, তারাও ব্যর্থ হয়েছে। তারা ধরা পড়েছে এবং মারা গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর একটি সংহারী আক্রমণও সফল হয়নি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, আপনি শুধু অকেজো-অকর্মণ্য লোকদেরই প্রেরণ করেছেন, যাদের মারা যাওয়া কিংবা ধরা পড়ায় আপনার কিছুই সমস্যা হতো না। আমরা আপনাকে যেসব সুবিধাদি প্রদান করেছি, সব বিফলে গেছে।

'কেবল একজন সালাহুদ্দীন আইউবীর খুন না হওয়ায় আপনাদের অর্থ বিনষ্ট হয়নি'— শেখ সান্নান বললেন— 'আমি মিসরে সালাহুদ্দীন আইউবীর যে দু'জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে হত্যা করিয়েছি, তাদেরকেও এই অর্থের বিনিয়োগের হিসাবে রাখুন। সুদানে আপনাদের তিনজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিলো, আমি তাদেরকেও কবরে পাঠিয়ে আপনাদের পথ পরিষ্কার করেছি। হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহের দুই সহযোগি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। আপনাদের ইঙ্গিতে আমি তাদেরকেও খুন করিয়েছি। সর্বোপরি বর্তমানে মিসরে গোপন হত্যাকাণ্ডের যে ধারা চলছে, সেটি কে চালু করেছিলো? আপনারা একেও কি ব্যর্থতা বলবেন?'

'আইউবী কবে খুন হবে?'— ফরাসী ক্রুসেডার গাই অফ লুজিনান টেবিলে চাপড় মেরে বললেন— 'সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার আলোচনা করুন। আপনি নুরুদ্দীন জঙ্গীকে যে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, সেই বিষ আইউবীকে কবে গেলাবেন?'

'সেই দিন, যেদিন সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যেমনটি হয়েছিলো নুরুদ্দীন জঙ্গীর সময়'— শেখ সান্নান বললেন— 'জঙ্গী ভূমিকম্প কবলিত

লোকদের সাহায্যের জন্য একাকি ছুটে চলছিলেন। না তার নিজের কোন চৈতন্য ছিলো, না তার কোন আমলার। তার জন্য খাবার কে রান্না করছিলো, সেই খবর তাদের কারো ছিলো না। এই সুযোগে আমি আপনার কথামত যাদেরকে তাকে হত্যার করার লক্ষে প্রেরণ করে রেখেছিলাম, তারা তার খাদ্যে এ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই বিষের ক্রিয়ায় জঙ্গীর গলায় রোগ জন্ম নেয়। তিন-চারদিন পর তিনি মারা যান। জঙ্গীর ডাক্তার আজো বলছে, নুরুদ্দীন জঙ্গী গলার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর খাবার পর্যন্ত পৌঁছা তো সম্ভব নয়।'

'যে পাচক আইউবীর জন্য খাবার রান্না করে, আপনি কি তাকে ক্রয় করতে পারেন না?'— এক উর্দ্ধতন কমান্ডার জিজ্ঞাসা করে।

'এর উত্তর আমার বন্ধু হারমান ভালো দিতে পারবেন।' শেখ সান্নান বললেন এবং হারমানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

বিগত কাহিনীতে বহুবার হারমানের উল্লেখ এসেছে। লোকটা জার্মানীর বাসিন্দা। আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় একজন চৌকস গোয়েন্দা। নাশকতা ও চরিত্র বিধ্বংসের ওস্তাদ। মিসরে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিলো, সেসব এই হারমানেরই অপকর্ম। এই হারমানই চক্রান্তের মাধ্যমে সুলতান আইউবীর কয়েকজন উর্দ্ধতন আস্থাভাজন কর্মকর্তাতে তাঁর প্রতিপক্ষ বানিয়েছিলেন। লোকটি মুসলিম শাসক— জনগণের মনস্তত্ত্ব ও দুর্বলতাগুলো বেশ ভালো করে বুঝতেন এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার কৌশল জানতেন। এক খৃস্টান সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুদান, মিসর ও আরবের যে কোন অঞ্চলের ভাষা হুবহু আঞ্চলিক ভঙ্গিতে বলতে পারতেন।

'শেখ সান্নান সঠিক বলছেন'— হারমান বললেন— 'সালাহুদ্দীন আইউবীর বাবুর্চিকে কেনো ক্রয় করা যাবে না, সে প্রশ্নের জবাব আমাকেই দিতে হবে। আইউবী মৃত্যুকে পরোয়া করেন না। অন্যথায় এতোদিনে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা ব্যাপার ছিলো না। তিনি বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছেন। তাঁর খাদ্য-খাবারের কেউ তত্ত্বাবধান করলো কিনা, তিনি তার কোনই তোয়াক্কা করেন না। নিজের জীবনটাকে তিনি আল্লাহর উপর সোপর্দ করে রেখেছেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, তার মৃত্যু যে দিনটিতে হবে বলে স্থির হয়ে আছে, ঠিক সেদিনই হবে এবং সেদিন কেউ তাকে ধরে

রাখতে পারবে না। তার রক্ষী ইউনিটের কমান্ডার, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা এবং একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রীতিমত তার খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখে। মাঝে-মধ্যে ডাক্তারও এসে খাদ্য পরীক্ষা করে। এতোসব কঠোর তত্ত্বাবধানের পরও আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, আইউবীর বাবুর্চিসহ সকল কর্মচারি তার শিষ্য। তাদের অন্তরে রয়েছে তার অন্ধ ভক্তি ও অপার শ্রদ্ধা। আইউবী তাদেরকে নিজের চাকর মনে করেন না। তাদের সঙ্গে তিনি বন্ধু ও ভাইয়ের ন্যায় আচরণ করেন। আমি পুরোপুরি একটা পরিসংখ্যান নিয়ে রেখেছি। আইউবীর ব্যক্তিগত পরিমন্ডলের কাউকে ক্রয় করা কিংবা সেই পরিমন্ডলে কাউকে ঢুকানো সম্ভব নয়। তার লোকেরা সর্বক্ষণ তার চার পার্শ্বে মানব প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রাখে। এরা হলো আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস বিলবীস, হাসান ইব্ন আব্দুল্লাহ ও যাহেদান। এরা এতোই সুদক্ষ গোয়েন্দা যে, এদের চোখ মানুষের কলিজা পর্যন্ত দেখে ফেলে।'

'ইসলামের পতন'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'আমি শতবার বলেছি, আমাদেরকে ইসলামের পতন ঘটাতে হবে। এটি এমন একটি ধর্ম, যে মানুষের আত্মাকে কব্জা করে নেয়। কেউ ইসলামকে নিজের আদর্শ হিসেবে বরণ করে নিলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে পরাজিত করতে পারে না। সালাহুদ্দীন আইউবীর চার পার্শ্বে মুসলমানদের যে বেষ্টনীটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ধর্ম-কর্মে তারা এতোই পরিপক্ক যে, সোনা-দানা, হীরা-জহরত ও রূপসী নারী দ্বারা আপনারা এই বেষ্টনী ভেদ করতে পারবেন না। আপনারা যাদের ক্রয় করেছেন, তারা কাঁচা ঈমানের মুসলমান। দেখেছেন তো, সালাহুদ্দীন আইউবীর কেমন ছোট ছোট বাহিনী আমাদের বিশাল বিশাল শক্তিশালী বাহিনীকে কিরূপ ক্ষতিসাধন করেছে! যেখানে আমাদের ঘোড়া ক্লান্তি ও পিপাসায় নির্জীব হয়ে পড়ে, সেখানে আইউবীর সৈন্যরা বীর বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যায়। যেনো তাদের কোন ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। এই শক্তিকেই মুসলমানরা ঈমান বলে থাকে। আমাদেরকে তাদের ঈমানটা দুর্বল করতে হবে। তাদের এক দু'জন আমীর কিংবা উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে হাতে আনা নিঃসন্দেহে একটা সাফল্য হারমান! এ থেকে আপনি অনেক স্বার্থ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এমন একটা পন্থা আবিষ্কার করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে এই জাতিটার অন্তরে আপন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রবীণ লোকদের চিন্তাধারা

পরিবর্তন করা সহজ হয় না। তাদের বংশধরকে শৈশব এবং কৈশোরেই টার্গেট করে নাও। কাঁচা মস্তিষ্ককে তুমি নিজের ছাঁচে ঢেলে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারো। তাদের পশুবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করে তোলো।'

'ইহুদীরা এই কাজটা করে যাচ্ছে'– হারমান বললেন– 'আমি এই ময়দানে যা কিছু করছি, তার ফলাফল ধীরে ধীরে সামনে আসছে। আপনি এক-দু'দিনে কারো বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারবেন না। এ কাজে সময়ের প্রয়োজন। একটি যুগ চলে যায়।'

'এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকা উচিত'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'আমি এই কামনা করবো না যে, ফলাফল আমাদের জীবদ্দশাতেই ফলতে হবে। আমি পূর্ণ আশাবাদি, আমরা যদি চরিত্র ধ্বংসের এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখি, তাহলে এমন একটি সময় আসবে, যখন মুসলমান শুধুই নামের থাকবে। তাদের ধর্ম-কর্ম শুধুই একটি রেওয়াজে পরিণত হবে। চিন্তা-চেতনায় তারা হবে আমাদেরই লোক। আমাদের কাজ তারাই আঞ্জাম দেবে। তাদের চিন্তা-চেতনার উপর ক্রুশ জয়লাভ করবে।'

'শেখ সান্নান!'– রেমন্ড বললেন– 'আপনি যদি আসিয়াত দুর্গের পরিবর্তে আমাদের কাছে আরেকটি দুর্গ প্রার্থনা করেন, তাহলে এই মুহূর্তে আমরা তা দিতে পারবো না। আপনার সঙ্গে আমাদের চুক্তি অটুট থাকবে। দুর্গ ছাড়া অন্য সকল সুযোগ-সুবিধা আপনি পেতে থাকবেন। আপনি যদি এসব সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখতে চান, তাহলে সমগ্র মিসরে বিশেষত কায়রোতে সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যা অব্যাহত রাখুন এবং সালাহুদ্দীন আইউবীরও হত্যাচেষ্টা চালু রাখুন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যা সম্পর্কে আমি আপনাকে স্পষ্ট বলে দিতে চাই, এ কাজে আমি আর একটি লোকও নষ্ট করবো না'– শেখ সান্নান বললেন– 'আইউবীকে হত্যা করা সম্ভব হবে না। আমি আমার বহু মূল্যবান ফেদায়ীদের বিনষ্ট করেছি। আপনারা আমাকে বলার অনুমতি দিন যে, সুলতান আইউবী আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আমি যখন তার হাতে অস্ত্র সমর্পণ করি, তখন আমার আশংকা ছিলো, আমি তার উপর একাধিকবার যে সংহারী আক্রমণ করিয়েছি, তার প্রতিশোধে তিনি আমাকে এবং আমার গুরুত্বপূর্ণ ফেদায়ীদের খুন করে ফেলবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ও আমার লোকদেরকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। তারপরও আমার ধারণা ছিলো, তিনি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছেন– যেইমাত্র আমরা পিঠ

ফেরাবো, অমনি আমাদের উপর তীর বৃষ্টি চালাবেন কিংবা আমাদের উপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়াবেন। এখন আপনারা আমাকে জীবিত দেখতে পাচ্ছেন। আমি আমার সকল কর্মী ও সমগ্র বাহিনীসহ আপনাদের সম্মুখে জীবিত উপস্থিত আছি। আপনারা আমার সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিন। আমি আইউবীর হত্যা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। তবে কায়রোতে আমাদের লোকদের কর্মতৎপরতা আপনাদের হতাশ করবে না।'

'কায়রোতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যা সালাহুদ্দীন আইউবীকে মিসর ফিরে যেতে বাধ্য করবে'– হারমান বললেন– 'আমি অতি তাড়াতাড়ি সুদানীয় মিসরের সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর আক্রমণের ধারা শুরু করে দেবো। মিসরের উপর বড় কোনো আক্রমণ করা যাবে না। তবে আক্রমণের ধোঁকা দিতে হবে, যেনো সালাহুদ্দীন আইউবী সিরিয়া ত্যাগ করে মিসর ফিরে যেতে বাধ্য হন।'

হারমান গুপ্তচরবৃত্তিতে অভিজ্ঞ। কিন্তু তার জানা নেই, আজকের এই সভায় যে কর্মচারিরা মদ ও খাদ্যদ্রব্য আনা-নেয়া-পরিবেশন করছে, তাদের মধ্যে একজন সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। ফরাসী বংশোদ্ভুত লোকটির নাম ভিক্টর। তাছাড়া তাদের মধ্যে রাশেদ চেঙ্গিস নামক একজন তুর্কী মুসলমানও আছে, যে নিজেকে গ্রীক খৃস্টান দাবি করে এই চাকরিতে নিয়োগ লাভ করেছিলো। এই লোকটিও সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা। খৃস্টানদের অতিশয় বিচক্ষণ গোয়েন্দা প্রধান হারমান এই যেসব বিশেষ কর্মচারি সভা-সমাবেশ ও ভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মদ-খাবার পরিবেশন করছে গভীর যাচাই-বাচাই করে তাদেরকে নিয়োগ দান করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, সুলতান আইউবী সর্বত্র গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। খৃস্টানদের অনেক ভেতরকার গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো তথ্য সময়ের আগেই তিনি পেয়ে যেতেন। এবার শেখ সান্নানের এই কনফারেন্সের সব কথোপকথন তাঁর দু'জন গুপ্তচর শুনে ফেলেছে। এখন দিন কয়েকের মধ্যেই এসব তথ্য নিয়ে তাদেরকে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে যেতে হবে।

মিসরে নাশকতামূলক তৎপরতা বেড়ে গেছে। সেনাবাহিনীর নায়েব সালার অপেক্ষা এক স্তর নিচু পদমর্যাদার এক কমান্ডারকে নগরীর বাইরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি সন্ধ্যার পর বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন।

কিন্তু রাতে আর ঘরে ফেরেননি। সকালে তার লাশ পাওয়া গেলো। তার শরীরে কোন জখম ছিলো না, কোন আঘাতও ছিলো না। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে নিহতের পায়ের ছাপ ছাড়া অন্য আরো দু'টি ছাপ দেখতে পান। চাল-চলনে এই কমান্ডার সকলের প্রশংসনীয় ছিলেন। তার গতিবিধি ভুল কিংবা সন্দেহভাজন লোকদের ন্যায় ছিলো না। তার একজনই স্ত্রী ছিলো, যে তার ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ছিলো। তার এই মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোন ক্লুই বের করা সম্ভব হয়নি।

তিন-চারদিন পর একই পদমর্যাদার অপর এক সেনা কমান্ডারকে ঠিক একইভাবে ভোরে নিজ কক্ষে মৃত পাওয়া যায়। তিনি সেনা ব্যারাকের একটি কক্ষে থাকতেন। পুরোপুরি ভালো মানুষ ছিলেন। তার বন্ধু মহলে তারই ইউনিটের কিছু লোক ছিলো। তাদের কারো সঙ্গেই তার কোন দ্বন্দ্ব-বিবাদ ছিলো না। হত্যাকাণ্ডের বাহ্যিক কোনো কারণ ছিলো না। ঘটনাটাকে হত্যাকান্ডও বলা যায় না। শরীরে জখম কিংবা আঘাতের সামান্যতম চিহ্নও নেই।

সরকারী ডাক্তার লাশটা দেখেছেন। লাশের ঠোঁটের এক কোণে একটুখানি লালা ছিলো। ডাক্তার লালাটুকু একটি বাটিতে করে নিয়ে এক টুকরা গোশতের সঙ্গে মিশিয়ে একটি কুকুরকে খেতে দেন। তারপর কুকুরটাকে নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখেন এবং পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু কুকুর অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করলো না। ডাক্তার সারা রাত জেগে কুকুরটার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মধ্য রাতের পর কুকুরটা রশির সীমানা পর্যন্ত চারদিক আরামের সাথে পায়চারি করতে শুরু করে। অনেকক্ষণ পায়চারি করার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় এবং লুটিয়ে পড়ে যায়। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, কুকুরটা মরে গেছে। ডাক্তার রিপোর্ট করেন, কমান্ডার দু'জনকে এমন বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে, যাতে কোন তিক্ততা থাকে না। যা খেলে মানুষ অতিশয় আরামের সঙ্গে মারা যায়।

গোয়েন্দারা উভয় কমান্ডার সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালায়। জানার চেষ্টা করা হয়, জীবনের শেষ দিনটিতে তারা কার কার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, কোথায় কোথায় গেছেন এবং কার সঙ্গে আহার করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন তথ্যই পাওয়া গেলো না। বিবাহিত কমান্ডারের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু তাকেও সন্দেহের চোখে দেখার কোনো

কারণ ছিলো না। উভয় কমান্ডারই পাকা মুসলমান ছিলেন। সুলতান আইউবী স্বয়ং এক যুদ্ধে তাদের কমান্ড ও বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন। তারা ছিলেন সীমান্ত বাহিনীর কমান্ডার। কয়েকজন সুদানীকে তারা সীমান্তের ওপার থেকে গ্রেফতারও করেছিলেন। সুদানীরা তাদেরকে মোটা অংকের ঘুষের অফার দিয়েছিলো। কিন্তু তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের নায়েব সালারের পদে উন্নীত হওয়ার কথা ছিলো।

আলী বিন সুফিয়ান সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, হত্যাকান্ডের ঘটনা দু'টি খৃস্টান নাশকতাকারীদের কাজ এবং ঘাতকরা ফেদায়ী চক্রের সদস্য। তিনি বললেন, দুশমন এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যার ধারা শুরু করে দিয়েছে। সকল কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, যেনো তারা অপরিচিত কিংবা সন্দেহভাজন কারো হাত থেকে কিছু না খায় এবং কেউ অযাচিতভাবে বন্ধুত্ব গড়তে শুরু করলে বা কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করলে তাকে ধরিয়ে দেয়।

মিসরের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় কমান্ডারের হত্যাকান্ডের সাতদিন পর একরাতে হঠাৎ সেনা ছাউনিতে আগুন ধরে যায়। হাজার হাজার তাঁবু এক স্থানে স্তূপ করে রাখা ছিলো। প্রহরাও ছিলো। কিন্তু তারপরও অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে যায়। এটিও নাশকতামূলক কাজ। সেখানে আকস্মিকভাবে আগুন ধরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিলো না। এই এলাকায় আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ ছিলো এবং এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে পালিত হতো।

এসব ঘটনা ছাড়াও আরো রহস্যময় বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিলো। সীমান্ত বাহিনীগুলোকে অধিকতর সতর্ক করে দেয়া হয়। সুদানের দিকে সীমান্তের ভেতরে গোপনে লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিলো। তাদের বেশ ক'জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

আলী বিন সুফিয়ান তার ইন্টেলিজেন্সকে আরো বেশি ছড়িয়ে দেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক সতর্ক করে দেন।

কায়রো থেকে সামান্য দূরে নীল নদের তীরে একটি পাহাড়ি এলাকা। এই অঞ্চলেরই কোন এক স্থানে ফেরাউনী আমলের একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। ইতিপূর্বে একাধিক ঘটনায় খৃস্টান ও সুদানী

সন্ত্রাসীরা এই পতিত প্রাসাদগুলোকে তাদের গোপন আস্তানারূপে ব্যবহার করেছিলো। মিসরে এরূপ পরিত্যক্ত পুরনো জীর্ণ প্রাসাদের সংখ্যা অনেক। পাহাড়ি এলাকাটাকে নজরে রাখার জন্য আলী বিন সুফিয়ান তাঁর গোয়েন্দাদেরকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করে নিয়োজিত করেছিলেন। এখানকার খৃস্টান সন্ত্রাসীরা দু-তিন মাসে আলী বিন সুফিয়ানের ছয়-সাতজন দক্ষ গোয়েন্দাকে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় গুম করে ফেলেছে।

এরা মিসরের সেইসব গুপ্তচর, যারা খৃস্টান গুপ্তপরদের পাকড়াও করার যোগ্যতা রাখতো। কিন্তু এখন তাঁরা নিজেরাই ধরা কিংবা মারা পড়ছে। আশংকার ব্যাপার হলো, যদি তারা ধরাই পড়ে থাকে, তাহলে খৃস্টানরা তাদেরকে ফেদায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে তাদেরকে মিসরেরই সরকার ও সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তার চেয়েও বড় শংকা হলো, দুশমনের গোয়েন্দারা কায়রোর গোয়েন্দাদেরকে চিনে ফেলেছে। গুপ্তচরবৃত্তির এই যুদ্ধে দুশমন জয়লাভ করছে। আলী বিন সুফিয়ান এখন উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তাদের একজন হলেন মাহদী আল-হাসান, যিনি ফিলিস্তীন ও ত্রিপোলীতে গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছেন। ইনি দুর্দান্ত সাহসী ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা। উপকূলীয় এই পাহাড়ি এলাকাটার দেখা-শোনার দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত করেন আলী বিন সুফিয়ান।

এলাকাটার ভেতরে একটি মাত্র পথ আছে। পেছনে নদী। অন্য তিনদিকে পাহাড় আর টিলা। অভ্যন্তরটা সবুজ গাছপালায় পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও পানির ঝিলও আছে।

রিপোর্ট আছে, পাহাড়ের ভেতরে সন্দেহভাজন কিছু মানুষ যাওয়া-আসা করছে। কেউ ফেরাউনদের কোনো ভবন বা তার ধ্বংসাবশেষ দেখেনি। কিন্তু মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, ভেতরে কোথাও না কোথাও এমন কিছু অবশ্যই আছে। ফেরাউনরা এখানে কিছু না কিছু অবশ্যই নির্মাণ করে থাকবে, যা আজো বর্তমান আছে। মোটকথা, এলাকাটা সন্ত্রাসী আস্তানার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান বটে।

মাহদী আল-হাসান এক-দু'টি উট আর কয়েকটি ভেড়া-বকরী নিয়ে মরু যাযাবর কিংবা রাখালের বেশে সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। পশুগুলো এদিক-ওদিক চরে বেড়াতো আর তিনি ঘোরাফেরা করতেন। তিনি কিছুদূর

পর্যন্ত ভেতরকার এলাকা দেখেছেন। সে পর্যন্ত তিনি কিছুই দেখতে পাননি। অনেকখানি ভেতরে একটি পর্বত এমন আছে, যার পাদদেশে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে একটি কুদরতি সুড়ঙ্গ পথের মুখ আছে। মাহ্দী আল-হাসান এই সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। সুড়ঙ্গটি এতো উঁচু ও প্রশস্ত যে, তার মধ্য দিয়ে উট চলাচল করতে পারে। সুড়ঙ্গটি সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। মাহ্দী আল-হাসান সুড়ঙ্গটির অপর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে সংকীর্ণমত একটি উপত্যকা, যেখানে কোনো আস্তানা তৈরি হতে পারে না। সুড়ঙ্গটি অনেক লম্বা। ভেতরে ডানে--বাঁয়ে দেয়ালের গায়ে গুহার মতো তৈরি হয়ে আছে। এমন বড় বড় পাথরও আছে, যেগুলোর আড়ালে মানুষ দিব্যি লুকাতে পারে।

মিসরী গোয়েন্দা মাহ্দী আল-হাসান, আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট করেছেন, আমি যতোদূর পর্যন্ত গিয়েছি, কোনো সন্দেহজনক স্থান চোখে পড়েনি এবং যতোবার গিয়েছি, একজন মানুষও ভেতরে যেতে কিংবা ভেতর থেকে বের হতে দেখিনি। আলী বিন সুফিয়ান তাকে বলে দেন, যেনো তিনি সারাদিন সেখানে অতিবাহিত করেন এবং বেশি ভেতরে না যান। কারণ, তাতে ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান। আলী বিন সুফিয়ান তাকে এও বলে দেন, মাঝে-মধ্যে উটে সওয়ার হয়ে রাতেও চলে যাবেন। যদি কোনো মানুষের মুখোমুখি হয়ে পড়েন, তাহেল বলবেন, আমি কায়রো যাচ্ছি। নিজেকে কৃষাণ বলে দাবি করবেন।

আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশনা মোতাবেক মাহ্দী আল-হাসান রাতেও সেখানে গিয়েছেন। এক রাতে তিনি কারো পলায়নপর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। কোনো বন্য পশুও হতে পারে কিংবা মানুষও হতে পারে। মাহ্দী আল-হাসান আর সম্মুখে অগ্রসর হননি। কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই মাহ্দী আল-হাসান দু'-তিনটি উট ও গোটা কতক ভেড়া-বকরী নিয়ে সেখানে চলে যান। পশুগুলোকে উন্মুক্ত ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকেন। জায়গাটা সবুজ-শ্যামল। ঝোপ-ঝাড়, ঘাস ও বন্য ফল-বীচি সবই আছে। খানিক সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর তার একজন মানুষ চোখে পড়ে। লোকটি এক স্থানে মাথানত করে বসে আছে। পরনে মূল্যবান চোগা। মুখে লম্বা দাড়ি। মাথায় দামি পাগড়ি। মাহ্দী আল-হাসান ধীরে ধীরে লোকটির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু

করেন। কারো আগমন আঁচ করে লোকটি মাথা তুলে তাকায়। বেশ-ভুষা ও চলন-বলনে মাহ্দী আল-হাসান একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক। তিনি ধীর পায়ে লোকটির নিকটে গিয়ে দাঁড়ান।

লোকটির হাতে একটি থলে। থলেটি কাঁচা সবুজ পাতায় ভর্তি। অপর হাতে একটি গাছের তাজা ডাল।

'কী তালাশ করছেন চাচা?'– মাহ্দী আল-হাসান বোকার মতো হেসে গেঁয়ো মানুষের ঢংয়ে জিজ্ঞাসা করেন– 'কিছু হারিয়েছেন কি? বলুন, আমিও তালাশ করি।'

'আমি হাকীম'– লোকটি বললো– 'গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, গোটা-দানা এসব খুঁজে ফিরছি। এসব ঔষধ তৈরিতে লাগে।'

চেহারা দেখে মাহ্দী আল-হাসান লোকটাকে চিনে ফেলেন। কায়রোর বিখ্যাত হাকীম। তিনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন যে, লতা-পাতা তালাশ করছেন। এসব দিয়েই হাকীমরা ঔষধ বানায়।

'তা তুমি এখানে কী করছো?'– হাকীম জিজ্ঞাসা করেন– 'থাকো কোথায়?'

'ঐতো সামান্য দূরে'– মাহ্দী আল-হাসান জবাব দেন– 'পরিবারের সঙ্গে থাকি। এখানে পশু চরাতে এসেছি।'

'দানাগুলো দিয়ে কী রোগের ঔষধ বানাবেন?' মাহ্দী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন।

'কোন কোন রোগ এমন হয়ে থাকে যে, রোগী নিজেও জানেনা, তার কী হয়েছে।'

ইনি দেশের বিখ্যাত হাকীম। দূর-দূরান্ত থেকে রোগী আসে তার কাছে। এখানে তার দেখা পাওয়া মাহ্দী আল-হাসানের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

মানুষের একটি দুর্বলতা হলো, অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রোগী মনে করে। সব মানুষই দীর্ঘ আয়ু, সুস্বাস্থ্য এবং শারীরিক শক্তির প্রত্যাশা রাখে। কোনো মানুষই নিজেকে শক্তিহীন ভাবতে চায় না। মাহ্দী আল-হাসানও তেমনি একজন মানুষ। শরীরে হয়তো সাধারণ কোন সমস্যা ছিলো, যা থাকে সব মানুষেরই। এতো বড় একজন হাকীমের সঙ্গে দেখা। সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

মাহ্দী আল-হাসান রোগের কথা হাকীমকে জানান। হাকীম তাঁর শিরায় হাত রাখেন। তারপর নিরিক্ষার সাথে চোখ দু'টো দেখেন। এমনভাবে তাকান, যেনো তার চোখে বিস্ময়কর কিছু দেখেছেন। তারপর লোকটার

মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখেন। হাকীমের চেহারায় বিস্ময়ের লক্ষণ।

'তুমি কি আমার দাওয়াখানায় আসতে পারো?'– হাকীম জিজ্ঞাসা করেন– 'শহরে আসো।'

'আমি নিতান্ত গরীব মানুষ'– মাহ্দী আল-হাসান বললেন– 'আপনাকে পয়সা দেবো কোত্থেকে?'

'তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলো'– হাকীম বললেন– 'আমার উট ওদিকে চরে বেড়াচ্ছে। তোমারও উট আছে। আমাকে তোমার পয়সা দিতে হবে না। ধনীদের নিকট থেকে অনেক টাকা নিয়ে থাকি। গরীবের চিকিৎসা বিনা মূল্যে করি। তোমার রোগ এখনো সাধারণ। কিন্তু বেড়ে যেতে পারে। আমার অন্য একটি সন্দেহও হচ্ছে।'

মাহ্দী আল-হাসান এখন ডিউটিতে আছেন। বৃদ্ধের কাছে আসা এবং তার সঙ্গে কথা বলাও তার কর্তব্যেরই অংশ। সাধারণ একটা রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি ডিউটি ত্যাগ করতে পারেন না। তিনি হাকীমকে বললেন– 'আমি সন্ধ্যায় আপনার দাওয়াখানায় আসবো। হাকীম মাহ্দী আল-হাসানকে নিজের দাওয়াখানার ঠিকানা বলে দেন। মাহ্দী আল-হাসান পূর্ব থেকেই দাওয়াখানাটা চেনেন। তবু না জানার ভানই দেখান।

❖ ❖ ❖

সন্ধ্যার পর মাহ্দী আল-হাসান এই বেশেই হাকীমের দাওয়াখানায় চলে যান। উটটা সঙ্গে রাখেন, যাতে হাকীম চিনতে পারেন। হাকীমের প্রতি তার কোন সংশয় নেই। হাকীমরা গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা তালাশ করে ফেরেন তা তার জানা আছে। সেই সুবাধে এই হাকীমেরও উক্ত পার্বত্য এলাকায় যাওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া বাস্তবিকই তার বিশ্বাস জন্মে গেছে, তার এই সাধারণ রোগটা এক সময় গুরুতর কোন ব্যাধিতে পরিণত হতে পারে। হাকীম তাকে আবারো দেখলেন এবং খুব ভালো করে দেখলেন এবং বললেন– 'আমি তোমাকে ঔষধ দিচ্ছি। যদি এতে ভালো না হও, তাহলে অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমার ব্যাপারে আমার অন্য একটি সন্দেহ আছে।'

মাহ্দী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন– 'কী সন্দেহ?'

'কামনা করি, আমার সন্দেহ সঠিক না হোক'– হাকীম বললেন– 'তুমি সুদর্শন যুবক। পাহাড়-উপত্যকায় ঘুরে বেড়াও। যেখানে আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো, জায়গাটা ভালো নয়। ওখানে প্রেতাত্মরা বসবাস করে। তাদের কতিপয় ফেরাউনী আমলের রূপসী মেয়েদের

প্রেতাত্মা। ফেরাউনরা তাদেরকে জোরপূর্বক নিজেদের কাছে রেখেছিলো এবং ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ বানিয়েছিলো। পরে তাদের স্থলে অন্য মেয়েদের পেয়ে তাদেরকে মেরে ফেলেছিলো। আত্মা বৃদ্ধ হয় না– সব সময় যুবকই থাকে। তাদেরই আত্মারা এই সবুজ ভূ-খণ্ডে ঘুরে বেড়ায়। আমার সন্দেহটা হচ্ছে, তোমার আকার-গঠন ফেরাউনদের আমলের এক যুবকের সঙ্গে মিল খায়, যাকে সে কালের এক সুন্দরী যুবতী ভালোবাসতো, কামনা করতো। কিন্তু মেয়েটি কোন এক ফেরাউনের হাতে পড়ে যায়। তুমি ওখানে যাওয়া-আসা করছো। ঐ মেয়েটির প্রেত্মাত্মা তোমাকে দেখে ফেলেছে। সে তোমাকে কামনা করছে।'

'ও আমার কোন ক্ষতি করবে না তো?'– মাহদী আল-হাসান হাকীমের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে খানিকটা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন– 'প্রেতাত্মাদের বন্ধুত্ব তো ভালো হয় না। তা আপনি কি আমাকে সেই প্রেতাত্মা থেকে বাঁচাতে পারেন?'

'আমার সন্দেহ ভুলও হতে পারে'– হাকীম বললেন– 'আগে ঔষধ দেবো। তাতে সুস্থ্য না হলে তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিবো। প্রেতাত্মা থেকে মুক্তি লাভের এ-ও একটা পন্থা। তখন আর সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

মাহদী আল-হাসান যোগ্য ও বিচক্ষণ গুপ্তচর বটে; কিন্তু আলেম নন। সাধারণ মানুষের ন্যায় তারও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস আছে। এ জাতীয় শোনা ঘটনাবলীতে তার বিশ্বাস আছে। হাকীমের এক একটি শব্দ তার মনের মাঝে গেঁথে গেছে। প্রেতাত্মার ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

মাহদী আল-হাসান হাকীমের নিকট গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নয়– চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। হাকীম তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন, যেনো তিনি চিন্তা না করেন। কিন্তু চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। হাকীম তাকে এক ডোজ ঔষধ দিয়ে বলে দেন, এই ঔষধটুকু রাতে শোয়ার আগে খাবে।

মাহদী আল-হাসান ঔষধ সেবন করে শুয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম এসে যায়। তিনি গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যান। এর আগে কখনো এতো তাড়াতাড়ি তার ঘুম আসেনি। সকালে চোখ খোলার পর অনুভব করেন, মনটা তাঁর অস্বাভাবিক উৎফুল্ল। সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ানের নিকট যান। কিন্তু হাকীমের ঘটনা কিছুই বললেন না। এটা বলার মতো কোন বিষয় নয়। কেননা, হাকীম সন্দেহভাজন কেউ নন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত

ও বড় হাকীম। ফৌজ ও প্রশাসনের বড় বড় অফিসাররাও তাঁর থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। তিনি তাবীজ-কবজও দিয়ে থাকেন এবং জিন-ভূত তাড়ান। আলী বিন সুফিয়ান মাহদী আল-হাসানকে বললেন, আপনি সেখানে যান। কোন সন্দেহভাজন মানুষ অবশ্যই পেয়ে যাবেন। আলী মূলত নাশকতাকারীদের আস্তানা খুঁজে ফিরছেন।

মাহদী আল-হাসান ডিউটিতে চলে যান। যাওয়ার পথে হাকীমের সঙ্গে দেখা করে যান। সেই রাখালের বেশ, রাখালের পোশাক। হাকীমকে বললেন, এই সাত সকালে আপনাকে জানাতে এসেছি, আজ রাত আমার গভীর ঘুম হয়েছে এবং ঔষধ খাওয়ার পর থেকে আমার মনটা এতো উৎফুল্ল ও তরতাজা যে, পূর্বে কখনো এমনটা হয়নি।

'যদি বিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে, তাহলে তোমার অন্য কোন সমস্যা নেই'– হাকীম বললেন– 'সন্ধ্যায় আবার আসবে।'

মাহদী আল-হাসান ওঠে ডিউটিতে চলে যান।

মাহদী আল-হাসান এই সবুজ-শ্যামল এলাকায় বহুদিন যাবৎ যাওয়া-আসা করছেন এবং গোটা দিন অবস্থান করছেন। বহুবার রাতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার হাকীমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার জায়গাটার নামে ভয় অনুভূত হতে শুরু করেছে। হাকীম তাকে বলেছিলেন, প্রেতাত্মা তার কোন ক্ষতি করবে না। কারণ, প্রেমের টানে সে তার আত্মার কাছে আসা-যাওয়া করছে। তবু অদেখা রহস্যময় সৃষ্টির প্রতি ভীতি সহজাত। মাহদী আল-হাসানের মনে হতে লাগলো, প্রেতাত্মারা তার চার পার্শ্বে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। মাহদী আল-হাসান সাহসী সুপুরুষ। তিনি মন থেকে ভয় দূর করে ফেলার চেষ্টা শুরু করেন এবং হাকীম তাকে যে প্রেতাত্মার উল্লেখ করেছিলেন, তাকে কল্পনায় স্থান দিতে শুরু করেন। এই কল্পনায় তিনি শান্তি লাভ করেন এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করেন।

হঠাৎ মাহদী আল-হাসান অনুভব করেন, তার মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দ নির্জীব হয়ে যাচ্ছে এবং মনটা ভীতিতে ছেয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজেকে সামলে নেয়ার বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ভয় বাড়তেই থাকে এবং হাকীমকে যে সমস্যার কথা বলেছিলেন, তা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। তিনি তাৎক্ষণাৎ হাকীমের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডিউটি ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব নয়।

মাহদী আল-হাসান সহ্য করতে থাকেন। বহু সময় পর তার মনের ভয়

দূর হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে গতকাল ওষুধ সেবনের আগে যে অবস্থা ছিলো, সেই অবস্থায় ফিরে আসেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে, এটা প্রেতাত্মার আছর।

দিন কেটে গেছে। মাহদী আল-হাসান উট ও ভেড়া-বকরীগুলোকে জড়ো করে সেই স্থানে নিয়ে যান, যেখানে প্রতিদিন নিয়ে রাখেন। তারপর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে শহরে হাকীমের নিকট চলে যান। হাকীমকে নিজের মনের এই পরিবর্তনের কথা জানান। হাকীম প্রেতাত্মার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু আরো একদিন ওষুধ সেবন করে দেখার পরামর্শ দিয়ে গতকালের ওষুধটাই আরেক ডোজ দিয়ে বিদায় করে দেন। মাহদী আল-হাসান রাতে শোয়ার আগে ওষুধটা সেবন করেন। গত রাতের ন্যায় আজও তার গভীর ঘুম হয় এবং সকালে ঝরঝরা শরীর-মন নিয়ে জাগ্রত হন। নিত্যদিনের ন্যায় তিনি আলী বিন সুফিয়ানের নিকট গমন করেন এবং সেখান থেকে ডিউটিতে চলে যান।

মাহদী আল-হাসানের শরীরটা এখন ভালো। মন-মানসিকতায় প্রেতাত্মার কল্পনা প্রবল। কিন্তু আধা দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রফুল্লতা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তদস্থলে ভীতি ও নির্জীবতা এসে ভর করে। তিনি ভাবনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং পায়চারি করতে শুরু করেন। কিন্তু পরে আবার ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যেতে থাকে। তার কানে এমন শব্দ ভেসে আসে, যেনো দূরে কোথাও এক নারী কাঁদছে। কান্নার শব্দ প্রথমে উঁচু হয়ে পরে আবার ক্ষীণ হতে হতে স্তিমিত হয়ে যায়।

মাহদী আল-হাসান যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি ভাবেন, এটা কোনো এক প্রেতাত্মার কান্না হবে। হতে পারে এটা সেই প্রেতাত্মা, যার কথা হাকীম বলেছিলেন। তিনি ভয় পেয়ে যান। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু হাকীম তো বলেননি, প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলা উচিত কি উচিত নয়। তিনি যদি অন্য কোথাও কোন নারীর কান্নার শব্দ শুনতেন, তাহলে পরিস্থিতি যেমনই হোক তার সাহায্যে ছুটে যেতেন। কিন্তু এখানে তো জীবন্ত কোন নারীর অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। এটা যে ফেরাউনী আমলের প্রেতাত্মার ক্রন্দন!

সন্ধ্যায় মাহদী আল-হাসান আগের দিনের ন্যায় হাকীমের নিকট চলে

যান এবং তাকে অবস্থা জানান। নারী কণ্ঠের ক্রন্দন শোনার ঘটনাও অবহিত করেন। হাকীম কিছুক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান। পরে মাথা তুলে বললেন– 'আমার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে। এটা প্রেতাত্মা। তবে তুমি ভয় পেয়ো না। আমি এখনই তোমাকে একটা তাবিজ দেবো। তারপর প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞেস করবো, সে কী চায়? তারপর যা করার করবো। তবে তোমাকে ভয় পাওয়া চলবে না। এই প্রেতাত্মাটা তোমাকে ভালোবাসে। তাই সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তুমি ওখানে যেতে থাকো। তবে তার থেকে পালাবার চেষ্টা করলে সে তোমার ক্ষতি করবে।'

হাকীম মাহদী আল-হাসানকে একটি তাবিজ দেন। তিনি তাবিজটি বাহুতে বেঁধে নেন।

'অবশিষ্ট কাজ রাতে করবো'– হাকীম বললেন– 'কাল সকালে আমার কাছে চলে আসবে। তখন আমি তোমাকে প্রেতাত্মা সম্পর্কে ধারণা দেবো। তুমি যে কান্নার আওয়াজ শুনেছো, তা সেই প্রেতাত্মারই কান্না। এই প্রেতাত্মাটা শয়তান নয়। তারপরও আমি চেষ্টা করবো, তোমাকে তার থেকে রক্ষা করা যায় কিনা।'

মাহদী আল-হাসান হৃদয়ে অস্থিরতা ও উত্তেজনা নিয়ে ফিরে যান।

পরদিন মাহদী আল-হাসান আলী বিন সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আরো কিছু নির্দেশনা লাভ করেন। তিনি পালিয়ে পালিয়ে হাকীমের নিকট চলে যান। হাকীম যেনো তারই অপেক্ষায় বসে আছেন। মাহদী আল-হাসানকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং তাকে ভেতরে নিয়ে যান।

'সে তোমার সঙ্গে একটিবারের জন্য সাক্ষাৎ করতে চায়'– হাকীম মাহদী আল-হাসানকে বললেন– 'সে তোমার সম্মুখে আসবে এবং নিজের আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে। হতে পারে, প্রথম দিন সে তোমার সম্মুখে এসেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। অন্য জগতের সৃষ্টি বলে হয়তো এ জগতের মানুষের কাছে আসতে ইতস্তত করবে। তা-ই যদি করে, তাহলে পরদিন তোমাকে আবার যেতে হবে।'

'কোথায়?' মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন।

'সেখানে, যেখানে তুমি প্রত্যহ গিয়ে থাকো'– হাকীম বললেন– 'যেখানে তুমি আমাকে প্রথম দেখেছিলে। সেখানে তুমি রাতে যাবে।'

'আপনিও কি সঙ্গে থাকবেন?' মাহদী আল-হাসান খানিকটা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

'না'– হাকীম উত্তর দেন– 'পরজগতে চলে যাওয়া আত্মাকে সে-ই দেখতে পায়, যাকে সে কামনা করে। কোনো পাপিষ্ঠ প্রেতাত্মা যদি কোন মানুষের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়। এই যে প্রেতাত্মা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না। তার কান্না বুঝতে চেষ্টা করো। সে মজলুম, ভালোবাসার পিয়াসী। আমি রাতে যখন তাকে হাজির করেছি, তখন সে অঝোরে কাঁদছিলো এবং অনুনয়-বিনয় করে বলছিলো, ঐ লোকটাকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তারপর আমি আজীবনের জন্য চলে যাবো।'

কথাগুলো যদি অন্য কেউ বলতো, তাহলে মাহদী আল-হাসান অতোটা প্রভাবিত হতেন না, যতোটা এখন হয়েছেন। সর্বজনমান্য ও দেশের বিখ্যাত হাকীম সাহেবের বক্তব্য অমূলক হতে পারে না। তাছাড়া তিনি বড় মাপের একজন আলেমও বটে। তার বলার ধরনটাই এমন যে, শ্রোতায় হৃদয়ে গেঁথে যায়। তিনি মাহদী আল-হাসানকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, এই প্রেতাত্মার দর্শনে তোমার উপর কোন ভীতির সঞ্চার হবে না এবং তোমার কোন ক্ষতি হবে না। উল্টো তোমার বিরাট উপকার হতে পারে।

'তবে সাবধানতা অবলম্বন করাও আবশ্যক'– হাকীম বললেন– 'এই প্রেতাত্মা কিংবা তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না। এই ভেদ যদি ফাঁস করে দাও, তাহলে তোমার ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তুমি এই দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারো। কিন্তু অদৃশ্য জগতে চলে যাওয়া আত্মার ভেদ ফাঁস করে দিলে আমি বলতে পারবো না তোমার শরীরের কোন দুইটি অঙ্গ চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে– দু'পা শুকিয়ে যাবে, না দুই বাহু, নাকি চোখ দুটো দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তোমাকে আমি আরো একটি গোপন কথা বলবো, যাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। দেশের সেনাবাহিনীর দু'জন ঊর্ধ্বতন কমান্ডার রাতে মারা গেছে। কেউ জানে না, তারা কীভাবে মারা গেছে। দু'তিনটি প্রেতাত্মা আমাকে বলেছে, তাদেরকে প্রেতাত্মারা মেরে ফেলেছে। তারা হত্যাকারী প্রেতাত্মাদের গোমর ফাঁস করে দিয়েছে।'

'তা তারা কমান্ডারদের কীভাবে খুন করলো?' মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন। মাহদী আল-হাসান রাখালের বেশ ধারণ করে আছেন বটে, কিন্তু মূলত তিনি গুপ্তচর। তিনি কমান্ডারদ্বয়ের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করতে চাচ্ছেন। তিনি হাকীমের নিকট বিস্তারিত জানতে চান।

‘এই রহস্য কাউকে বলা যাবে না’– হাকীম বললেন– ‘যতোটুকু অনুমতি ছিলো বলেছি। তুমি একেবারে চুপ থাকবে। যা যা বলছি স্মরণ রেখো। ভেবো না, কোনো স্বার্থ ছাড়া তোমার প্রতি আমার এই হৃদ্যতা কেনো। আমি এই আত্মা ও প্রেতাত্মাদের কামনার কাছে দায়বদ্ধ। আমি যদি তাদেরকে নারাজ করি, তাহলে আমার সব বিদ্যা বেকার হয়ে যাবে এবং প্রেতাত্মারা আমারও সেই দশা ঘটাবে, যেমনটি তাদের শত্রুদের ঘটিয়ে থাকে। এই যে আত্মা তোমাকে দেখে কাঁদে, সে আমাকে বলেছে, সামান্য সময়ের জন্য হলেও যেনো আমি তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই। এখন তার বাসনা পূর্ণ করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

‘আচ্ছা, আমি যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করি, তাহলে কী হবে?’ মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞেস করেন।

‘তাহলে সে প্রেতাত্মার রূপ ধারণ করে তোমার আত্মার উপর নিজের ছায়া ফেলবে’– হাকীম জবাব দেন– ‘তুমি আমাকে যে সমস্যার কথা বলেছিলে, সেটি কোন শারীরিক সমস্যা ছিলো না। এটি তোমার আত্মিক ব্যাধি। তবে তা এখনো তোমার উপর পূর্ণ ক্রিয়া করেনি। তুমি একজন ভালো মানুষ। তোমার নেকী তোমার কাজে এসেছে। সমস্যার কথা ব্যক্ত করে তুমি ভালোই করেছো। মহান আল্লাহ যাকে দয়া করেন, তার জন্য কোন মানুষকে তিনি ওসিলা বানিয়ে দেন। এটা আল্লাহর লীলা যে, তুমি আমাকে এখানে দেখেছো এবং আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। আল্লাহর এই দয়াকে ভয় করো না। তুমি যদি ঐ প্রেতাত্মাটার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কামনা করো, তাহলে সে এ জগতে তোমার অনেক উপকার করবে। তোমার একটি উপকার এই হতে পারে যে, সে অতিশয় সুন্দরী নারীর রূপে গোশত-চামড়ার জীবন্ত মানুষ হয়ে যখন খুশি তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি তাকে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে রাখতে পারবে। আর যদি সে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহশীল হয়ে যায়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তোমাকে কোনো না কোনো ফেরাউনের গোপন ধনভাণ্ডারের সন্ধান বলে দেবে এবং এমন উপায় সৃষ্টি করে দেবে যে, তুমি সেই ধনভাণ্ডার বের করে এই প্রেতাত্মাকে সঙ্গে করে মিসর থেকে দূরে কোথাও চলে যাবে এবং কোনো একটি ভূখণ্ডের রাজা হয়ে যাবে।’

‘সাক্ষাৎ কবে হবে?’ মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞেস করেন।

'আজ রাতেই চলে যাও।' হাকীম বললেন।

হাকীম মাহদী আল-হাসানকে আরো একটি তাবিজ দেন এবং বহু জরুরি নির্দেশনা প্রদান করেন। আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং উৎসাহিত করে জোরালো ভাষায় বললেন, ভয় পাবে না। তিনি সাক্ষাতের স্থানে পৌঁছার সময়ও বলে দেন, রাত অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়ার খানিক পরে যাবে। মাহদী আল-হাসান বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব এক প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন এবং নিত্যদিনকার ডিউটিতে চলে যান। দিনটা সেখানে অতিবাহিত করেন এবং সূর্যাস্তের আগে আগে ফিরে যান।

রাতের আঁধার নেমে এলে মাহদী আল-হাসান পুনরায় সেখানে চলে যান। এবার ডিউটির জন্য নয়– প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। একাকি এমন ঘোর অন্ধকারে ও সুনসান পরিবেশে তাকে চরম ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু হাকীমের বক্তব্য তাকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে। বাহুতে তার দু'টি তাবিজ বাঁধা। নিজের থেকে দু'আ-কালামও পাঠ করছেন।

মাহদী আল-হাসান হাকীমের বলা স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। পর্বতমালার ভেতরকার একটি জায়গা। গাছপালাগুলো দৈত্যের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। পরিবেশটা এতো নিস্তব্ধ যে, মাহদী আল-হাসান বুকের ধড়ফড়ানিও শুনতে পাচ্ছেন।

মাহদী আল-হাসান দিনে যে ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন, এখনো সেই কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। তিনি শব্দের দিকে এগিয়ে যান। কিছুক্ষণ নীরবতা বজায় থাকে। তিনি সামান্য অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়ে যান। এবার ক্রন্দন ধ্বনিটা পেছন দিক থেকে আসছে। তবে দূর থেকে। তিনি মোড় ঘুরিয়ে সেদিকে হাঁটা দেন। স্থানটা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাই অনায়াসে চলতে পারছেন। এই শব্দও থেমে যায়।

মাহদী আল হাসান উচ্চস্বরে বলে ওঠলেন– 'দেখা দেবে, নাকি এভাবেই ভয় দেখাতে থাকবে?'

কিন্তু তিনি নিজের উচ্চারিত শব্দগুলোই স্পষ্ট শুনতে পান। যদি তার জানা না থাকতো, এটা তারই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি, তাহলে ভয়ে পালিয়ে আসতেন। পাহাড়গুলো দেয়ালের ন্যায় খাড়া। খাড়া দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মাহদী আল-হাসানের চীৎকারটা তিন-চারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কানে এসে বাজে। তার কণ্ঠটা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাতাসে সাঁতার কাটতে থাকে।

মাহদী আল-হাসানের শব্দের গুঞ্জরণ অন্ধকার পরিবেশে মিলিয়ে গেলে তিনি একটি নারী কণ্ঠ শুনতে পান– 'আমাকে ভয় করো না। এগিয়ে আসো।'

শব্দটা দূর থেকে এসেছে। তিনি শব্দটা কয়েকবার শুনতে পান। পরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

আবারো আওয়াজ আসে– 'বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আমি দু'হাজার বছর যাবত তোমার পথ পানে চেয়ে আছি।'

মাহদী আল-হাসান এই আওয়াজও একাধিকবার শুনতে পান। পরক্ষণে মাহদী আল-হাসানের কথা গুঞ্জরিত হয় এবং প্রতিধ্বনিত হয়ে কয়েকবার কানে বাজার পর থেমে যায়।

এভাবে উভয় দিক থেকে শব্দ উঠতে ও গুঞ্জরিত হতে থাকে। প্রেতাত্মার আওয়াজে আবেদন-অনুনয় বিদ্যমান, যার ফলে মাহদী আল-হাসানের ভীতি দূর হয়ে গেছে। তিনি পর্বতমালার একেবারে ভেতরে চলে যান। সম্মুখে আলোর ঝলকানি দেখতে পান, যা কিনা আকাশের বিজলীর ন্যায় চমকে ওঠেই নিভে যায়। এই বিজলীর চমকে তিনি নিজের অবস্থানটা দেখে নেন। এই চমকে তিনি সেই সুড়ঙ্গের মুখটা দেখতে পান, যার মধ্যদিয়ে একবার অপর প্রান্তে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই থেমে যান।

কিছুক্ষণ পর আলোটা আবার চমকায় এবং তার মাধ্যমে মাহদী আল-হাসান সুড়ঙ্গের মুখে একজন মানুষ দণ্ডায়মান দেখতে পান। আলোটা কোথা থেকে আসছে বুঝা যাচ্ছে না। লোকটা মাহদী আল-হাসান থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ কদম দূরে। তিনি গভীর দৃষ্টিতে দেখেন। মুখাবয়বটা অতিশয় রূপসী একটি মেয়ের। শুধু মুখমণ্ডলই দেখা যাচ্ছে। দেহের বাকি অংশ সাদা কাফনে ঢাকা। মাহদী আল-হাসানের গা ছমছম করে ওঠে। তিনি ভয় পেয়ে যান। এবার নারী কণ্ঠ ভেসে আসে– 'আমাকে ভয় করো না। দু'হাজার বছর পর্যন্ত আমি তোমার পথপানে তাকিয়ে আছি।'

মাহদী আল-হাসান সম্মুখে এগিয়ে যান। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পর কাফনের মধ্য থেকে একটি হাত বেরিয়ে তার প্রতি এগিয়ে আসে। হাতের তালুটা এমনভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয়, যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে অগ্রসর হয়ো না। মাহদী আল-হাসান সেখানেই দাঁড়িয়ে যান। আলো নিভে যায়। তিনি এই আশায় দাঁড়িয়ে থাকেন, পুনরায় আলো জ্বলে উঠবে এবং তিনি কাফনের মধ্যকার মেয়েটাকে দেখবেন। কিন্তু তিনি আওয়াজ শুনতে পান– 'তোমাকে আমি কীভাবে বিশ্বাস করি? তুমি চলে যাও। চলে যাও।'

'আমার উপর আস্থা রাখো'– মাহ্‌দী আল-হাসান বললেন এবং সম্মুখপানে এগিয়ে গেলেন। তিনি চীৎকার করে বলছেন– 'আমি তোমারই জন্য এসেছি। তুমি আমার কাছে চলে আসো।'

মাহ্‌দী আল-হাসান সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আওয়াজ আসে– 'কাল এসো, আজ চলে যাও। তুমি ধ্বংসশীল জগতের মানুষ। তোমার প্রতিশ্রুতিও ধ্বংসশীল।'

মাহ্‌দী আল-হাসান সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন এবং সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সুড়ঙ্গের অপর মুখটাও দেখতে পান।

সুড়ঙ্গের ভেতরের তুলনায় বাইরে অন্ধকার কম। তাই সুড়ঙ্গের মুখটা দেখা যাচ্ছে। সুরমা বর্ণের এই আলোতে লম্বা মতো একটি ছায়া দেখা গেলো, যা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, যা কিনা দেখতে কাফনে পেঁচানো মেয়েটির ন্যায়। মাহ্‌দী আল-হাসান সামনের দিকে দৌড় দেন। কিসের সঙ্গে যেনো হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। উঠে আবার দৌড় দেন। সুড়ঙ্গের অপর মুখের কাছে গিয়ে হাঁক দেন। কিন্তু নিজের ধ্বনির প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কোন উত্তর মেলেনি। কান্নার শব্দও শুনতে পেলেন না। তিনি হতাশ মনে ফেরত রওনা হন।

এখনো তিনি সুড়ঙ্গের অর্ধেক অতিক্রম করেননি, এমন সময় সুড়ঙ্গের সম্মুখপানে আলো ঝলসে ওঠে। কিন্তু এই আলোতে কাফন জড়ানো লাশ নেই।

আলো নিভে গেছে। মাহ্‌দী আল-হাসান সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। সম্মুখে এবং খানিক বাঁয়ে উঁচুতে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু সেটা অন্য কোন দিকের আলো, যেনো কেউ কোনো গর্তে কিংবা টিলার পেছনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। মাহ্‌দী আল-হাসান কি যেনো ভাবেন এবং যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে হাঁটা দেন। তিনি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যান। উটটা বাইরে বাঁধা ছিলো। তিনি উটের পিঠে চড়ে বসে কায়রো অভিমুখে রওনা দেন। মনে তার কোন ভীতি নেই। তবে কেমন যেনো অস্থিরতা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। তিনি পাহাড়ের অভ্যন্তরে দেখে আসা আলো দু'টির ব্যাপারে ভাবছেন।

মাহ্‌দী আল-হাসান গন্তব্যে পৌঁছে যান। এখন গভীর রাত। তবু তার ঘুম আসছে না। বারংবার কাফন জড়ানো লাশটা চোখের উপর ভেসে উঠছে।

অভ্যাসমত মাহদী আল-হাসান ভোরবেলা উঠে পড়েন। যন্ত্রের ন্যায় নিত্যদিনের কাজগুলো সেরে নেন। আলী বিন সুফিয়ানের নিকট গিয়ে নতুন নির্দেশনা লাভ করেন, এই এলাকায় তার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে এবং তাকে শহরের বাইরে অন্য কোথাও যেতে হবে।

'না'– মাহদী আল-হাসান বললেন– 'আমাকে এখানে আরো ক'দিন কাজ করতে দিন। আমি আশা করি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে কিছু একটা পেয়ে যাবো। দু'তিন দিন পর আপনাকে বলতে পারবো অঞ্চলটা নিরাপদ কিনা।'

আলী বিন সুফিয়ান মাহদী আল-হাসানের পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন না। মাহদী সাধারণ কোন গুপ্তচর নন। একটি অঞ্চলের দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

খানিক আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর আলী বিন সুফিয়ান মাহদী আল-হাসানকে উক্ত এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমিত প্রদান করেন। মাহদী আল-হাসান পেতাত্মার মিলন লাভ না করে এলাকা ত্যাগ করতে রাজি নন। এ-ই বোধ হয় প্রথম ঘটনা, যেখানে তিনি ব্যক্তিগত বাসনাকে কর্তব্যের উপর প্রধান্য দিলেন। আলী বিন সুফিয়ান যদি ঘুণাক্ষরে টের পেতেন, মাহদী আল-হাসান অন্য কোনো মতলবে ডিউটি পরিবর্তন করতে নারাজ, তাহলে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে এই ডিউটিতে বহাল রাখতেন না। একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিজেকে এমন একটা ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করছেন, যাতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে!

মাহদী আল-হাসান হাকীমের নিকট চলে যান। তাকে রাতের ঘটনা শোনান। হাকীম চোখ বন্ধ করে মাথানত করে মনে মনে অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে মাথা তুলে মাহদী আল-হাসানের চোখের ভেতর তাকান।

'আজ রাত আবার যাও'– হাকীম বললেন– 'পাক জগতের একটি প্রাণী এই নাপাক দুনিয়ার মানুষের কাছে ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। তুমি সরলতা প্রদর্শন করবে। হয়তো বা আজো কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তুমি অধৈর্য হবে না। সে তোমার সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে আছে। অবশ্যই মিলিত হবে। এই মিলনে যদি তোমার কোনো উপকার না থাকতো, তাহলে আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতাম না। তোমার জীবনেরও কোন আশঙ্কা নেই।'

মাহ্দী আল-হাসান চলে যান। ডিউটির এলাকায় ঘোরাফেরা করেন। সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়েন। অপর প্রান্তে চলে যান। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে নীচে অবতরণ করেন। মাটিতে এক টুকরা কাপড় পড়ে থাকতে দেখেন। কাপড়টা তুলে নেন। আধা ইঞ্চি চওড়া এবং আধা গজ লম্বা এক খন্ড কাপড়। মাহ্দী আল-হাসান কাপড়টা নেড়ে চেড়ে দেখতে শুরু করেন। তারপর কাপড়টুকু হাতে করেই পুনরায় সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি উপরের দিকে তাকান, যেখানে গত রাতে আগুন দেখেছিলেন। ওদিকটা ঢালু। মাহ্দী আল-হাসান সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেন। এবার তিনি একটি পুরুষালী কণ্ঠ শুনতে পান– 'উপরে এসো না। তুমি যার জন্য এসেছো, তার সঙ্গে তোমার রাতে সাক্ষাৎ হবে।'

শব্দটি গুঞ্জরিত হয়ে বার বার কানে বাজতে থাকে।

'আমাদের জগতে এসে এভাবে খুঁজে ফিরো না।' কণ্ঠটা পুনরায় ভেসে আসে।

মাহ্দী আল-হাসান থেমে যান। তার মনে হচ্ছে, শব্দটা তার চার পার্শ্বে ঘুড়ে ফিরছে। তিনি উপরে উঠলেন। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন। তিনি সতর্ক থাকার চেষ্টা করছেন, যেনো তার দ্বারা এমন কোনো আচরণ না ঘটে, যার ফলে এখানকার কোনো প্রেতাত্মা তার কোনো ক্ষতি করে বসে।

মাহ্দী আল-হাসান স্থানটা ত্যাগ করে পেছনে ফিরে আসেন। এক স্থানে বসে ভাবতে শুরু করেন, জায়গাটার আসল রহস্য কী? এই ভাবনার মধ্য দিয়ে দিন কেটে যায়। রাতে আবার আসবেন স্থির করে ফিরে যান।

সূর্যাস্তের পর। মাহ্দী আল-হাসান রাখালের বেশ পরিবর্তন করে নতুন বেশ ধারণ করেন। দিনের বেলা ডিউটির সময় তার কাছে লম্বা একটা খঞ্জর থাকে। হাকীম তাকে জোরালোভাবে বলে দিয়েছেন, রাতে প্রেতাত্মার সাক্ষাতে যাওয়ার সময় সঙ্গে খঞ্জর বা অন্য কোন অস্ত্র রাখা যাবে না। গত রাতেও খঞ্জর নেননি। এখন তিনি রওনা হবেন। খঞ্জরটা দেয়ালের সঙ্গে ঝুলছে। মাহ্দী আল-হাসান খঞ্জরটার প্রতি তাকান এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। হাকীমের নির্দেশনা মান্য করলে খঞ্জরটা নেয়া যায় না। কিন্তু মাহ্দী আল-হাসান ভাবনার জগত থেকে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নেন, যা হয় হবে, আজ খঞ্জর নিয়ে যাবো। তিনি খঞ্জরটা দেয়াল থেকে হাতে তুলে নেন।

পোশাকের ভেতর কোমরের সঙ্গে অস্ত্রটা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

উটটা গতকালের জায়গায় বসিয়ে রেখে মাহদী আল-হাসান পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছেন, যেখান থেকে সুড়ঙ্গের মুখটা দেখা যায়। মাহদী আল-হাসান পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পান, যা তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে যায়। পরক্ষণেই উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ কানে আসে, যা অতোটা উচ্চ নয়। কিন্তু এমন সুনসান নীরবতার মধ্যে গড়িয়ে পড়া পাথরটি স্থির হওয়ার পরও শব্দটি কানে বাজতে থাকে। তারপর শব্দটি গুঞ্জরণে পরিণত হয়ে শূন্যে সাঁতার কাটতে শুরু করে, যেনো কোন মানুষ কান্নার পর ফোঁপাচ্ছে। এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এবার মাহদী আল-হাসান কারো কান্নার শব্দ শুনতে পান।

'আমার সম্মুখে এসে যাও'– মাহদী আল-হাসান উচ্চস্বরে বললেন– 'আমার জগত অপবিত্র –আমি অপবিত্র নই।'

'তুমি আমাকে আবারো ছেড়ে চলে যাবে'– নিকটের কোনো এক স্থান থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে।

মাহদী আল-হাসানের আওয়াজ আর উক্ত নারীকণ্ঠের আওয়াজ বারংবার কানে আসতে থাকে, যেনো একে অপরের পেছনে ছুটে চলছে। হঠাৎ এক স্থানে আলো ঝলসে ওঠে এবং নিভে যায়। মাহদী আল-হাসান এই আলোতে সুড়ঙ্গের মুখটা দেখতে পান। তিনি লম্বা পায়ে সম্মুখে এগিয়ে যান এবং সুড়ঙ্গের মুখের সামান্য নীচে বড় একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে পড়েন। তিনি গত রাতে উপরে যে স্থানটিতে আগুন দেখেছিলেন, তার প্রতি তাকান। আগুন তো নয়– ছিলো প্রবঞ্চনা। সেই প্রচঞ্চনা আজো বিদ্যমান।

সুড়ঙ্গের মুখটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। মাহদী আল-হাসান উপুড় হয়ে পেটে ভর করে ধীরে ধীরে উপরে উঠে যান। কয়েক মুহূর্ত পরই তিনি সুড়ঙ্গের মুখে ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে উপরে যেদিক থেকে আগুনের প্রবঞ্চনাটা আসছিলো, সেদিকে তাকান। তিনি আগুনের এমন একটি আলো দেখতে পান, যার শিখা কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

মাহদী আল-হাসান সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পান– 'দু'হাজার বছর যাবত আমি তোমার পথ পানে চেয়ে আছি।'

মাহদী আল-হাসান সুড়ঙ্গের দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে আরো ভেতরে চলে

যান। তার মনে পড়ে যায়, হাকীম তাকে বলেছিলেন, সঙ্গে অস্ত্র নেবে না। অন্যথায় মেয়েটির আত্মা তোমার সম্মুখে আসবে না। এখন তার সঙ্গে দেড়ফুট লম্বা একটা খঞ্জর আছে। তথাপি প্রেতাত্মা তার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি আরো এগিয়ে যান এবং সুড়ঙ্গের মধ্যস্থলে পৌঁছে যান। সুড়ঙ্গটা বেশ প্রশস্ত। তিনি কারো আগমন অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেয়ালের কোল ঘেঁষে বসে পড়েন। কে একজন তার গা ঘেঁষে অতিক্রম করতে শুরু করে। এতো ঘোর অন্ধকারেও তিনি অনুমান করতে সক্ষম হন, লোকটি সেই মেয়ে এবং কাফনের কাপড়ে জড়ানো।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে যায় এবং কান্নার ভান ধরে। মাহ্‌দী আল-হাসান এই শব্দ পূর্বেও কয়েকবার শুনেছেন। তার বুকটা ধড়ফড় করতে শুরু করে। কাফন-জড়ানো মেয়েটি মাথাটা মাহ্‌দী আল-হাসানের দিকে এগিয়ে দেয়। ঠিক তখন সুড়ঙ্গের মুখে আলো জ্বলে উঠে ও নিভে যায়। মাহ্‌দী আল-হাসান বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং বিদ্যুদ্গতিতে পেছন থেকে মেয়েটিকে ঝাপটে ধরেন। মেয়েটি বলে ওঠে– 'ওরে হতভাগা! এটা রসিকতার সময় নয়। আমাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় বিপদে পড়বে।'

মাহ্‌দী আল-হাসান যে সন্দেহে জীবনের বাজি লাগিয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলেছেন, তা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বুঝে ফেলেছেন, এটা যদি প্রেতাত্মা হতো, তাহলে তিনি তাকে ধরতে পারতেন না। আর সত্যিই যদি এটা প্রতারণা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি বিরাট কিছু অর্জন করে ফেলেছেন।

কাফন জড়ানো নারীর কণ্ঠ শোনামাত্র মাহ্‌দী আল-হাসান তার কানে কানে বললেন– 'উচ্চস্বরে কথা বললে খঞ্জরটা পাজরের এক পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য পাশ দিয়ে বের করবো।'

'আর আমি তোমার হৃদপিন্ড ও কলিজাটা মুখের পথে বের করে চিবিয়ে খাবো'– মেয়েটি বললো– 'আমি আত্মা।'

মাহ্‌দী আল-হাসান এক হাতে মেয়েটার বাহু ধরে রেখে অপর হাতে খঞ্জর বের করে তার আগাটা মেয়েটার পাজরে ঠেকিয়ে ধরেন। সুড়ঙ্গের সম্মুখের মুখে আরেকবার আলো জ্বলে ওঠে। ওদিকে যাওয়া মাহ্‌দী আল-হাসানের জন্য বিপজ্জনক।

'আমি এ কারণেই তোমাকে আমার কাছে আসতে দিচ্ছিলাম না যে, তুমি প্রতারক এবং ধ্বংসশীল জগতের মানুষ'– মেয়েটি ক্ষীণ অথচ ক্রিয়াশীল ভঙ্গিতে বললো– 'দুই হাজার বছর যাবত আমি তোমার পথপানে তাকিয়ে আছি।'

'তোমার অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে'– মাহদী আল-হাসান বললেন– 'এখন আর তুমি পাক জগতে ফিরে যেতে পারবে না। তুমি এখন আমাদের অপবিত্র জগতের নারী।'

'আমি নারী নই'– মেয়েটি বললো– 'আমি তরুণী। আমি রূপসী মেয়ে। আমি উচ্চশব্দে কথা বলবো না। আমার বক্তব্য গভীরভাবে শোনো। আমি জানি তুমি কে এবং এখানে কেনো এসেছো। তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে যে, আমি তোমাকে পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই পন্থা অবলম্বন করেছি।'

'তাহলে আমার সঙ্গে চলো।' মাহদী আল-হাসান বললেন।

'না'– মেয়েটি বললো– 'তোমার সঙ্গে গেলে আমরা না খেয়ে মারা যাবো। বরং তুমি আমার সঙ্গে চলো। তাহলে ফেরাউনদের সব ধনভান্ডার আমাদের হবে। তখন আর তোমাকে মরু বিয়াবান ও পাহাড়-বনে ঘুরে ফিরতে হবে না এবং সামান্য বেতন-ভাতার বিনিময়ে কারো গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়ানোর প্রয়োজন হবে না।'

'এখানে তুমি কী করছো?'

'ধনভান্ডার উত্তোলন করছি'– মেয়েটি বললো– 'আমার সঙ্গে অনেক লোক আছে।'

'তারা কোথায়?'

'আমার সঙ্গে চলো'– মেয়েটি বললো– 'সকলে তোমাকে স্বাগত জানাবে। আমাকে আলোতে দেখলে তুমি যতোসব ধনভান্ডার আর নিজের জগতের কথাই ভুলে যাবে।'

মেয়েটির সুরভিত দেহ অন্ধকারের মধ্যে মাহদী আল-হাসানকে বিমোহিত করে তুলছে। তার দেহের সৌরভে মাতাল করে তুলছে সুলতান আইউবীর এই পরিপক্ক ঈমানদার গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে। তিনি প্রথম যখন মেয়েটাকে ঝাপটে ধরেছিলেন, তখনই আঁচ করে নিয়েছেন, এই দেহ ঈমান ক্রয়ের ক্ষমতা রাখে। কণ্ঠটাও তার সুরেলা। মাদকতা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে তুলছে মাহদী আল-হাসানকে।

ঠিক সে সময়ে সুড়ঙ্গের মুখে আবারো আলো জ্বলে ওঠে। মাহদী আল-হাসান চৈতন্য ফিরে পান। তিনি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন মনে করলেন না, সুড়ঙ্গের পেছনেও তার লোকেরা আছে কিনা। সম্মুখের মুখে বের হতে চাচ্ছেন না তিনি। কারণ, তিনি নিশ্চিত, ওদিকে মানুষ আছে এবং তারাই আলো জ্বালাচ্ছে ও নেভাচ্ছে।

'ওঠো'– মাহদী আল-হাসান মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করালেন এবং বললেন– 'কাফনটা খুলে ফেলো।'

মেয়েটি দেহ থেকে কাফনটাকে খুলে ফেলে। মাহদী আল-হাসান কাপড়টা ছিঁড়ে তিনটি টুকরা বের করেন। একটি দ্বারা মেয়েটির দুই হাত পিঠমোড়া করে বাঁধেন। একটি দ্বারা টাখনুর কাছে দিয়ে পা দুটো বাঁধেন এবং অপর খন্ড দ্বারা মুখটা বেঁধে তাকে কাঁধের উপর তুলে নেন। খঞ্জরটা হাতে আছে। তিনি সুড়ঙ্গের পেছন মুখের দিকে হাঁটা দেন। এখান থেকে তাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

মাহদী আল-হাসান গতরাতে যখন এখানে এসেছিলেন, তখন প্রেতাত্মার সঙ্গেই মিলিত হতে এসেছিলেন। তখন সুড়ঙ্গের মুখে আলোর ঝলকের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত আত্মাটিকে এক নজর দেখেছিলেন। আজ দিনের বেলা এসে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়েছিলেন। সেখানে তিনি মাটিতে পড়ে থাকা পাতলা এক চিলতে কাপড় দেখতে পেয়েছিলেনে। কাপড়টা দেখামাত্র তার মনে পড়ে যায়, এরূপ কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো হয়। মাহদী আল-হাসান আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণ ও দীক্ষাপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। সামান্য বিষয় এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে তিনি অনেক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকেন। আজ রাত যখন প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন হাকীমের বারণ সত্ত্বেও তিনি খঞ্জরটা সাথে করে নিয়ে এসেছেন। এটা পরীক্ষার একটা পদ্ধতি। সঙ্গে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রেতাত্মা তাকে ধরা দিয়েছে। হাকীমের তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মাহদী আল-হাসান সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি সুড়ঙ্গের মুখে আলোর ঝিলিক দেখামাত্র সেখানে চলে যান এবং সেখান থেকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখেন। সেখানেই আগুনের শিখা লুকায়িত ছিলো। সুড়ঙ্গের মুখের আলোটা সেখান থেকেই আসছিলো।

মাহদী আল-হাসানের এ জাতীয় অন্য দু'টি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। সে ঘটনায় বেশ ক'জন খৃস্টান এজেন্ট পাকড়াও হয়েছিলো এবং তাদের প্রতারণার কৌশল ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। অন্যথায় সরল মানুষেরা এ জাতীয় আলোকে গায়েবের জ্যোতি বলেই বিশ্বাস করতো। উক্ত ঘটনা দু'টোতে অভিযান পরিচালনাকারীদের মধ্যে মাহদী আল-হাসানও ছিলেন। তিনি বুঝে ফেললেন, সুড়ঙ্গের ঠিক বিপরীতে পাহাড়ের উঁচুতে যে অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে, সুড়ঙ্গের মুখে তারই আলো এসে পড়ছে।

প্রশিক্ষণের সময় মাহদী আল-হাসান জানতে পেরেছিলেন, মৃত্যুবরণ করার পর ইহ-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তার আত্মাকে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেন না যে, সে মানুষের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়াবে। যে মৃত্যুবরণ করে, সে না দৈহিকভাবে ফিরে আসে, না আত্মা কিংবা প্রেতাত্মার আকৃতিতে। প্রশিক্ষণের সময় মাহদী আল-হাসানের মনে দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশ্বাস জন্মানো হয়েছিলো যে, আল্লাহ মানুষকে এতো বেশি দৈহিক ও আত্মিক শক্তি দান করেছেন যে, সে পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। ঈমান যতো শক্ত হবে, এই শক্তি ততো বেশি হবে। ভূত-প্রেতের বিশ্বাস মানুষের মস্তিষ্কের সৃষ্টি। খৃস্টানরা আমাদের ঈমানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে অলীক ধ্যান-ধারণা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে।

এই শিক্ষাটা জাতির প্রতিজন মানুষেরই পাওয়ার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু এটা সম্ভব ছিলো না। সুলতান আইউবী যে লড়াকু গোয়েন্দা তৈরি করেছেন, বহু কষ্টে তাদেরকে ঈমানী শক্তির ধরণ ও প্রকৃতি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদেরকে অলীক ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তাদেরকে বাস্তব দীক্ষাও প্রদান করা হয়েছে।

'খৃস্টানরা তোমাদের সম্মুখে হযরত ঈসাকে ধরায় নামিয়ে এনেছিলো– মাহদী আল-হাসানের আলী বিন সুফিয়ানের একটি পাঠ মনে পড়ে যায়– 'তোমাদের সম্মুখে খোদাকেও নামিয়ে এনেছিলো। এখন ধরে এনেছে প্রেতাত্মাদের। এ প্রতারণা তুমি নিজ চোখে দেখেছো। এও দেখেছো, এই প্রতারণার জালকে তারা কীরূপ নৈপুণ্যের সাথে বিছিয়ে থাকে। তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছো, ওসব ভেল্কিবাজি ছিলো। সেসব তৎপরতা ছিলো ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য, যা তোমরা ব্যর্থ করে দিয়েছো। আল্লাহ পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে আছেন। আল্লাহ আমাদেরকে নূর দান করেছেন। খৃস্টানরা মুসলমানদের হৃদয়জগত থেকে সেই নূরকে নিভিয়ে ফেলতে সদা তৎপর।'

সুলতান আইউবী তাঁর ফৌজ, বিশেষত তার জানবাজ সৈন্যদের অন্তরে এই নীতি প্রোথিত করে দিয়েছেন– 'তোমরা আল্লাহর নামে যতো ঝুঁকি মাথায় তুলে নেবে, তা ঝুঁকি থাকবে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভ করবে। আজ যদি তোমরা কুসংস্কারে শিকার হয়ে পড়ো, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান এতো দুর্বল হবে যে, তারা

কুফরের সম্মুখে অস্ত্রসমর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না।'

এমনি আরো কিছু পাঠ মাহদী আল-হাসানের মনে পড়ে যায়। নিজে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সেই অনুভূতিও তার হৃদয়ে জাগরুক হয়ে ওঠে।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটির হাত-পা বেঁধে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সুড়ঙ্গের অপর মুখের দিকে এগিয়ে যান। প্রশিক্ষণের সব পাঠ তার মনে পড়ে যায়। এখন তার চার পার্শ্বে সুলতান আইউবীর কণ্ঠ গুঞ্জরিত হচ্ছে– 'একজন বিশ্বাসঘাতক যেমন সমগ্র জাতিকে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে, তেমনি একজন স্বাধীনতাকামী ঈমানদার জানবাজও গোটা জাতিকে বড় বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।'

মাহদী আল-হাসানের হৃদয়ে এই অনুভূতিটা এক শক্তিশালী চেতনার রূপ ধারণ করে জেগে ওঠে যে, আমার জাতি– দেশবাসী যে গভীর ঘুম ঘুমায়, তা তারই উপর ভরসা করে ঘুমায়। তিনি গোয়েন্দাদের পাতাল যুদ্ধের জানবাজ সৈনিক। তার জানা আছে, দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিশাল বাহিনী ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ঝড় এবং তীর বৃষ্টির মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু দুশমনের গুপ্তচর ও নাশকতাকারীদের মোকাবেলা স্রেফ এক দু'জন গোয়েন্দাই করতে পারে। মাহদী আল-হাসান জাতির প্রহরী ও নিরাপত্তার জিম্মাদার। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাকে পেরেশান করে ফিরছে– 'তাহলে হাকীম সাহেবও কি দুশমনের নাশকতাকারী চক্রের সদস্য?'

এতো বড় একজন আলেম, দেশের এমন নামকরা এজন ডাক্তার– প্রশাসনের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাগণ পর্যন্ত যাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন– দুশমনের সঙ্গী হতে পারেন, মাহদী আল-হাসানের মন মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যায়, প্রশিক্ষণের সময় বলা হয়েছিলো এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও যে, কোনো পদমর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি ঈমান বিক্রয়ের পথে প্রতিবন্ধক নয়। যার আছে, ঈমান সে-ই বিক্রয় করতে পারে। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ঈমান উচ্চপদের লোকেরাই বেশি বিক্রয় করে থাকেন। তাদের ঈমানের মূল্য অধিক।

এখন মাহদী আল-হাসানের সম্মুখে সমস্যা, মেয়েটাকে নিয়ে তিনি কোন্ পথে বের হবেন এবং উট পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছবেন। মেয়েটার থেকে তিনি পথনির্দেশ নিতে চাচ্ছেন না। কারণ, ভুল নির্দেশনা দিয়ে সে তাকে নতুন

কোন ফাঁদে আটকাতে পারে। যে পথে বের হওয়া প্রয়োজন, সে পথ বন্ধ। সুড়ঙ্গের অপর মুখে বের হয়ে কোন্ পথে যেতে হবে, তার জানা নেই।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে কিছুদূর নিয়ে এক স্থানে মেয়েটাকে মাটিতে বসিয়ে রাখেন এবং তার মুখ থেকে কাপড়টা খুলে দিয়ে বললেন– 'বলবে কি আমি কোন্ পথে যাবো, যে পথে তোমার কোন লোক নেই?'

'বলবো, যদি একা যাও।'

'তুমিও আমার সঙ্গে যাবে' –মাহদী আল-হাসান বললেন– 'আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করলে তোমাকে বেঁচে থাকতে দেবো না। প্রয়োজন হলে নিজেও জীবন দেবো।'

'তুমি যেসব ভেদ জানতে চাচ্ছো, আমি সব বলে দেবো। তবু তুমি একাকি যাও।'

'সব ভেদই আমার জানা হয়ে গেছে'– মাহদী আল-হাসান বললেন– 'তুমি আমাকে পথ দেখাও।'

'একটিবার মাত্র আমাকে আলোতে দেখে নাও'–মেয়েটি বললো– 'তারপর আমাকে নিজের মনে করো। একটিবারের জন্য আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।'

মেয়েটি মাহদী আল-হাসানের পৌরুষে সুড়সুড়ি জাগানোর চেষ্টা চালায়, সোনা-জহরতের প্রলোভন দেখায়; কিন্তু রাস্তা দেখাচ্ছে না। মাহদী আল-হাসান পুনরায় কাপড় দ্বারা তার মুখটা বেঁধে ফেলেন এবং আপনা থেকে একটি নিরাপদ রাস্তা আবিষ্কার করে নেন। এই পথটা পর্বতমালার উপর দিয়ে। তিনি হাত-পা বাঁধা মেয়েটাকে সেখানেই বসিয়ে রেখে নিজে উপরে আরোহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু নীচে কারো শব্দ শুনে সেখানেই থমকে দাঁড়ান। এক পুরুষ মেয়েটাকে ডাকছে। মাহদী আল-হাসান ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসেন এবং মেয়েটির সন্নিকটে একটি পাথরের আড়ালে বসে পড়েন। লোকটি বোধ হয় মেয়েটাকে দেখে ফেলেছে।

'তুমি কথা বলছো না কেন?'– লোকটি জিজ্ঞেস করে এবং উপরে উঠে আসতে শুরু করে। মেয়েটার মুখ বন্ধ। লোকটি তার একেবারে কাছে চলে এসে বললো– 'কী হয়েছে তোমার? ওদিকে যাওনি কেনো?'

মাহদী আল-হাসান তার পার্শ্বেই বসা। ব্যবধান দু-চার পায়ের। তিনি উঠে সর্বশক্তি ব্যয়ে লোকটির পিঠে খঞ্জরের আঘাত হানেন। পরক্ষণেই

আরেক আঘাত। দু'টি আঘাতই সফল হয়। লোকটি কোনো শব্দ করারও সুযোগ পেলো না। মাহ্দী আল-হাসান তাকে টেনে নিয়ে সেই পাথরটার নীচে ফেলে দেন, যার তলে তিনি নিজে লুকিয়ে ছিলেন। তিনি মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যান। পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়। তবে উপরটা চওড়া। তিনি হাঁটতে শুরু করেন।

মাহ্দী আল-হাসানের জন্য সহজ উপায় এটাই ছিলো যে, তিনি রাতটা কোথাও লুকিয়ে থাকবেন এবং দিনের আলোতে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু তাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো পৌঁছে যেতে হবে, যাতে রাত পোহাবার আগে আগেই হাকীমের গ্রেফতারী এবং এই অঞ্চলটাকে অবরোধ করে ফেলার আয়োজন করা যায়।

এই পার্বত্য ভূখন্ডটির অভ্যন্তরে– যে পর্যন্ত কোন পথচারি কিংবা রাখাল পৌঁছে না– এক পাহাড়ের পাদদেশে একটি গুহার মুখ আছে। মুখটি অপ্রশস্ত। তারই পেছনে এতো প্রশস্ত এক গুহা, যেনো ওটা গুহা নয়– সুপরিসর একটি কক্ষ। তার মধ্যে বসে আছে বহু সংখ্যক মানুষ। দু'টি মেয়েও আছে।

'এ যাবত তো তার ফিরে আসার কথা ছিলো।'একজন বললো।

'এসে পড়বে'– অপর একজন বললো– 'এখানে কোনো বিপদ নেই। আজ সে তাকে নিয়েই আসবে।'

'লোকটা কাজের'– একজন বললো– 'বেটা অনেক অভিজ্ঞ। আমরা তাকে প্রস্তুত করে নেবো।'

এমন সময় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে ভেতরে ঢুকে বললো– 'গোপাল মৃত পড়ে আছে। মেয়েটির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। গোপালকে খঞ্জরের আঘাতে মারা হয়েছে!'

'ওহ্, মাহ্দী আল-হাসান কোথায়?' একজন জিজ্ঞাসা করে।

'কোথাও পাওয়া যায়নি'– আগন্তুক জবাব দেয়– 'তার উট এখানেই আছে। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

দু'টি প্রদীপ হাতে নিয়ে সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। তারা সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত গিয়ে খোঁজাখোঁজি করে। ওখানে তাদের সঙ্গীর লাশ পড়ে আছে। তারা সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে দেখে মেয়েটির কাফনটা পড়ে আছে। দলনেতা বললো, দু'জন লোক বাইরে চলে যাও। বাইরের দিক থেকে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে

সংবাদ দিও। আর তাকে পাওয়া গেলে ধরে ফেলো। মোকাবেলা করলে মেরে ফেলো। অন্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ো। লোকটা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সকাল পর্যন্ত পাওয়া না গেলে আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে এখন মহা বিপাকে। সুড়ঙ্গওয়ালা পাহাড় থেকে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন। সামনের পাহাড়টি বেশ উঁচুও বটে। যেন একটি প্রাচীর, যার উপর এক সঙ্গে উভয় পা রাখা অসম্ভব। তিনি এই দেয়ালসম পাহাড়টির উপর ঘোড়ার পিঠে বসার মতো বসে পড়েন। বসে বসে সম্মুখের দিকে এগুতে থাকেন। মেয়েটিকে কাঁধের উপর সামলে রাখা এবং তার ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। মেয়েটিও তার ভারসাম্য ব্যাহত করার জন্য নড়াচড়া করতে শুরু করে। মাহদী আল-হাসান বুঝে, এখান থেকে পড়ে গেলে হাড়-গোড় ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। তারপরও মেয়েটির এই আত্মঘাতি আচরণ। তা থেকেই তিনি অনুমান করে নেন, এই পার্বত্য এলাকায় যে রহস্য আছে– যার সবকিছু এই মেয়েটির বক্ষে প্রোথিত– এতোই মূল্যবান এবং স্পর্শকাতর যে, তাকে লুকাবার স্বার্থে মেয়েটি মাহদী আল-হাসানকেসহ পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে।

মাহদী আল-হাসান এগিয়ে চলছেন। কিন্তু পথ শেষ হচ্ছে না। মেয়েটি তাকে ব্যাঘাত করেই যাচ্ছে। ওদিকে মেয়েটির দলের লোকেরা অনুসন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতিটা তাদের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন। আস্তানা ধরা পড়া তাদের জন্য পরাজয়। ধরা পড়লে অসহনীয় নির্যাতন আর মৃত্যু অনিবার্য।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটির একটি বাহু এমন শক্তভাবে ধরে রেখেছেন যে, তার হাড়-গোড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই মুহূর্তে দৈহিক শক্তি ও সাহসিকতা ছাড়াও তিনি আত্মিক শক্তিও প্রয়োগ করছেন। অবশেষ সব শক্তির বিনিময়ে তিনি প্রাচীর অতিক্রম করে অপর প্রান্তে পৌঁছে যেতে সক্ষম হন।

সামনের চূড়াটা বেশ চওড়া। মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে ধপাস্ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– 'তুমি কি আমার পথ আগলেই রাখবে?' ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি মেয়েটিকে চীৎ হওয়া অবস্থায় কয়েক পা হেঁচড়ে নেন এবং বললেন– 'আর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করলে এভাবে টেনে-হেঁচড়েই নিয়ে যাবো। মরতেই যদি চাও, তো মরে যাও।'

মাহদী আল-হাসান দূরে নীচে একটি প্রদীপ দেখতে পান। তিনি অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, এখন তিনি আপদমুক্ত। ধরা পড়ার আশঙ্কা আর নেই। কিন্তু এখান থেকে বের হওয়া সহজ হবে না। অথচ, তাকে অতি দ্রুত কায়রো পৌঁছতে হবে। তিনি মেয়েটির পা খুলে দেন। হাত দু'টো পিঠমোড়া করে বাঁধা আছে। তাকে নিজের সম্মুখে নিয়ে এসে খঞ্জরের আগা তার পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে বললেন– 'চলো, আমার কথা ছাড়া ডানে-বাঁয়ে তাকাবে না। মাহদী আল-হাসান ও মেয়েটির সন্ধানে ছড়িয়ে পড়া লোকগুলো সুড়ঙ্গ পথ ও তার আশ-পাশের এলাকায় ঘুরে ফিরছে। তিনি যে পথে ভেতরে যাওয়া-আসা করেছেন, দু'ব্যক্তি সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে নিয়ে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এমন এক টিলায় এসে পৌঁছান, যার সম্মুখে আর কিছু নেই। তার এতোটুকু দক্ষতা আছে যে, তিনি ঘোর অন্ধকারেও অপরিচিত এলাকার ভাব-গতি আন্দাজ করতে পারেন। তিনি বুঝে ফেললেন, নীচে নদী এবং এটাই নীল নদ। তিনি মেয়েটির হাতের বন্ধন খুলে দেন। মুখের কাপড়ও সরিয়ে নেন। টিলার ঢাল খাড়া। তিনি মেয়েটিকে বললেন, বসো এবং নীচে পড়ে যাও।'

উভয়েই নিজেদেরকে টিলার ঢালে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে আসেন। নদীর পানির কলকল ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যেতে শুরু করে। মাহদী আল-হাসান ও মেয়েটি এখন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে বললেন –'ঝাপ দাও।' মেয়েটি বললো– 'আমি সাঁতার জানি না।'

মাহদী আল-হাসান খঞ্জরটা কোষবদ্ধ করে কোমরের সঙ্গে বেঁধে নেন। মেয়েটিকে শক্তভাবে বগলদাবা করে নদীতে ঝাপিয়ে পড়েন। নদীর গতি কায়রোরই দিকে। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর হঠাৎ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আস্তে করে মেয়েটিকে ছেড়ে দেন। দেখলেন, মেয়েটি নৈপুণ্যের সাথেই সাঁতার কাটছে।

'আমি জানতাম, তুমি সাঁতার জানো'– মাহদী আল-হাসান সাঁতার কাটতে কাটতে বললেন– 'সব বিদ্যায় পারদর্শী বানিয়েই তোমাদেরকে আমাদের দেশে পাঠানো হয়। বেশি পরিশ্রম করো না। আমরা যেদিকে

যাচ্ছি, স্রোতের গতিও সেদিকেই।'

মেয়েটি সাঁতার কাটা অবস্থায় মাহ্দী আল-হাসানকে নিজের রূপবান টাটকা শরীরটা শেকলে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে; কিন্তু তার প্রচেষ্টা বিফল যায়।

বেশ কিছুদূর পথ অতিক্রম করার পর মাহ্দী আল-হাসান ভাবলেন বিপদের আর কোনো শঙ্কা নেই। তিনি মুখে দু'টি আঙুল ঢুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে শিশ বাজান। এখন তিনি সাঁতার কাটছেন আর কিছুক্ষণ পর পর শিশ বাজান। অল্পক্ষণ পর তিনি দূর থেকে অনুরূপ একটি শিশ শুনতে পান। পরক্ষণেই দু'দিক থেকে শিশ বিনিময় হতে হতে একটি নৌকা তাদের নিকটে এসে পৌঁছে।

মাহ্দী আল-হাসানের জানা ছিলো, যেভাবে সীমান্ত এলাকায় দেশের সীমান্ত নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে টহল সান্ত্রীরা ঘুরে বেড়ায়, তেমনি নদীতেও টহল প্রহরা থাকে। বিপদ দেখা দিলে একজন অন্যজনকে ডাকার জন্য এভাবে শিশ বাজিয়ে থাকে। এই নৌকাটাও টহল সান্ত্রীদের। মাহ্দী আল-হাসান তাদেরকে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। সান্ত্রীরা তাকে ও মেয়েটিকে নৌকায় তুলে নেয়।

মেয়েটির সাঙ্গরা তাকে পাহাড়ে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে।

আলী বিন সুফিয়ান গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। এক চাকর তাঁকে জাগিয়ে বললো, মাহ্দী আল-হাসান নামক এক লোক একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মাহ্দী আল-হাসান নামটাই যথেষ্ট ছিলো। আলী বিন সুফিয়ান ধড় মড় মরে উঠে দাঁড়ান এবং ছুটে বাইরে চলে আসেন।

মাহ্দী আল-হাসান ও মেয়েটির পরিধানের কাপড় থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে। আলী বিন সুফিয়ান উভয়কে কক্ষে নিয়ে বসান। কক্ষে বাতি জ্বলছে। প্রদীপের আলোতে প্রথমবারের মতো মাহ্দী আল-হাসান মেয়েটির মুখাবয়ব দেখলেন এবং ভাবলেন, মেয়েটি তো ঠিকই বলেছিলো– 'আমাকে আলোতে দেখলে তুমি সবকিছু ভুলে যাবে।'

মাহ্দী আল-হাসান হাকীমের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'এক্ষুনি তার ঘরে অভিযান চালান।'

'মাহ্দী!' –আলী বিন সুফিয়ান হঠাৎ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন– 'কার কথা বলছো?'

'কেনো? ঈমান বিক্রয় নতুন খবর নাকি?'–মাহদী আল-হাসান বললেন এবং মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেন– 'কি, হাকীম তোমাদের সঙ্গী না? এখানে মিথ্যা বললে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।'

মেয়েটি মাথাটা নত করে ফেলে। আলী বিন সুফিয়ান তার ভেজা মাথায় হাত রেখে বললেন– 'এখানে তোমার সঙ্গে সেই আচরণ করা হবে না, তুমি যার আশঙ্কা করছো। তোমার রূপ-যৌবনের জন্য আমরা পাথর। আর অসহায় নারীর ইজ্জত রক্ষার সময় আমরা রেশমের ন্যায় কোমল। বলো, হাকীম কি তোমাদের সঙ্গী?'

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বাচক উত্তর দেয়।

মাহদী আল-হাসান কী করে এসেছেন এবং কীভাবে হাকীম তাকে প্রেতাত্মার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলো, সংক্ষেপে তার বিবরণ প্রদান করেন।

আলী বিন সুফিয়ান তার চাকর-নওকর ও রক্ষী সেনাদের তলব করেন। তাদেরকে বিভিন্ন কমান্ডারের নিকট বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেন। কোতোয়াল বিলবীসকেও তলব করেন। তিনি এরূপ বিশেষ পরিস্থিতির জন্য বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটি দল তৈরি করে রেখেছেন, যারা কয়েক মিনিটের মধ্যে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে সক্ষম।

মাহদী আল-হাসানের রিপোর্ট অনুযায়ী বাহিনী তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান গিয়াস বিলবীসকে দায়িত্ব প্রদান করেন, তিনি হাকীমের ঘরে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করবেন এবং তার বাড়ি ও দাওয়াখানা সীল করে দেবেন। গিয়াস বিলবীস এক ঘোড়ায় মাহদী আল-হাসানকে এবং আরেক ঘোড়ায় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে বাহিনীসহ রওনা হন।

মেয়েটির দলের লোকেরা এতোক্ষণে তাকে অনুসন্ধান করে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওখান থেকে বেরিয়ে পালাবে। তাদের আশংকা হলো, মেয়েটি যদি কায়রো পৌঁছে যায়, তাহলে তাদের আস্তানার কথা বলে দিতে বাধ্য হবে। তবে দলে মতবিরোধ হয়ে গেছে। কেউ বলছে, মাহদী আল-হাসানের উট এখনো এখানে। তথাপি যদি সে বেরিয়ে গিয়েই থাকে, তবু অতো তাড়াতাড়ি কায়রো পৌঁছতে পারবে না। এই মতানৈক্যের কারণে তারা এলাকা ত্যাগ করতে বিলম্ব করে ফেলেছে। অবশেষে তারা মালামাল গুটিয়ে গুহাসম

কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। এমন সময় অনেকগুলো ধাবমান ঘোড়ার পদশব্দ তাদের কানে আসতে শুরু করে। বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

আলী বিন সুফিয়ানের সৈন্যরা প্রদীপ জ্বালিয়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েটি তাদের সঙ্গে আছে। সে তার সঙ্গীদের আস্তানা চিহ্নিত করে দেয়। বাহিনী সেখানে গিয়ে পৌঁছে। গুহার ভেতর থেকে চার-পাঁচজন লোক ধরা পড়ে। উদ্ধার হয় নানা রকম জিনিসপত্র– দাহ্য পদার্থ, তীর-ধনুক ও খঞ্জর ইত্যাদি। একটি মজবুত বাক্সে সোনা-রূপার সেই মুদ্রা, যা মিসরে সচল। ধৃতদের মধ্যে একজন মাত্র খৃস্টান। অন্যরা কায়রোর মুসলমান। তাদের নির্দেশনা মোতাবেক অন্য সঙ্গীদের অনুসন্ধান শুরু হয়। সারারাত এবং পরের পুরো দিন তল্লাশী চলে। ধরা পড়ে সব সদস্য। তন্মধ্যে দু'জন মেয়ে– ঠিক মাহদী আল-হাসানের ধৃত মেয়েটির ন্যায়, যাদেরকে আলোতে দেখলে সব ভুলে যেতে হয়।

কায়রোতে হাকীমের বাসভবনটি ঘেরাও করে দরজায় করাঘাত করলে এক চাকর দরজা খুলে দেয়। গিয়াস বিলবীস কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন। তারা হাকীমের বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি চালাতে শুরু করে। তাদের হাতে প্রদীপ। হাকীমের শয়নকক্ষটা ভেতর থেকে বন্ধ। আওয়াজ দিলে অর্ধনগ্ন এক মেয়ে দরজা খুলে দেয়। হাকীম পালঙ্কের উপর অর্ধ-উলঙ্গ পড়ে আছেন। পালঙ্কের কাছে মদের পিপা ও পেয়ালা। হাকীম নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অচেতন পড়ে আছেন। তার একজন রোগী কিংবা ভক্ত বিশ্বাসই করবে না, তিনি এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। মেয়েটি তার স্ত্রী নয়, মুসলমানও নয়– খৃস্টানদের প্রেরিত উপহার। তার গৃহ থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদ-ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে তার হালাল পন্থায় উপার্জিত নয়।

হাকীমের যখন চৈতন্য ফিরে আসে, তখন সে আলী বিন সুফিয়ানের কয়েদখানায় শিকলপরা অবস্থায় বন্দি। গিয়াস বিলবীসকে সংবাদ দেয়া হলো, হাকীম জাগ্রত হয়েছেন। তিনি হাকীমের নিকট চলে যান। বললেন, গোপন রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত হাকীম অপরাধ স্বীকার করে নেন। তিনি দু'জন নায়েব সালারের নাম উল্লেখ করে বললেন, তারা সুলতান আইউবীকে ক্ষমতাচ্যুত করার তৎপরতায় লিপ্ত আছে। তারা খৃস্টানদের ক্রীড়নক

হিসেবে কাজ করছে। উপহারস্বরূপ এই মেয়েটিকে এবং আরো বিপুল পরিমাণ সোনা-দানা দিয়ে হাকীমকেও এই দলে যুক্ত করে নেয়া হয়েছে। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন, নতুন সরকারে আমাকে মন্ত্রী বানাতে হবে। তার এই শর্তও মেনে নেয়া হয়। দেশের বিখ্যাত ও বড় হাকীম এবং বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি যখন যা বলতেন, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা হতো। এই গ্রহণযোগ্যতার সুযোগে তিনি সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বিষোদগার চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কায়রোতে নাশকতার যতো ঘটনা ঘটেছিলো, সবগুলোতে হাকীম জড়িত। ব্যক্তিত্বশীল লোক হওয়ার সুবাদে তিনি আলী বিন সুফিয়ানের বেশ ক'জন গোয়েন্দাকেও কিনে নিয়েছিলেন। মাহদী আল-হাসান তাদের একজন। হাকীম তার সঙ্গীদের নিয়ে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মাহদী আল-হাসানকে হত্যা করে ফেলবেন। কিন্তু পরে এই ভেবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়, মাহদী অতিশয় সাহসী ও যোগ্য লোক। হত্যা না করে বরং তাকে জালে আটকিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে হবে। সেই বুদ্ধি তাদের আছে। ইতিমধ্যে আলী বিন সুফিয়ানের কতক গোয়েন্দাকে হাত করে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছেও তারা। অথচ, গোয়েন্দা বিভাগে এখনো তারা বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে বিবেচিত। অবশেষে হাকীম মাহদী আল-হাসানকে জালে আটকানোর পন্থা অবলম্বন করেন।

হাকীম পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন, মাহদী আল-হাসান তার সুদর্শন 'প্রেতাত্মার'র ফাঁদে এসে পড়বে। তারপর তাকে হাত করা ও নিজেদের মতো করে প্রস্তুত করার জন্য আছে হাশিশি ও খৃস্টান বিশেষজ্ঞরা।

মিসরের যে দু'জন কমান্ডার রহস্যময় উপায়ে খুন হয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে হাকীম তথ্য প্রদান করেন। ঔষধের নামে হাকীম তাদেরকে এমন বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন, যাতে বিন্দুমাত্র তিক্ততা অনুভূত হয়নি। এমন বিষ, যা সেবন করে মানুষ নিজের মধ্যে কোন প্রকার যন্ত্রণা কিংবা পরিবর্তন অনুভব করে না এবং সেবনের বারো ঘন্টার মাথায় হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তাদেরকে কেন খুন করা হলো? প্রশ্নের জবাবে হাকীম জানান, তারা সুলতান আইউবী ও তাঁর সরকারের অনুগত এবং দীনদার মুসলমান ছিলেন। তাদের ঈমান ক্রয় করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা

ঈমান বিক্রি করার পরিবর্তে ক্রয়কারীদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠেছিলেন। হাকীম প্রথমে তাদের একজনের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হন, যেনো সাক্ষাৎটা হঠাৎ হয়ে গেছে। কথায় কথায় হাকীম তার মনে কোনো একটি রোগের ভয় ধরিয়ে দেন এবং নিজের দাওয়াখানায় নিয়ে গিয়ে ঔষধের নামে বিষ খাইয়ে দেন। এই বিষ হাশিশিদের আবিষ্কার। দিন কয়েক পর হাকীম অপর কমান্ডারের সাথেও অনুরূপ হঠাৎ সাক্ষাৎ করে বসেন এবং একই কায়দায় তাকেও বিষ প্রয়োগ করেন।

এসব চাঞ্চল্যকর ও হৃদয় কাঁপানো তথ্য হাকীম আপনা থেকে দেননি। পাতাল কক্ষের নির্যাতন তাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। তিনি জানান, দেশের সেনা বাহিনীতে একদিকে অস্থিরতা ছড়ানো, অন্যদিকে তাদের মাঝে নেশা ও যৌনতার স্বভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেনা অফিসারদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি দৃঢ় চেতনাসম্পন্ন শক্ত ঈমানদারদেরকে রহস্যময় উপায়ে হত্যা করার ধারা চলছে। সুদানের ফৌজ অতিসত্বর মিসরের সীমান্ত ও সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর হামলা চালাতে যাচ্ছে। এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবে স্বয়ং খৃস্টানরা। সীমান্ত এলাকার অধিবাসীদেরকে সুদানীরা হাত করে নেবে।

আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস তাদের গ্রেফতার অভিযান, অনুসন্ধান ও তথ্য প্রাপ্তির এসব খবরাখবর মিসরের অস্থায়ী গবর্নর আল-আদিলকে অবহিত করতে থাকেন। কিন্তু অন্য কাউকে এসব ব্যাপার-স্যাপার কিছুই জানতে দিচ্ছেন না। হাকীম ও তার অপর সঙ্গীরা যেসব নায়েব সালার ও কর্মকর্তাদের নাম বলেছেন, তাদের গ্রেফতার করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিল সাহস করছেন না। তিনি এই রহস্যকে রহস্যই রাখার নির্দেশ প্রদান করে বললেন, পরিস্থিতিটা এতই স্পর্শকাতর যে, আমি মনে করি, সুলতান আইউবী এসে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে ভালো হবে। অবস্থাটা আসলে স্পর্শকাতরই ছিলো। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নিজে সুলতান আইউবীর নিকট যাবেন এবং তাঁকে মিসর ফিরে আসতে বলবেন কিংবা তাঁর থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করবেন।

আল-আদিলের সুলতান আইউবীর নিকট যাওয়ার বিষয়টি গোপন রাখা হলো। সকল সন্দেহভাজন নায়েব সালার প্রমুখদের সঙ্গে একজন

করে গোয়েন্দা ছায়ার ন্যায় জুড়ে রাখা হলো। গোয়েন্দারা তাদের প্রতি মুহূর্তের গতিবিধি অনুসরণ করছে।

'আমি তোমার থেকে কোনো নতুন খবর শুনছি না'– হালবের সন্নিকটে নিজ হেডকোয়ার্টারে বসে আল-আদিল থেকে বিস্তারিত শুনে সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি জানি না, জাতির মধ্যে ঈমান বিক্রির যে ব্যাধির জন্ম নিয়েছে, তার চিকিৎসা কী হবে। আমার দৃষ্টি বাইতুল মুকাদ্দাস নয়– ইউরোপের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু আমার ঈমান নীলামকারী ভাইয়েরা আমাকে মিসর থেকেই বের হতে দিচ্ছে না! সে যা হোক, এই ময়দান তুমি সামাল দাও। আমি দামেশ্ক যাচ্ছি। সেখান থেকে মিসর চলে যাবো।'

সুলতান আইউবী আল-আদিলকে রণাঙ্গনের পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বললেন, আমার গোয়েন্দারা এতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, খৃস্টানরা যদি আক্রমণ করে বসে, তাহলে অন্তত দু'-তিনদিন আগে তুমি সংবাদ পেয়ে যাবে। আমার কমান্ডো সৈন্যরা প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত অবস্থায় থাকে। আমি তাদেরকে আক্রমণের সম্ভাব্য স্থানগুলোতে লুকিয়ে রেখেছি। সর্বশেষ টাটকা সংবাদ হলো, ক্রুসেডাররা হামলা করবে না। যদি আমার অনুপস্থিতি থেকে তারা ফায়দা লুটতে চেষ্টা করে, তাহলে ভয় পেয়ো না। দুর্গে আবদ্ধ থেকে লড়াই করো না। দুশমনকে সামনে আসার এবং আগে হামলা করার সুযোগ দেবে। প্রয়োজনে পেছনে সরে যাবে। এখানকার ভূমি যুদ্ধের জন্য আমাদের উপযোগি। উঁচু স্থানগুলোতে দখল বজায় রাখবে।

'আর বিশেষভাবে স্মরণ রাখবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন এবং যেসব আমীর আমাদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে, তাদের মস্তিষ্ক থেকে রাজত্বের মোহ দূর হয়নি। চুক্তি মোতাবেক তারা কোন বাহিনী রাখতে পারে না। আমি তাদের মধ্যে গোয়েন্দা প্রেরণ করে রেখেছি। আর জীবনে এ-ই প্রথম আমি আমার নীতি পরিপন্থী সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখেছি, আমার এই মুসলমান ভাইয়েরা যদি সামান্যতম বিরোধিতামূলক আচরণ করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবো।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, ৫৭২ হিজরীর রবিউল আউয়ালে (মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১১৭৬)। সুলতান আইউবী রণাঙ্গন আল-আদিলের হাতে ছেড়ে দিয়ে দামেশ্‌ক চলে গিয়েছিলেন। তাঁর আরেক ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ ইয়ামান থেকে ফিরে আসেন। ইয়ামানেও ক্রুসেডারদের অপতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং সেখানকার মুসলমানগণ সালতানাতে ইসলামিয়ার বিদ্রোহী হয়ে ওঠতে শুরু করেছিলো। সুলতান আইউবী আপন ভাই শামসুদ্দৌলাকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। শামসুদ্দৌলা সাফল্য নিয়ে এসেছেন। সুলতান আইউবী তাঁকে দামেস্কের গবর্নর নিযুক্ত করে ১১৭৬ সালের অক্টোবর মাসে মিসর রওনা হওয় যান।

সুলতান আইউবী এখন কায়রোতে। কায়রো পৌঁছেই তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে গ্রেফতার করার নির্দেশ প্রদান করেন। তালিকা প্রস্তুত। তাদের গ্রেফতারীর আগের দিন পার্বত্য অঞ্চলের গুহা থেকে উদ্ধারকৃত সোনা ও ধনভান্ডার পেরেড ময়দানে এনে স্তূপ করেন। সে পর্যন্ত যতো খৃস্টান মেয়েকে পাকড়াও করা হয়েছিলো এবং সর্বশেষ যাদেরকে ধরা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ধনভান্ডারের স্তূপের নিকট এনে দাঁড় করানো হয়। তাদের মধ্যে হাকীম সাহেবও আছেন। নায়েব সালারও আছেন। আছেন অনেক কমান্ডার। সকলে শিকল পরিহিত। মিসরের সকল সৈন্যকে তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিয়ে ময়দানে এনে দাঁড় করানো হয়।

সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে ময়দানে এসে বাহিনীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যান।

'আমি জানতে পেরেছি, তোমাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হচ্ছে'– সুলতান আইউবী উচ্চকণ্ঠে গর্জন করে বললেন– 'তোমাদের কেউ যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, সে ইসলামের মর্যাদা ও আল্লাহর'র রাসূলের খাতিরে তোমাদেরকে আমার ও আমার সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে এবং প্রথম কেবলা মুক্ত করার ও স্পেন আক্রমণ করে দেশটা পুনরায় সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিজ্ঞা রাখে, তাহলে সে আমার সম্মুখে এসে পড়ুক। সে আমার তারবারীটা নিয়ে নিক এবং আমার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করুক। দেশের শাসন ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে আমি অবসর গ্রহণ করবো।'

সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে যায়।

সুলতান আইউবী পেছন দিকে মোড় ঘুরিয়ে আসামীদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমার স্থান দখল করার মতো লোক তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি? আসো, সামনে এগিয়ে আসো। কা'বার প্রভুর কসম করে বলছি, আমি আমার ক্ষমতা তোমার হাতে তুলে দেবো এবং নিজে তোমার আনুগত্য মেনে চলবো।'

নীরবতা আরো গভীর হয়ে যায়। নিঃশ্বাসটুকু ফেলার শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

'আল্লাহর সৈনিকগণ!'– সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীর দিকে মোড় ঘুরিয়ে বললেন– 'তোমাদেরকে বিদ্রোহের জন্য না ইসলামের মর্যাদার খাতিরে উত্তেজিত করা হচ্ছে, না রাসূলে খোদা (সা.)-এর আদর্শের স্বার্থে। যে ধনভান্ডার তোমাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছে, যে মেয়েগুলো তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সেসব সেই পুরস্কার, যেগুলো এদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এগুলো এদের ঈমানের মূল্য। আমি এদের প্রত্যেককে বলছি, তোমরা সম্মুখে এগিয়ে আসো আর বলো, আমি যা বলছি মিথ্যা বলছি।'

'কেউ এগিয়ে আসলো না। সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং আসামীদের মধ্য থেকে হাকীমকে বাহুতে ধরে টেনে ঘোড়ার নিকটে এনে বললেন– 'আমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো আর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দাও, আইউবী মিথ্যা বলছে।'

হাকীম সুলতান আইউবীর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। কিন্তু তিনি মাথাটা নত করে ফেললেন।

'বলো, সুলতান মিথ্যা বলছে।' সুলতান আইউবী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন।

হাকীম মাথা তুলে উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'সুলতান আইউবী যা বলেছেন, সত্য বলেছেন।' বলেই হাকীম ঘোড়া থেকে নেমে আসেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সঙ্গীরা এ-ই প্রথম সুলতান আইউবীকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখেছে।

হাকীম ঘোড়া থেকে নেমে মাথানত করে দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতান আইউবী তারবারী বের করে এক আঘাতে হাকীমের মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে অত্যন্ত উঁচু কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন– 'আল্লাহ'র সৈনিকগণ! ইসলামের প্রহরীগণ! আমি

যদি অবিচার করে থাকি, তাহলে এই নাও, আমারই তারবারী দ্বারা আমার ঘাড় উড়িয়ে দাও।' সুলতান আইউবী তরবারীটা বর্শা ছোঁড়ার ন্যায় বাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মারেন। তরবারীর আগা মাটিতে গেঁথে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

সর্বসম্মুখের সালার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তরবারীটা তুলে উভয় হাতে করে আদবের সঙ্গে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'মহামান্য সুলতান! এতো আগেবপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।' বাহিনীর মধ্যে রব উঠে যায়। তারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সুলতান আইউবী দু'হাত উপরে তুলে সৈন্যদের শান্ত করেন এবং অপরাধীদের শাস্তি ঘোষণা করেন।

সুলতান আইউবী সেদিনই লিখিত বার্তাসহ সুদানে দূত প্রেরণ করেন– 'সুদানের ফৌজ যদি মিসরের সীমান্তে সামান্যতম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, তো আমি তাকে মিসর আক্রমণ বলে বিবেচনা করবো আর তার উত্তরে আমি সুদান আক্রমণের অধিকার সংরক্ষণ করবো। তখন আমরা সুদানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন না করে ক্ষান্ত হবো না।
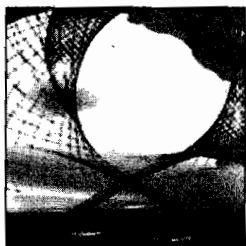
দায়িত্ব যখন সঙ্গীকে হত্যা করল

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী থেকে যে খুন টপ টপ করে ঝরছিলো, সেগুলো পরিষ্কার না করেই তিনি তরবারীটা খাপে ঢুকিয়ে ফেলেন। এই রক্ত সেই বিশ্বাসঘাতক হাকীমের, যিনি ক্রুসেডারদের চর ও সন্ত্রাসীর ভূমিকা পালন করছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানোর অপরাধে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিলো, শিকল বেঁধে তাদেরকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। সুলতান আইউবী তাঁর সালার, নায়েব সালার, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঝে বৈঠকে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছেন। চোখে রক্ত নেমে এসেছে তাঁর। বৈঠকে সববেতেদের উদ্দেশে তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং বলতে বলতে এক পর্যায়ে থেমে গেছেন। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সুলতানের আবেগ-উচ্ছ্বাস সম্পর্কে ভালোভাবেই জানা আছে। আইউবীর চোখে চোখ রাখার সাহস কারো নেই।

'মহামান্য সুলতান!' –এক সালার বললেন– 'আমরা খৃস্টানদের কোন ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবো না।'

সুলতান আইউবী হঠাৎ দ্রুততার সঙ্গে কোষ থেকে তরবারীটা বের করেন। অস্ত্রটা রক্তমাখা। তিনি তরবারীটা সমবেতদের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন– 'এই রক্ত কার? এই রক্ত আপনাদের সকলের। এই রক্ত আমার। এই রক্ত আমাদের সেই ভাইয়ের, যে মসজিদে আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করতো। তার ঘরে কুরআনও আছে। এই রক্ত যদি গাদ্দার হতে পারে, তাহলে... তাহলে খৃস্টানদের এই ষড়যন্ত্রও সফল হবে। খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে গেছে। ইসলামের যে সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তীনকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করার কথা ছিলো, আপসে সংঘাতে জড়িয়ে খৃস্টানরা তাদেরকে এমন দুর্বল করে ফেলেছে যে, আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস ছিলো। আজ আমাদেরকে কায়রো নয়– জেরুজালেম

থাকার কথা ছিলো। কিন্তু ইসলামের সামরিক শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবী তরবারীটা তাঁর দারোয়ানের প্রতি ছুঁড়ে মারেন এবং পরক্ষণেই খাপটাও খুলে তা হাতে দিয়ে বললেন– 'এই রক্ত যদি কোনো কাফিরের হতো, তাহলে আমি তরবারীটা ধৌত করাতাম না। এ এক গাদ্দারের খুন। খাপে এই রক্তের ঘ্রাণও যেনো না থাকে।'

দারোয়ান তরবারী ও খাপ পরিষ্কার করার জন্য বাইরে নিয়ে যায়। সুলতান আইউবী সববেতদের বললেন– 'খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। তারা চাচ্ছিলো, যেনো আমি হাল্‌ব অতিক্রম করে সম্মুখে যেতে না পারি। দেখছো না, সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আমি কায়রো এসে পড়েছি! আমি আপনাদেরকে প্রবঞ্চনার মধ্যে রাখবো না। ক্রুসেডাররা এখন সম্মুখে অগ্রসর হবে। আমরা যে সময়ে আপসে লড়াই করছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে সিদ্ধান্তমূলক পরাজয় দানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো।'

'আমরা মুসলমানদেরকে আপসে যুদ্ধ করিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর গতি ঘুরিয়ে দিয়েছি।' ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড বললেন। তারা গোয়েন্দা মারফত সংবাদ পেয়ে গেছেন, সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব ছেড়ে মিসর চলে গেছেন এবং তাঁর জায়গায় তাঁর ভাই আল-আদিল রণাঙ্গনে এসেছেন। সংবাদটা জেরুজালেম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বড় ক্রুশ এবং প্রধান পাদ্রীর আস্তানা আক্রায়ও পৌঁছে গেছে খবরটা। তাই তৎক্ষণাৎ তারা ত্রিপোলীতে এসে বৈঠকে বসেছেন।

দু'দিকেই বৈঠক চলছে।

'আইউবী জেরুজালেম জয় করার প্রত্যয় নিয়ে বের হয়েছিলেন'– রেমন্ড বললেন– 'আমরা একটি তীরও না ছুঁড়ে তাকে মিসর ফিরিয়ে দিয়েছি। তারই হাতে আমরা সেই মুসলিম শাসকদের বেকার করে দিয়েছি, যারা যে কোনো সময় আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারতো। এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী চাই! এখন বিজয় অর্জনে আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'সাফল্যটা অতো বিরাট নয়, যতোটা বড় করে আপনি দেখালেন'– 'খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইন বললেন– 'আমরা আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি মাত্র। আসল কাজ তো আক্রমণ। আক্রমণ করে বিজয় অর্জন করলেই তবে তাকে সাফল্য বলবো। দ্রুত বাহিনী প্রস্তুত করো। সম্মুখপানে রওনা হও এবং আইউবীকে আত্মসংবরণ করার সুযোগ দিও না।'

'আমরা যদি নিজেদেরকে খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিতে সক্ষম না হই, তাহলে পরিণতি কী হবে জানি না'– 'সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বললেন– 'আজ থেকেই নতুন ভর্তি শুরু করে দাও। আরোহী সৈনিকের সংখ্যা বেশি হওয়া চাই। সেই সুদানী যুবকদেরও ভর্তি করে নাও, সাত বছর আগে বিদ্রোহের অপরাধে পদচ্যুৎ করে শাস্তিস্বরূপ যাদের দ্বারা কৃষি জমি আবাদ করানো হয়েছিলো। এখন আর তারা ধোঁকা দেবে না। যেসব যুবক ঘোড়সওয়ারী ও তরবারী চালনা জানে, তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দাও। আমি তাড়াতাড়ি মিসর থেকে বের হতে চাই। খৃস্টানদের মাথা যদি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেই আরব জগত তাদের দখলদারিত্ব থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায় আমার অনুপস্থিতির সুযোগে এক্ষুনি তাদের হামলা করা উচিত। তারা আনাড়ি নয়। এই যে আমি মিসর ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, পরিস্থিতিটা তাদেরই সৃষ্ট। এতে তাদের উদ্দেশ্য আছে। একটি মাত্র পন্থা অবলম্বন করলে তারা আমাদের থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষা করতে পারবে– অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করে তাদেরকে আমাদের এলাকায় এসে লড়াই করতে হবে। এই যুদ্ধে আমার অনেক সৈন্যের প্রয়োজন।'

'আমি এক্ষুনি দু'শ পঞ্চাশজন নাইট (বর্মপরিহিত কমান্ডার) ময়দানে নিয়ে আসতে পারি'– ত্রিপোলীর কনফারেন্সে বিখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেনাল্ট অফ খুনিন বললেন– 'এই আক্রমণের নেতৃত্ব আমার বাহিনী দেবে। আমি তার পরিকল্পনাও প্রস্তুত করে রেখেছি। আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় চোরের মতো যুদ্ধ করবো না। আমরা ঝড় ও স্রোতের ন্যায় এগিয়ে যাবো। আমরা যখন সবাই একত্রিত হয়ে রওনা হবো, তখন আপনি বুঝতে পারবেন, মানুষ ও ঘোড়ার এই ঝড়-স্রোত আরব দুনিয়াটাকে খড়-কুটোর ন্যায় ভাসিয়ে মিসরকেও পিষে ফেলবে এবং তার গতি সুদান গিয়ে ক্ষান্ত হবে।'

খৃস্টানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসে, তাহলে আরবের মাটি আমাদের থেকে এতো রক্ত কামনা করবে, যাতে মরুভূমির বালিকণা সাঁতার কাটবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এবার আমরা মাথায় কাফন বেঁধে যাবো। আমার বন্ধুগণ! আমাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পুরোপুরি সংবরণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে।'

'আইউবীকে মিসরে আটকে রাখার জন্য আমাদেরকে অরাজক কর্মকাণ্ড তীব্রতর করতে হবে'– রেমন্ড বললেন এবং খৃস্টান ইন্টেলিজেন্স প্রধান

হারমানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'হারমান! মিসরের উপর তোমার হামলা আরো জোরদার করো। আইউবী স্থির হয়ে বসে থাকবার কথা নয়। তার বাহিনীর জীবনহানি প্রচুর হয়েছে। বিলম্ব না করে তিনি নতুন ভর্তি শুরু করে দেবেন। তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, যেনো তিনি ভর্তি না পান। যদি তাতে সফল না হও, তাহলে মিসরের বাহিনীকে ধ্বংস করতে থাকো। সেখানকার বাহিনীর উপর দৃষ্টি রাখো। ওখানে আমাদের কর্তব্যরত গোয়েন্দাদের বলো, সালাহুদ্দীন আইউবীর যে কোনো গতিবিধির সংবাদ যেনো দ্রুত আমাদের কাছে পৌঁছাতে থাকে।'

'আর হারমান!'– এক খৃস্টান কমান্ডার বললেন– 'মিসরের সংবাদ পাওয়া যাক আর না যাক এখানকার কোন সংবাদ যেনো বাইরে যেতে না পারে। আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, আইউবী যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে আমাদের জন্য আপদ হিসেবে আবির্ভূত হন, তেমনি গুপ্তচরবৃত্তির ময়দানেও তিনি আমাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। আমাদের মাঝে তার চর থাকা বিচিত্র নয়। এখানকার মুসলিম পরিবারগুলোর উপর নজর রাখতে হবে। কারো প্রতি সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হলেই তাকে বন্দি করে ফেলো। প্রয়োজনে হত্যা করে ফেলো। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করলাম।'

'আমি তো কারো অন্তরে প্রবেশ করতে পারি না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'গাদ্দার কারো গায়ে লেখা থাকে না। গাদ্দারদের মাথায় শিংও থাকে না। আমি আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীসকে অনুমতি প্রদান করছি, যাকে খৃস্টানদের চর বলে সন্দেহ হবে, তাকেই হত্যা করে ফেলো। তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে চাইলে কারাগারে ফেলে রাখো। যে সময়টায় খৃস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসছে, সেই সঙ্গিন পরিস্থিতিতে আমি কাউকে ক্ষমা করতে পারি না। আমি তদন্ত ও সুবিচারের ধরণ-পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চাই।... আর আলী বিন সুফিয়ান! আমি নিশ্চিত, তুমি অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তোমার জাল বিছিয়ে রেখেছো। খৃস্টানদের ভেতরে আরো কিছু লোক পাঠিয়ে দাও এবং সেখানকার গোয়েন্দাদের বলে দাও, কোন তথ্য-সংবাদ যেনো বেশি সময় নিজেদের কাছে না রাখে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও যেনো তীর গতিতে কায়রোতে সংবাদ পৌঁছায়। আমাকে অন্ধ করে দিও না আলী! আর সতর্ক থাকো, এখান থেকে কোনো সংবাদ যেনো বের হতে না পারে।'

'আমাদের বাহিনীর কমান্ড যদি যৌথ হয়, তাহলে আমরা আরো বেশি ভালো ও কার্যকর পন্থায় লড়াই করতে পারবো।' রেমন্ড বললেন।

'আমি ঐক্যের উপর জোর দেবো, যৌথ কমান্ডের উপর নয়'– রেনাল্ট বললেন– 'যৌথ কমান্ডের কিছু ক্ষতিকর দিকও থাকে। যুদ্ধের ময়দানে আমাদেরকে একে অপরের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং একে অন্যের পথে চলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অগ্রযাত্রার জন্য আমরা এলাকা ভাগ করে নেবো। সতর্ক থাকতে হবে, যেনো আমাদের গতিবিধি ফাঁস না হয়ে যায়।'

উভয় দিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সুলতান আইউবীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা খৃস্টানদের এবারকার প্রত্যয়। সুলতান বিক্ষত। খৃস্টানদের মদদপুষ্ট তিনটি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। প্রায় তিনটি বছর মুসলিম সৈনিকরা পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছে। সুলতান আইউবী তিন মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে এনেছেন এবং তারা সুলতানের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সুলতানের মতে এই জয় উম্মাহ'র নিকৃষ্টতম বিজয়। কারণ, খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। এই ভ্রাতৃঘাতি গৃহযুদ্ধে আল্লাহর হাজার হাজার সেই সৈনিকরা মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করেছে, যাদের খৃস্টানদের হাত থেকে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করার কথা ছিলো।'

ইত্যবসরে খৃস্টানরা তাদের সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করে নিয়েছে। বাহিনীকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগও দিয়েছে। তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি এখন সম্পন্ন। তাদের দাবি ভিত্তিহীন ছিলো না যে, তারা ঝড়ের গতিতে আসবে এবং আরব বিশ্বকে খড়ের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বিপরীত দিকে সুলতান আইউবীর বাহিনীর অভিজ্ঞ অনেক সৈনিক ও কমান্ডার শাহাদাতবরণ করেছে, যার ফলে সুলতান এখন নতুন ভর্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। অনভিজ্ঞ নতুন সৈনিকদের দ্বারা যুদ্ধ করানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তবু সুলতান আইউবীর এছাড়া উপায় নেই। এ মুহূর্তে মিসরেও অনেক সৈন্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, সুদানের দিক থেকেও আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। সর্বোপরি দেশজুড়ে নাশকতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সমস্যা তো আছেই।

খৃস্টানরা ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাঁর নিজস্ব রণকৌশল থেকে সরে আসতে চাচ্ছেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি 'গেরিলা হামলা চালাও আর পালিয়ে যাও' এই রীতি অনুযায়ীই লড়াই করবেন। খৃস্টানদের বর্তমানকার পরিকল্পনায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেনো সুলতান আইউবীর কমান্ডো অপারেশন সফল হতে না পারে। তারা আইউবীর বাহিনীকে বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে এসে সামনাসামনি লড়াবার কৌশল ভাবছে। উভয়পক্ষের জোর প্রচেষ্টা, আপন আপন যুদ্ধ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও গতিবিধি যেনো গোপন থাকে এবং প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য বের করে আনা যায়। এ লক্ষ্যে উভয়পক্ষের মধ্যেই প্রতিপক্ষের গুপ্তচর ঢুকে রয়েছে।

খৃস্টান কমান্ডার প্রমুখ মোটের উপর জানে, তাদের মধ্যে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা আছে। কিন্তু ত্রিপোলীর সম্রাট রেমন্ড ও অপরাপর খৃস্টান সম্রাটদের জানা নেই, খোদ তাদের এই কনফারেন্সে দু'জন মুসলমান গোয়েন্দা উপস্থিত রয়েছে। একজন রাশেদ চেঙ্গিস। অপরজন ভিক্টর। রাশেদ চেঙ্গিস তুর্কি মুসলমান। ভিক্টর ফরাসী। এরা খৃস্টানদের উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারি। খৃস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের সভা-নিমন্ত্রণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মদ-খাবার ইত্যাদি পরিবেশনের দেখা-শোনা এদের দায়িত্ব। রাশেদ চেঙ্গিস ছদ্মনাম। ঠিক খৃস্টানদের নামের ন্যায়। তুর্কি হওয়ার কারণে গায়ের রংটা ইউরোপিয়ানদের মতো। তাছাড়া অত্যন্ত চালাক ও বাকপটু। ভিক্টরের ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই, সে খৃস্টান। ফ্রান্সের বাসিন্দা। কিন্তু ছদ্মনামটা রেখেছে গ্রীক খৃস্টানদের।

খৃস্টানদের এই কনফারেন্সেও তারা দু'জন তাদের বিশেষ পোশাকে উপস্থিত আছে। কারণ, খৃস্টানরা মদ ছাড়া কোনো কাজই করতে পারে না। এরা মদ পরিবেশন করছে আর সতর্কতার সাথে মনোযোগ সহকারে তাদের কথোপকথন শুনছে। অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা, যা কিনা এই মুহূর্তে কায়রো পৌঁছে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি। খৃস্টানদের পূর্ণ পরিকল্পনা জ্ঞাত হয়ে যে কোনো মূল্যে সেসব তথ্য কায়রো পৌঁছাতে হবে। এই দুই গোয়েন্দার উপর আলী বিন সুফিয়ানের পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

মিসরে সেনাভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দু'তিনটি

ইউনিট গঠনও হয়ে গেছে। সামরিক কুচকাওয়াজ ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। দ্রুতগামী দূত মারফত মসজিদের ইমামদের নিকট সুলতান আইউবীর বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনারা জনগণকে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন, তাদেরকে বলুন, কাফেররা পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইসলামী দুনিয়ায় উপর আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হয়ে গেছে। ইমামদের বলা হলো, আপনারা যুবকদেরকে মিসরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

ইসলাম ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবা-তরুণরা ভর্তি হতে শুরু করেছে। তাদের সম্মুখে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিষ্কার। কিন্তু বহু যুবক ভর্তি হয়েছে গনীমতের লোভে। এরা পল্লী অঞ্চলের মানুষ। তাদের কানে ইমামদের আওয়াজ পৌঁছেনি। তারা সাক্ষাৎ পেয়েছে সেনা অফিসারদের, যারা এই লোকগুলোকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করেছে, আসো, যুদ্ধ করে। আমরা খৃস্টানদের এমন সব এলাকা জয় করবো, যেখানে বিপুল সম্পদ আছে। তোমাদেরকে সেই সম্পদের ভাগ দেয়া হবে। ফলে তারা জিহাদী জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে হাসিমুখে গনীমতের লোভে ভর্তি হয়েছে। এই অনভিজ্ঞ ও আনাড়ী অফিসারগণ সুলতান আইউবীর আকাঙ্খার বিপরীত বিপুলসংখ্যক যুবককে ভর্তি করে নেয়। যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে এই সৈনিকরা সুলতান আইউবীর জন্য বিরাট এক সমস্যারূপে আবির্ভূত হয়।

ওদিকে ত্রিপোলীর সামান্য দূরে খৃস্টান বাহিনী সমবেত হতে শুরু করেছে। ফিলিস্তীনের অধিকৃত শহরগুলোতে দূত প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমরা বাহিনী প্রস্তুত করো। ত্রিপোলীতে খৃস্টান সম্রাট রেনাল্ট সবচে' বেশি তৎপর। তার সেনাসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, যাদের মধ্যে দুইশত পঞ্চাশজন নাইট রয়েছে। নাইট একটি সম্মানসূচক পদবী। অস্বাভাবিক বিচক্ষণ, সাহসী ও অত্যধিক যোগ্য সামরিক অফিসারদের এই পদবী প্রদান করা হয়। তাদেরকে বিশেষ ধরনের বর্ম দেয়া হয় এবং এরা বিশেষ বিশেষ ইউনিটের কমান্ডার হয়ে থাকেন। প্রতিশোধের আগুন রেনাল্টকে অস্থির করে রেখেছে। প্রিয় পাঠক! আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১১৭৪ সালের শুরুর দিকে খৃস্টানরা সমুদ্রের দিক থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু সুলতান আইউবী গুপ্তচর মারফত যথাসময়ে সেই

আক্রমণ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি খৃস্টান হামলাকারীদের স্বাগত জানানোর জন্য এমন বন্দোবস্ত করেছিলেন যে, খৃস্টানদের নৌ-বহর সমুদ্রেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

সেই অভিযানে একটি আক্রমণ হওয়ার কথা ছিলো স্থল পথে, যার নেতৃত্ব ছিলো রেনাল্টের হাতে। কিন্তু যেহেতু মুসলমান গোয়েন্দারা খৃস্টানদের পূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলো, তাই নুরুদ্দীন জঙ্গী স্থলপথে ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। পেছন এবং উভয় পার্শ্ব থেকেও আক্রমণের ব্যবস্থা করে রাখেন। রেনাল্ট সেই ফাঁদে এসে পা দেন। বাঁচার জন্য তিনি অনেক হাত-পা ছোঁড়েন। কিন্তু এক রাতে জঙ্গীর কমান্ডো সেনারা রেনাল্টের হেডকোয়ার্টারের উপর হামলা চালায় এবং রেনাল্টকে ধরে ফেলে। খৃস্টানদের আক্রমণ অভিযান শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং তাদের শোচনীয় পরাজয়ও ঘটে। তাদের জীবন ও সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধিত হওয়া ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বড় একটি ক্ষতি এই হয় যে, রেনাল্টের ন্যায় একজন যুদ্ধবাজ সম্রাট বন্দি হন।

রেনাল্ট নুরদ্দীন জঙ্গীর অতিশয় মূল্যবান একজন বন্দি ছিলেন। তার মুক্তির বিনিময়ে তিনি খৃস্টানদের থেকে বড় শর্ত আদায়ের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু আয়ু তাঁকে সময় দেয়নি। দু'মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পদস্থ কর্মকর্তা ও সালারগণ তারই এগারো বছর বয়সী পুত্র আল-মালিকুস সালিহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তারা আল-মালিকুস সালিহকে পুতুলের ন্যায় ব্যবহার করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেয় এবং তাঁকে পরাজিত করার লক্ষ্যে খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এই বন্ধুত্বের প্রথম বিনিময় তারা এই প্রদান করে যে, রেনাল্টের ন্যায় মূল্যবান কয়েদিকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দেয়। সেই থেকে ওস্তাদ নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সুলতান আইউবীর যুদ্ধ-সংঘাত শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য আমীরগণও খেলাফত থেকে আলাদা হয়ে যান এবং তারা প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে নেন। তাদের এই আত্মঘাতি অবস্থানের ফলে অন্য সব ক্ষতির পাশাপাশি বড় একটি ক্ষতি এই হয়েছিলো যে, রেনাল্ট একটি সামরিক শক্তির রূপ ধারণ করে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধেই নয়– এখন ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছেন।

আল-মালিকুস সালিহ রেনাল্টের সঙ্গে আরো যে বন্দিদের মুক্তি দিয়েছিলেন, তারাও ইসলামের জন্য বিরাট সমস্যারূপে আবির্ভূত হয়েছে। রেনাল্ট তার পরাজয় এবং অপমানের প্রতিশোধ নিতেও বদ্ধপরিকর। খৃস্টানদের কনফারেন্সে তিনি সকল খৃস্টান বাহিনী যৌথ কমান্ডের অধীনে কাজ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তার বড় কারণ, তিনি স্বাধীন থেকে নিজের প্রত্যয়-পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন। খৃস্টানদের একটি দুর্বলতা ছিলো, তারা ঐক্যবদ্ধ হতো না- যার যার অবস্থানে থেকে একে অপরকে সহযোগিতা দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইতো। তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের আকাঙ্খা ছিলো, একাকি যুদ্ধ করে নিজেই বিজিত এলাকার রাজা হবো। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, খৃস্টানদের এই দুর্বলতা আরব বিশ্বে তাদের অনেক ক্ষতি করেছে। এতো অধিক ও বিশাল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবীর সারিতে যদি গাদ্দার না থাকতো, খৃস্টানদেরকে আরব দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করে ইউরোপের জন্যও তিনি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতেন।

'আপনারা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে চান, তাহলে আমাদের প্রত্যেকে আপন আপন বাহিনীকে যৌথ কমান্ডের অধীনে ছেড়ে দিতে হবে'- রেমন্ড বললেন- 'অন্যথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আমরা ব্যর্থও হয়ে যেতে পারি। প্রধান সেনাপতি কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবে জোট।'

'আমি আপনার সঙ্গে দ্বি-মত করবো না'- রেনাল্ট বললেন- 'তবে আমি সেই কমান্ডের অধীনে থেকে যুদ্ধ করবো না। আমাকে আমার বিগত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তার জন্য আমার স্বাধীনতা প্রয়োজন। নুরুদ্দীন জঙ্গী মরে গেছে। জঙ্গী আমাকে বন্দি করে যেভাবে দামেশ্‌ক নিয়েছিলো, ঠিক তেমনি আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বন্দি করে আপনাদের সম্মুখে এনে হাজির করবো। অন্যথায় ইতিহাস আজীবন আমাকে অভিশম্পাত করতে থাকবে। আমি আপনাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে চাই, নুরুদ্দীন জঙ্গী যখন আমার উপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে আমার সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলো এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলো, তখন আপনাদের কে তার উপর জবাবী হামলা করেছিলেন? কে আমার জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন? কেউ নন। এখন আপনারা আমার পায়ে শিকল পরাবেন না।

আমি এই দিনটির জন্যই বাহিনী প্রস্তুত করেছি। আমার প্রতিশোধের দিন এসে গেছে। আমার ফৌজ আপনাদের কারো ফৌজের পথে প্রতিবন্ধক হবে না। যাকেই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে, সব রকম ঝুঁকি বরণ করে নিয়ে আমি তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু আপনাদের সকলের কাছে আমার নিবেদন, আমাকে শিকলবন্দি করবেন না।'

'আজ এ পর্যন্তই'– বল্ডউইন বললেন– 'আমাদের আজকের এই কনফারেন্স প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো। আপাতত সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের গোপন তৎপরতা গৃহযুদ্ধের আদলে মুলমানদের কোমর ভেঙে দিয়েছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবী এদিকে আসার পরিবর্তে মিসর চলে গেছেন। তাই অতিশীঘ্র আমাদেরকে জোরদার আক্রমণ চালাতে হবে। আজকের এই সভায় আমরা আক্রমণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এখন দু'-চারদিন আমরা আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা-ভাবনা করবো। যারা এ বৈঠকে অনুপস্থিত আছেন, তাদেরকেও তলব করবো। তারপর একদিন বসে আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নেবো। আমাদের বাহিনীগুলো প্রস্তুত আছে। এই ফাঁকে হারমানকে গোয়েন্দা তৎপরতা আরো জোরদার করতে হবে। আইউবীর গুপ্তচরদের পাতাল থেকে হলেও বের করে এনে আটক করতে হবে। এখানকার প্রত্যেক মুসলমানের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। প্রতিটি মুসলিম পরিবার ও ব্যক্তির প্রতি মুহূর্তের গতিবিধির উপর চোখ রাখতে হবে। হারমান! আপনাকে বিশেষভাবে আরো একটি কাজ করতে হবে। পুরুষ হোক কিংবা নারী, এখান থেকে যে-ই বের হবে নিশ্চিত হতে হবে সে শত্রুর চর কিনা।

'তা-ই হবে'– হারমান বললেন– 'আমাকে না জানিয়ে এখান থেকে পক্ষিটিও বের হতে পারবে না।'

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টর। খৃস্টানদের দুই বিশ্বস্ত পরিচারক। নিয়োগ দেয়া হয়েছে গভীর যাচাই-বাছাইয়ের পর। তারপরও এরা সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। অতিশয় বিচক্ষণ গোয়েন্দা। হারমানের ন্যায় বিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রধানকে পরাজিত করে ঢুকে গেছে খৃস্টানদের একেবারে ভিআইপি কক্ষে। খৃস্টানদের এই কনফারেন্সের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগা-গোড়া সব আলোচনা– সকল সিদ্ধান্ত তাদের জানা। মধ্যরাতের পর সভা মুলতবি হয়ে গেলে তারা নিজ কক্ষে চলে যায়।

'ডিউটি থেকে অনুপস্থিত থাকা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়'– ভিক্টর বললো– 'এসব তথ্য অন্য কারো মাধ্যমে কায়রো পৌঁছাতে হবে। এমন লোক কে আছে?'

'ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক'– রাশেদ চেঙ্গিস বললো– 'তিনি-ই ভালো জানবেন, কাকে পাঠানো যায়। দ্রুতগতিতে কায়রো পৌঁছার জন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন হবে। তবে তাদের পূর্ণ পরিকল্পনা জানার পরই কায়রোকে সংবাদ দেয়া উচিত। অসম্পূর্ণ সংবাদ জেনে সুলতান ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন।'

'ইমাম সাহেবকে এতোটুকু সংবাদ তো জানানো প্রয়োজন যে, খৃস্টানরা অনেক বড় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে'– ভিক্টর বললো– 'যাতে তথ্য পেয়ে সুলতান অন্তত তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করতে পারেন এবং অতি দ্রুত ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ করে নিতে সচেষ্ট হন।' আর শোন, তারা যখন আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করছিলো, তখন আমি তোমার দিক তাকিয়েছিলাম। তুমি রেমন্ডের সামনে মদের পেয়ালা রাখতে রাখতে থেমে গিয়েছিলে। তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিলো, তুমি মনোযোগ সহকারে আলোচনা শুনছো। আমি তোমার চোহারা দেখেছিলাম। তাতে আমি লক্ষ্য করার মতো ঔজ্জ্বল্য দেখেছি। আমি জানি, এতোটা মূলবান তথ্য প্রাপ্তিতে উত্তেজনা ও আনন্দের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ভুলে গেলে চলবে না, এ জাতীয় সভা-সমাবেশে হারমানও উপস্থিত থাকেন। হারমান আমাদের আলী বিন সুফিয়ানের সমপর্যায়ের গোয়েন্দা। আমি তোমার প্রতি তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ হারমানের প্রতিও তাকিয়েছিলাম। আমার মনে হলো, তিনি তোমাকে লক্ষ্য করছেন। সাবধান থেকো ভাই! জানো তো আমরা দুশমনের পেটের মধ্যে বসবাস করি।'

'হারমানের কাছে আমরা অপরিচিত নই'– রাশেদ চেঙ্গিস বললো– 'আমাদের ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'ভয় নয়– সতর্ক থাকা প্রয়োজন'– ভিক্টর বললো– 'হারমান কী কী নির্দেশনা পেয়েছেন, শুনেছো নিশ্চয়। এখন তিনি যে কাউকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। আচ্ছা, তুমি একটা কাজ করো– মসজিদে চলে যাও। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খৃস্টানরা আজ কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ইমামকে জানাও। কেউ কায়রো যাওয়ার থাকলে সংবাদটা আলী বিন সুফিয়ানকে জানাতে বলো। আর ওদিক থেকে কেউ আসলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যায় না যেনো।'

নগরীর এক মসজিদের ইমাম সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। মসজিদটি গুপ্তচরবৃত্তির গোপন ঠিকানা। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা মসজিদে গিয়ে ইমামকে সংবাদ পৌঁছায় এবং তাঁর থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে। ভিক্টর কখনো মসজিদে যায়নি। লোকটা নামায পড়ার নিয়ম-কানুন ও মসজিদের আদব-কায়দা কিছুই জানে না। তাই তার ভয়, মসজিদে গেলে খৃস্টানদের কোন মুসলমান গুপ্তচর তাকে ধরিয়ে দিতে পারে। আশঙ্কাটা অমূলক নয়। খৃস্টানদের গুপ্তচরদের মধ্যে এমন অনেক মুসলমান ছিলো, যারা মুসল্লি বেশে মসজিদে যাওয়া-আসা করতো এবং মুসলমানদের কথা-বার্তা শুনে তথ্য সংগ্রহ করতো। এভাবে তারা বহু মুসলমানকে খৃস্টানদের হাতে গ্রেফতারও করিয়েছে। রাশেদ চেঙ্গিস যেহেতু নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে রেখেছিলো, তাই দিনের বেলা সে মসজিদে যেতো না। খৃস্টান কমান্ডার প্রমুখ রাতের আসর ও ভোজ-ভাজির অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেয়ার পর প্রয়োজন হলে মধ্য রাতের পর মসজিদ সংলগ্ন ইমামের বাসায় যেতো।

রাশেদ চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করে। জুব্বা ও পাগড়ি পরিধান করে। মুখে কৃত্রিম দাড়ি স্থাপন করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ সময়ে খৃস্টানদের এই কেন্দ্রে রাতেও জাঁকজমক অব্যাহত থাকে। রেমন্ডের বাহিনী তো আছেই, রেনাল্টও তার অনেক অফিসারসহ এখন এখানে অবস্থান করছেন। আছে তার কয়েকটি সেনা ইউনিটও। এই সেনা অফিসার এবং অন্যান্য খৃস্টান কমান্ডাররা আমোদ-বিনোদনের মধ্যদিয়ে রাত অতিবাহিত করছে। পেশাদার মেয়েদের নাচ-গান ও প্রমোদ চলছে। সারারাত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রী-গণিকারাও সঙ্গে থাকছে। কে কার স্ত্রী, বাছ-বিচার থাকছে না। চলছে নারী বেঁচা-কেনাও।

কক্ষ থেকে বের হয়ে রাশেদ চেঙ্গিসের লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হয়। কক্ষে কক্ষে ও তাঁবুতে তাঁবুতে তো বেহায়াপনা চলছেই, বাইরেও কোথাও কোথাও একই আচরণ চোখে পড়ে। তাদের এড়িয়ে ভিন্ন পথ ধরতে হলো রাশেদ চেঙ্গিসকে। অবশেষে সে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাটা নিরাপদে অতিক্রম করে ফেলে এবং নগরীর গলিপথে ঢুকে পড়ে। তারপর মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

রাশেদ চেঙ্গিস এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে যখন মসজিদে প্রবেশ করতে শুরু করে, তখন সে অনুভব করে, কে যেনো গলির মধ্যে পা টিপে টিপে

হেঁটে এসে একদিকে মোড় নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে! রাশেদ চেঙ্গিস হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। কিন্তু পরক্ষণে কুকুর-বিড়াল বা অন্য কোন প্রাণী হতে পারে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। সে মসজিদের বারান্দায় ঢুকে পড়ে এবং ইমামের কক্ষের দরজায় বিশেষ পদ্ধতিতে করাঘাত করে। দরজা খুলে যায়। রাশেদ চেঙ্গিস ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ইমামকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে।

'খৃস্টানদের বেশির ভাগ সৈন্য এখানে সমবেত হবে'– চেঙ্গিস বললো– 'এরা হবে রেনাল্টের ফৌজ। এখানকার বাহিনী তো পূর্ব থেকেই এখানে উপস্থিত আছে। এই বাহিনীর অভিযান এবং প্রত্যয়ের সংবাদ তো কায়রো পেয়েই যাবে। আমরা চেষ্টা করলে যাত্রার আগেই বাহিনীর কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারি এবং তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারি।'

'অর্থাৎ– তুমি বলতে চাচ্ছো, আমাদের কমান্ডো বাহিনীকে বলবো, তারা যেনো খৃস্টান বাহিনীর রসদে আগুন ধরিয়ে নষ্ট করে দেয়'– ইমাম বললেন– 'এ কাজটা আমি করাতে পারি। কিন্তু করাবো না। তুমি নিশ্চয় এমন বহু ঘটনা শুনেছো, যে অধিকৃত অঞ্চলে আমাদের কমান্ডো সেনারা খৃস্টানদের ক্ষতিসাধন করেছে, সেখানকার মুসলমান বাসিন্দাদের জীবন জাহান্নামের চেয়েও কঠিনতর করে তোলা হয়েছে। ঘরে ঘরে তল্লাশী হয়েছে। আমাদের সম্ভ্রান্ত মা-বোনদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে। যুবতী মেয়েদেরকে খৃস্টানরা তুলে নিয়ে গেছে। সর্বোপরি বন্দিত্ব ও হত্যা-নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। আমি দূত মারফত সুলতান আইউবীকে সমস্যাটা অবহিত করেছি। সুলতান সম্পূর্ণ আমার আশানুরূপ উত্তর প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এখন থেকে মুসলিম অধিবাসীদের মর্যাদা, জীবন ও সম্পদের খাতিরে কোন শহরে গোপন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা বন্ধ থাকবে। দুশমনের রসদ বাহিনীর সঙ্গে আসতে দাও, আমার গেরিলা সৈনিকরা সেগুলো রণাঙ্গনে যেতে দেবে না।'

'পূর্ণাঙ্গ সংবাদ আমি আপনাকে দু'-চারদিনের মধ্যেই জানাতে পারবো'– চেঙ্গিস বললো– 'আপনি এখন আরো সতর্ক হয়ে যান। এখানকার গুপ্তচররা অস্বাভাবিক রকম তৎপর হয়ে ওঠেছে। এখন থেকে তারা এখানকার পশু-পাখিগুলোকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।'

একজনকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চেঙ্গিস মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। এখন আর তার মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই, যাতে কেউ

সন্দেহ না করে। গলির দিকে মোড় নেয়ামাত্র আবারো যেনো কারো পায়ের শব্দ কানে এলো। চেঙ্গিস মোড় ঘুরিয়ে তাকায়। গলিটা অন্ধকার। কিছুই দেখতে ফেলো না। চেঙ্গিস সামনের দিকে হাঁটা দেয়। গন্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে কৃত্রিম দাড়ি খুলে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ফেলে। পোশাকে তাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। এমন পোশাক খৃস্টানরাও পরে থাকে।

এখন ভিক্টর ও চেঙ্গিসের প্রচেষ্টা, কীভাবে খৃস্টানদের আক্রমণ পরিকল্পনার বিস্তারিত জানা যায়। খৃস্টান বাহিনী কোথায় কোথায় আক্রমণ করবে এবং তাদের রওনা হওয়ার প্রোগ্রাম কী ইত্যাদি। অধিক থেকে অধিকতর সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর জন্য আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। দূতদের দৌড়ঝাপ চলছে। এখানকার জন্য রেমন্ড হলেন মেজবান। এটি তার রাজধানী। এক রাতে তিনি সকল খৃস্টান সম্রাট, উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণ করেন। মেহমানগণ ভোজ সভায় উপস্থিত। ভিক্টর ও চেঙ্গিস মহাব্যস্ত– নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ নেই। যেহেতু মেহমানদের মধ্যে সম্রাটগণও আছেন, তাই তাদের মদ ইত্যাদি পরিবেশনের জন্য ভিক্টর-চেঙ্গিসকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। তবে তাদের জানা আছে, এই সতর্ক প্রস্তুত ততোক্ষণ পর্যন্ত থাকতে হবে, যতোক্ষণ মেহমানদের চেতনা ঠিক থাকে। পরে যখন মদ মাতাল হয়ে তারা অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন চাকর-নকরদের ব্যস্ততা কমে যায়।

আজকের আসরে যতোজন পুরুষ, ততোজন নারী। রূপসী যুবতীরা আছে। আছে এমন নারীও, যারা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেলেও তরুণী সেজে ধোঁকা দিচ্ছে। ভিক্টর ও চেঙ্গিস খাবার-মদ ইত্যাদি পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত চাকরদের কাজ তদারকি করছে এবং ছুটোছুটি করছে। এক ইউরোপীয় তরুণী চেঙ্গিসের নিকট দু'-তিনবার মদ চায়। প্রতিবারই চেঙ্গিস কোনো চাকর বা চাকরানিকে ডেকে বলে দেয়, একে মদ দাও। সে সময়ে মেহমানগণ রেমন্ডের মহলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিলো। মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী। চেঙ্গিসকে বারবার চাকরদের ডেকে মদ দিতে বলছে দেখে সে মুচকি হেসে বললো– 'আমি তোমার হাতে পান করতে চাচ্ছি আর তুমি কিনা চাকরদের নির্দেশ দিয়ে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছো।'

'আজ্ঞে, আমিই এনে দিচ্ছি।'– চেঙ্গিস ভৃত্যসুলভ ভঙ্গিতে বললো।

'এখানে নয়'– মেয়েটি বললো– 'আমি বাইরে বাগানে যাচ্ছি। ওখানে নিয়ে আসো।'

মেয়েটি মহল থেকে বের হয়ে বাগানে এক স্থানে গিয়ে বসে। এটি মহলের বাগিচা। রাশেদ চেঙ্গিস আকর্ষণীয় একটি সোরাহীতে করে মদ নিয়ে সেখানে চলে যায়। ওখানেও মেহমানগণ ছড়িয়ে রয়েছে। সকলেই যৌন উন্মাদ। প্রত্যেকের হাতে মদের পেয়ালা আর সঙ্গে একজন করে নারী। এই মেয়েটি একা। এমন রূপসী এক যুবতী একা কেনো ভেবে চেঙ্গিস বিস্মিত হয়। মেহমানদের তো এর দেহের চার পাশে মাছির ন্যায় ভন ভন করার কথা ছিলো। এখানে চলে তো এ সবই। যা হোক, চেঙ্গিস মেয়েটির পেয়ালায় মদ ঢালতে শুরু করে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়? চেঙ্গিস ইউরোপের একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে বললো, কৈশোর থেকেই আমি সম্রাট রেমন্ডের রাজ কর্মচারি।

'তুমি কি কিছু সময় আমার কাছে থাকতে পারো?'– তরুণী জিজ্ঞেস করলো এবং পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো– 'নাও, আমার পেয়ালা তুমি পান করো। আমি পরে পান করবো।' মেয়েটির কণ্ঠে অনুনয় ও তৃষ্ণার সুর।

'দেখুন, আমি একজন ভৃত্য'– চেঙ্গিস বললো– 'আপনি রাজকন্যা। এ মুহূর্তে ডিউটি ছাড়া আমি অন্য কাজে সময় দিতে পারি না। এখনো আমি ডিউটিতে আছি।'

'এ মুহূর্তে আমাকে তোমার চাকরানি মনে করো'– মেয়েটি রাশেদ চেঙ্গিসের হাত ধরে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললো– 'তুমি রাজপুত্র। মানুষের মনই বলে দেয় কে কী।'

'আপনি একা কেনো?' চেঙ্গিস জিজ্ঞাসা করে।

'কারণ, আমার মন সায় দেয় না, যার প্রতি আমার ঘৃণা, তার সঙ্গে হাসবো, খেলা করবো'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমার যাকে ভালো লাগে, সে এখন আমার সঙ্গে। এখন আমি নিঃসঙ্গ নই, একা নই। কিন্তু তুমি আমার হাত থেকে পেয়ালাটা নাওনি!'

'কেউ দেখে ফেললে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।' চেঙ্গিস বললো।

'তুমি যদি আমার পেয়ালা থেকে এক ঢোকও পান না করো, তাহলে আমিই তোমাকে শূলিতে দাঁড় করাবো'– মেয়েটি বললো। মেয়েটির মুখে মুচকি হাসি। এবার আরো একটু এগিয়ে রাশেদ চেঙ্গিসের একেবারে কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো– 'পাগল! দেখো, তোমাকে আমার এতোই ভালো লাগে যে, একান্ত বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে ডেকে এনেছি। আমাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করো না।'

'আমি মদপান করবো না।' চেঙ্গিস বললো।

'তা না করো'– মেয়েটি বললো– 'কিন্তু আমি যখন এবং যেখানে ডাকি, তোমাকে যেতে হবে।'

রাশেদ চেঙ্গিস বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মানুষ। উচ্চস্তরের একটি রূপসী মেয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব-ভালোবাসার আকাঙ্খা প্রকাশ করছে বলে সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি। তার এ-ও মনে হয়, মেয়েটি হয়তো কোনো বৃদ্ধ সেনাপতির স্ত্রী কিংবা এমন এক পুরুষের বউ, যে এই মুহূর্তে অন্য কারো স্ত্রীকে নিয়ে আমোদে মেতে আছে। একটা কারণ তো স্পষ্ট যে, রাশেদ চেঙ্গিস সুদর্শন যুবক, যার দেহে আকর্ষণ আছে। কোন নারীর তাকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা এটাই প্রথম নয়। খৃস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্ত অফিসারদের ভোজসভায় মদ পরিবেশেনকারী মেয়েরা অতিশয় রূপসী এবং চিত্তহারীই হয়ে থাকে। তাদের দু'জন ইতিমধ্যে রাশেদ চেঙ্গিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করে ফেলেছে। কিন্তু চেঙ্গিস তাদের পাত্তা দেয়নি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তার দাবি ছিলো, নিজের চারিত্রিক পবিত্রতাকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

প্রশিক্ষণের সময় আলী বিন সুফিয়ান তাকে ধারণা প্রদাণ করেছেন, মস্তিষ্ক যদি বিলাসিতার প্রতি ঝুকে পড়ে, তাহলে মন থেকে কর্তব্যবোধ হারিয়ে যেতে শুরু করে। তাকে বুঝানো হয়েছে, নারী এমন এক বিষের ন্যায়, যে মানুষের ঈমান খেয়ে ফেলে। রেমন্ড আর ত্রিপোলীর মহলে তার অবস্থান ছিলো, সে যখন ইচ্ছা যে কোনো চাকর-চাররানিকে চাকুরিচ্যুৎ করতে পারতো। তাছাড়া তার ব্যক্তি চরিত্র ছিলো যাদুর ন্যায় ক্রিয়াশীল। তার এ-ও জানা ছিলো, খৃস্টানদের কোনো চরিত্র নেই। তাদের নারীরা নির্লজ্জতা ও অসচ্চরিত্রকে গৌরব মনে করে থাকে। এসব কারণে চেঙ্গিস-এর নিকট এই মেয়েটি এবং তার খোলামেলা প্রেমনিবেদন বিস্ময়কর বিষয় ছিলো না।

রাশেদ চেঙ্গিস যেহেতু একজন যোগ্য গুপ্তচর, তাই সে ততক্ষণাৎ ভাবে, নিজের গোয়েন্দা পরিচয় গোপন রেখেই মেয়েটাকে চরবৃত্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই যে মেয়েটি বললো, আমি তোমাকে যখন এবং যেখানে আসতে বলি, আসতে হবে– তার এই বক্তব্যে কোন নির্দেশ বা হুমকি নেই। আছে বন্ধুসুলভ সরলতা। তার বাচনভঙ্গির ক্রিয়াও চেঙ্গিসের অজানা নয়। মেয়েটির মুচকি হাসির জবাবে রাশেদ চেঙ্গিসও মুখ টিপে

একটা হাসি উপহার দিয়েছিলো। এই হাসির মাধ্যমে শিকারীকে নিজের পাতা জালে আটকানোর প্রচেষ্টা ছিলো।

'এবার যেতে পারি কি?'– রাশেদ চেঙ্গিস বললো– 'আমার ডিউটি এখনো শেষ হয়নি। আপনি মেহমানদের মাঝে চলে যান।' পরক্ষণে চেঙ্গিস খানিকটা ঝাঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'আপিন কার স্ত্রী?'

'স্ত্রী নই–গণিকা'– মেয়েটি বললো এবং একজন উচ্চপদস্থ কমান্ডারের নাম উল্লেখ করে বললো– 'অভাগার কাছে ঢের সম্পদ আছে। এখানে এসে আরেকজন পেয়ে গেছে। এখন আর আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে মুক্তও করে দেয় না। আমি নিজের পছন্দের বাইরে কিছু করতে পারি না। লোকটাকে আমার একটুও ভালো লাগে না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ এমন একটা বিষয় যে, যার নিজস্ব পছন্দ থাকে, তার যাকে ভালো লেগে যায়, সে রাজা না গোলাম, সেই বিবেচনা করে না। প্রেম প্রেমই। প্রেমের কাছে রাজাও যা, গোলামও তা। তোমার পদমর্যাদায় আমার কোনো কাজ নেই। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। অন্যথায় আমার প্রতি অবিচার হবে। তুমিই প্রথম মানুষ, আমার হৃদয় যাকে পছন্দ করেছে। আমি দৈহিক পরিতৃপ্তির পিয়াসী নই। আমার আত্মা পিপাসু। তোমার চোখের তারাই পারবে আমার আত্মার পিপাসা নিবারণ করতে। এখন যাও। কাল রাত আমিই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

রাশেদ চেঙ্গিস যে সময়ে মেয়েটির সঙ্গে বাগিচায় অবস্থান করছিলো, সে সময়ে তার সঙ্গী ভিক্টর মেহমানদের মাঝে ঘোরাফেরা করছিলো। এই ফাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে ফেলেছে সে। খৃস্টানরা অগ্রযাত্রা কোন্‌দিকে করবে, আক্রমণ কোথায় করবে ইত্যাদি সকল তথ্য জেনে ফেলেছে ভিক্টর। কিন্তু বিষয়গুলো এখনো প্রস্তাব ও পরামর্শের পর্যায়েই রয়েছে। রাশেদ চেঙ্গিসও মেহমানদের মাঝে ফিরে গেছে এবং রেনাল্টের আশপাশে ঘুরতে শুরু করেছে। রেনাল্ট সঙ্গীদের সামনে তার সেই প্রত্যয়ের কথাই পুর্নব্যক্ত করছে, যা তিনি কনফান্সে ব্যক্ত করেছিলেন। তার হাতে এতো প্রবল সামরিক শক্তি রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করেই তিনি এতো বড় দাবি করছেন।

রাত কেটে গেছে। পরদিন চেঙ্গিসের নিকট তার দলের এক গোয়েন্দা এসে পৌঁছে। চেঙ্গিস তাকে মধ্য রাতের পর ইমামের কাছে যেতে বলে।

দিন কেটে রাত এলো। চেঙ্গিস ও ভিক্টর রেমন্ডের ভোজসভায় ডিউটিতে চলে যায়। যখন অবসর হয়, তখন গভীর রাত। চেঙ্গিস ভিক্টরকে এখনো বলেনি, একটি মেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছে। ডিউটি থেকে অবসর হয়ে সে ভিক্টরকে বললো, আমি পোশাক পরিবর্তন করে ইমামের কাছে যাচ্ছি। ভিক্টর ইমামকে অবহিত করার জন্য তাকে বেশ কিছু তথ্য প্রদান করে।

চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করে এবং মুখে কৃত্রিম দাড়ি স্থাপন করে মুখমন্ডলটা ঢেকে কক্ষ থেকে বের হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। ভবনটির খানিক দূরে সবুজ ভূমি, যাতে বিপুল গাছ-গাছালির সমারোহ। আশপাশে কোনো বসতি নেই। এই প্রাকৃতিক বাগিচাটির মধ্য দিয়েই চেঙ্গিসকে যেতে হচ্ছে।

চেঙ্গিস সবে বাগানে ঢুকেছে। অমনি একটি বৃক্ষের আড়াল থেকে এক ছায়ামূর্তি আত্মপ্রকাশ করে তার দিকে এগুতে শুরু করে। চেঙ্গিস ঝটপট মুখমন্ডল থেকে কৃত্রিম দাড়িগুলো খুলে চোগার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে। তার ধারণা, এখানে এখানকারই তার পরিচিত কোনো চাকর ছাড়া অন্য কেউ আসতে পারে না। সে হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে পায়চারি করতে শুরু করে।

ছায়াটা ডান দিক থেকে আসছিলো। নিকটে এসেই বলে ওঠলো– 'বলেছিলাম না, আমিই তোমাকে খুঁজে নেবো।' চেঙ্গিস একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পায়। গত রাতের সেই মেয়েটি।

'এতো মেহমান, এতো কাজ– আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে'– চেঙ্গিস বললো– 'হাওয়া খাওয়ার জন্য এদিকে চলে আসলাম'।

'আমি তোমার কক্ষের দিকে আসছিলাম'– মেয়েটি বললো– 'তোমাকে এদিকে আসতে দেখলাম। কিন্তু তোমার পেছনে পেছনে না এসে ওদিক দিয়ে আসলাম। যাতে কেউ দেখতে না পায়। বসবে, নাকি পায়চারিই করবে? আমি সোরাহী আর দু'টি পেয়ালা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' মেয়েটি হেসে ওঠে।

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো না, তুমি থাকো কোথায় আর এতো রাতে কোথা থেকে লাফিয়ে পড়েছো? এ কথাও জানতে চায়নি, তুমি যার গণিকা, এই গভীর রাতে সে তোমাকে খুঁজবে কিনা। তার বিশ্বাস, মেয়েটি আবেগ দ্বারা তাড়িত এবং মাথায় ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছে। তথ্য নেয়ার জন্য চেঙ্গিস তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি তোমার কমান্ডার প্রভু থেকে মুক্তি পেতে

চাচ্ছো। এটা তখন সম্ভব হবে, যখন তিনি যুদ্ধে চলে যাবেন। কিন্তু এমন সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। আচ্ছা, তিনি কোন্ ফৌজে আছেন?'

'তিনি বল্ডউইনের ফৌজের হাইকমান্ডের সেনাপতি'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'সম্ভবত যুদ্ধে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ও অন্যান্য মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

'যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি?'– চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে– 'এখানে কেনো এসেছো?

'বল্ডউইন তাকে এখানে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, তিনি যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবেন।' মেয়েটি উত্তর দেয়।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ কোথায়?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'তা তো জানি না'– মেয়েটি বললো– 'তোমার প্রয়োজন হলে জিজ্ঞেস করে বলবো।'

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটিকে আরো বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে। মেয়েটির যা যা জানা ছিলো বলে দেয় এবং যা জানা ছিলো না, সে সম্পর্কে বলে, আমি জেনে তোমাকে পরে জানাবো।

'আচ্ছা, কে লড়াই করলো আর কে জয়লাভ করলো, তাতে তোমার কী আসে-যায়?'– মেয়েটি আবেগময় ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে– 'তিনি যদি আমাকে যুদ্ধের মাঠে যেতে বলেন, আমি যাবো না। আমি তো তার স্ত্রী নই। আমি না আমার বর্তমান প্রভুর দাসী, না সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। আমাকে এতোই অপদস্থ করা হয়েছে যে, এদের প্রত্যেককে– যারা নিজেদেরকে ক্রুশের মোহাফেজ মনে করে– বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়।'

আবেগে আপ্লুত হয়ে মেয়েটি রাশেদ চেঙ্গিসকে ধরে বসিয়ে ফেলে। পেয়ালা দুটো মাটিতে রেখে তাতে মদ ঢালে এবং একটি পেয়ালা চেঙ্গিসের হাতে দিয়ে বললো– 'এমন নির্জন আর গভীর অন্ধকার রাতের রোমাঞ্চকে যুদ্ধের আলাপ দিয়ে নষ্ট করো না, নাও পান করো।'

চেঙ্গিস সমস্যায় পড়ে যায়। দেড় বছর যাবত এই মদ্যপদের মাঝে জীবন অতিবাহিত করছে চেঙ্গিস। নিজ হাতে তাদের মদপান করাচ্ছে। কিন্তু নিজে কখনো এক ঢোকও পান করেনি। এই পাপপূর্ণ পরিবেশে– যেখানে প্রতি মুহূর্তে চলে লোভনীয় পাপের আহ্বান, সেখানেও চেঙ্গিস নিজের ঈমানে কলঙ্কের দাগ পড়তে দেয়নি। এখন এমন একটি মেয়ে তার

হাতে এসে ধরা দিয়েছে, যার মাধ্যমে সে নিজের কর্তব্য ভালোভাবে পালন করতে পারতো। কিন্তু মেয়েটি তার ঠোঁটের সামনে মদের পেয়ালা এগিয়ে ধরলো। আশঙ্কা হচ্ছে, আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে মেয়েটি ফস্‌কে যেতে পারে। চেঙ্গিসের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে– কর্তব্য পালনের খাতিরে পেয়ালাটা হাতে নিয়ে দু'ঢোক পান করে নেবে, নাকি এমন মূল্যবান মেয়েটাকে হাতছাড়া করে ফেলবে।

'আমি মদ পছন্দ করি না।' চেঙ্গিস বললো।

'খোদা তোমাকে পুরুষালী রূপ আর চিত্তাকর্ষক দেহবল্লরী দান করেছেন'– মেয়েটি বললো– 'কিন্তু মদপান না করে প্রমাণ করছো, তুমি পাথরের নিষ্প্রাণ একটি মূর্তি বৈ নও।'

অনেক্ষণ পর্যন্ত পীড়াপীড়ি ও প্রত্যাখ্যানের সংঘাত চলতে থাকে। অবশেষে চেঙ্গিস রূপসী মেয়েটাকে জালে আটকানোর নিমিত্তে তার হাত থেকে মদের পেয়ালাটা নিয়ে নেয়। তারপর পেয়ালায় মুখ লাগায়। মেয়েটি তার পেয়ালায় আরো মদ ঢেলে দেয়। চেঙ্গিস কম্পিত হাতে পেয়ালাটা পুনরায় ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে ধীরে ধীরে পেয়ালাটা খালি করে ফেলে। খানিক পর সে অনুভব করতে শুরু করে, যেনো তার কল্পনার জগতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। তার আশপাশে প্রাচীরসমূহ ভেঙে পড়ছে এবং সে স্বাধীন হয়ে গেছে মনে করে আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। যেনো তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি তাকে দেয়া হয়েছে।

রাশেদ চেঙ্গিস নারীর পরশের সাথে পরিচিত ছিলো না। বিয়েও করেনি। অবিবাহিত হওয়া এবং পেছনে লেজুড় না থাকার কারণেই তাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বেছে নেয়া হয়েছিলো। এটি তার প্রাথমিক গুণ। কিন্তু একটি অতিশয় রূপসী মেয়ে তাকে মদপান করিয়ে যখন তার গা ঘেঁষে বসে পড়লো, তখন 'অবিবাহিত' পরিচয়টাই তার জন্য দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মেয়েটি তাকে কোন পাপের আহ্বান জানাচ্ছে না। তার কাছে সে সেই ভালোবাসা প্রত্যাশা করছে, যা তার আত্মাকে শান্তি দেবে। যেহেতু চেঙ্গিসের চরিত্রে পাপ প্রবণতা ছিলো না, তাই এ মুহূর্তেও তার মনে কোন বাজে ইচ্ছা জাগ্রত হলো না। কিন্তু রূপসী মেয়েটির রেশমী চুলের পরশ, পিপাসু আবেগময় বক্তব্য, সুডৌল বাহু আর সুকোমল গণ্ডদেশ রাশেদ চেঙ্গিসকে সেই চেঙ্গিস থাকতে দিলো না, যা সে দু'ঢোক মদ কণ্ঠনালীতে প্রবেশের আগে ছিলো।

রাত কেটে যাচ্ছে।

রাশেদ চেঙ্গিস যখন আলাদা হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখন মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি আমাকে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলে। আমার সবকিছু জানা নেই। তুমি যদি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পেতে চাও, তাহলে এসব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে আগামী রাতে আবার দেখা করবো।'

অকস্মাৎ চেঙ্গিসের মধ্যে সেই চেঙ্গিস জেগে ওঠে, সে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ছিলো। তার কর্তব্যের কথা মনে পড়ে যায়। এ অনুভূতিও জেগে ওঠে, তার উপর মদ ও নারীর নেশা আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং তাকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। সে মেয়েটিকে বললো– 'তোমার মতো আমারও যুদ্ধের প্রতি কোনো আন্তরিকতা নেই। আমি শান্তির জীবনে বিশ্বাসী। ফৌজ অভিযানে রওনা হলে মদ নিয়ে আমাকেও তো যেতে হবে। তাই জানতে চেয়েছিলাম, আসলেই সহসা কোনো যুদ্ধ হচ্ছে কিনা এবং হলে কোথায় হবে এবং ফৌজ কোন্ পথে অগ্রসর হবে।

ফিরে এসে রাশেদ চেঙ্গিস ভিক্টরকে তখনই ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সমীচীন মনে করলো না। তার কষ্টটা হলো, সে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওনা হয়েছিলো; কিন্তু পথে মেয়েটি তাকে আটকে দিলো এবং তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেলো। সময়টা রাতের শেষ প্রহর। খৃস্টানদের এই বিলাসী জগতে সকাল সকাল জাগ্রত হওয়ার কোনো নিয়ম নেই। চেঙ্গিস ইমামের কাছে যেতে পারতো। কিন্তু মুখে মদের গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার সাহস হলো না। তার মনে অনুভূতি জাগ্রত হলো, মদপান গুরুতর পাপ। কিন্তু পাপটা সে করে ফেলেছে। তথাপি যখন মেয়েটি তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠলো, তার মধ্যে কোন দোষ দেখতে পেলো না। প্রেমের মাদকতা তাকে নতুন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নারীর কল্পনার সঙ্গে কোনো পাপের সংশ্লিষ্টতা ছিলো না। এটি পবিত্র ভালোবাসার আনন্দ, যা ত্যাগ করতে চেঙ্গিস প্রস্তুত নয়।

চেঙ্গিস শুয়ে পড়ে। তার দু'চোখের পাতা বুজে আসে।

ভিক্টর চেঙ্গিসকে জাগিয়ে তোলে। সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। ভিক্টরই প্রথম কথা বলে– 'ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছো? কী কথা হয়েছে?'

'না'– চেঙ্গিস ভিক্টরকে অবাক্ করে দেয়– 'মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারিনি।'

চেঙ্গিস ভিক্টরকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনিয়ে বললো– 'যদি মদপান না করতাম, তাহলে মেয়েটি থেকে আলাদা হওয়ার পরও ইমামের কাছে যেতে পারতাম। সময় ছিলো।'

'মদপান করে ভালো করোনি'– ভিক্টর বললো– 'আগামীতে আর পান করো না। মেয়েটিকে হাত করার জন্য দু'ঢোক পান করেছো বেশ; কিন্তু কর্তব্য পালনে ত্রুটি করা ঠিক হয়নি। ইমামের কাছে যাওয়া তোমার কর্তব্য ছিলো। ইমাম সাহেব তোমার অপেক্ষায় পেরেশান হয়ে থাকবেন। দিনের বেলা যাওয়া ঠিক হবে না। আজ রাতে অবশ্যই যেতে হবে।'

ভিক্টর চেঙ্গিসকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি তো আনাড়ি নও চেঙ্গিস। নিজেই তো বুঝতে পারো মেয়েটির উদ্দেশ্য কী এবং সত্যিই সে অন্তর থেকে তোমাকে ভালোবাসে কিনা? তোমাকে বুঝতে হবে, সে তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে, নাকি তোমাকে মনোরঞ্জনের উপকরণে পরিণত করতে চাচ্ছে। তার ফেরেশতাও তো জানে না তুমি গুপ্তচর। আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আবশ্যক মনে করি যে, নারীর যাদু ফেরাউনদের ন্যায় রাজাদেরকেও সিংহসান থেকে নামিয়ে খড়-কুটোর মধ্যে গুম করে ফেলেছে। নিজের জাতিটাকেই দেখো না, খৃস্টানদের প্রেরিত চিত্তহারি মেয়েরা মিসরে বিদ্রোহের আগুন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করেছে এবং সুলতান আইউবীর অতিশয় বিশ্বস্ত সালারদেরকে গাদ্দারে পরিণত করেছে!'

'আমি এতো কাঁচা নই ভিক্টর'– চেঙ্গিস বললো– 'মেয়েটাকে মজলুম মনে হচ্ছে। ও যে রক্ষিতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু রাজকন্যা বা বেশ্যা নয়। চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা-অলংকার এসবের উপর ভিত্তি করে আমি তাকে শাহজাদি মনে করি। কিন্তু মনের দিক থেকে সে নির্যাতিতা। মেয়েটা পবিত্র ভালোবাসার প্রত্যাশী। তার সকরুণ নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে চাইনি আমি। তুমি ভেবো না আমি তার হয়ে যাবো। তার ভালোবাসা প্রয়োজন– আমি তা তাকে দেবো। আমার তথ্য প্রয়োজন– তা আমি তার কাছ থেকে নেবো।'

'তুমি মন থেকেই তাকে কামনা করছো বুঝি?' ভিক্টর সন্দেহ প্রকাশ করে।

'হ্যাঁ ভিক্টর'– চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'আমি তোমার থেকে কিছুই লুকাবো না। মেয়েটি আমার হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে।'

'অন্তরে ঢুকে পড়া মেয়েরা পায়ের বেড়িতে পরিণত হয়ে যায় চেঙ্গিস।'– ভিক্টর বললো– 'আমি তোমাকে এর চে' বেশি আর কী বলতে

পারি যে, কর্তব্যই সবার বড় ও সবচে' পবিত্র। কর্তব্য ও প্রেমের মাঝে, নেশা ও চেতনার মাঝে, ঈমান ও আবেগের মাঝে এমন কোনো প্রাচীর থাকে না, যা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। থাকে চুলের ন্যায় সরু একটি রেখা, যা সামান্য পদস্খলনে মুছে যায় এবং মানুষ একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। এমনটা যেনো না হয় রাশেদ! তার থেকে তথ্য নিতে নিতে তুমিই বরং নিজেকে তার সম্মুখে উন্মোচিত করে ফেলো।'

রাশেদ চেঙ্গিস একটা অট্টহাসি দিয়ে ভিক্টরের উরুতে চাপড় মেরে বললো- 'এমনটা হবে না দোস্ত, এমনটা হবে না।'

'আর স্মরণ রেখো বন্ধু!'- ভিক্টর বললো- 'মদের সম্পর্ক শয়তানের সঙ্গে। শয়তানের যতোগুলো গুণ আছে, সব মদের মধ্যে আছে। এই অভ্যাসটা গড়ে না ওঠে যেনো। মেয়েটাকে খুশি রাখার জন্য যতোটুকু পান করে চৈতন্য ঠিক রাখা যায়, তার বেশি পান করো না।'

'আচ্ছা, ইমামকে জানানো দরকার, রাতে বিশেষ কারণে আমি যেতে পারিনি। আজ রাতে আসবো।' চেঙ্গিস বললো।

'বাজারে চলে যাও।' ভিক্টর বললো।

ভিক্টর নিজেই বাজারে চলে যায়। তাদের দু-চারজন সঙ্গী বাজারে ব্যবসার আড়ালে দায়িত্ব পালন করছে। ইমামের কাছে ছোটখাট সংবাদ তাদেরই মাধ্যমে পৌঁছানো যায়। ভিক্টর তাদের একজনকে সংবাদ বলে ফিরে আসে।

পরবর্তী রাত। চেঙ্গিস কাজ-কর্ম সেরে তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যায়। কক্ষে প্রবেশ করে ডিউটির পোশাক খুলে অন্য পোশাক পরে কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ পোশাকের তলে লুকিয়ে নেয়। তার ভয়, মেয়েটি হঠাৎ দেখে ফেললে দাড়ির রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তার পরিকল্পনা, ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসার পথে মেয়েটির সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবে। যাবেও সে পথেই। এ পথটি নিরাপদ এবং সংক্ষিপ্ত। চেঙ্গিস গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ এলাকাটিতে ঢুকে পড়ে। মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে পৌঁছুলে একদিক থেকে একটি পরিচিত ছায়া এগিয়ে আসতে দেখে। চেঙ্গিসের পালানো সম্ভব নয়। ছায়াটা আত্মপ্রকাশ করেছে নিকট থেকে। তৎক্ষণাৎই তার সম্মুখে এসে পৌঁছে বলে ওঠে- 'আজ তুমি আগে-ভাগে এসে পড়েছো, এটা আমার ভালোবাসার ক্রিয়া।'

'আর তুমি এতো তাড়াতাড়ি এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেনো?'– চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে– 'মধ্যরাতের ঘণ্টা তো এখনো বাজেনি।'

'আমার মন বলছিলো তুমি ঘণ্টা বাজার আগেই এসে পড়বে।' মেয়েটি বললো।

'কিন্তু আমি ভাবিনি তুমি এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়বে'– চেঙ্গিস বললো– 'আমি একটি কাজে যাচ্ছিলাম। এ পথেই ফেরার ইচ্ছা ছিলো।'

'কাজটা যদি বেশি জরুরী হয়, তাহলে যাও'– মেয়েটি বললো– 'প্রয়োজন হলে তোমার অপেক্ষায় আমি সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।'

'কিন্তু এখন তো আমি এখান থেকে নড়তেই পারবো না'– চেঙ্গিস মেয়েটিকে বাহুতে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললো।

মেয়েটির উন্মুক্ত রেশমী চুলের সৌরভ এবং গায়ের পোশাকে মাখানো সুগন্ধি চেঙ্গিসকে মাতোয়ারা করে তোলে। চেঙ্গিস ইমামের নিকট যাওয়ার পরিকল্পনা মুলতবী করে দেয়। ভাবে, যা-ই হোক না কেনো মেয়েটি খৃস্টান তো বটে। হৃদয়ে প্রভুর প্রতি অনীহা থাকতে পারে। কিন্তু নিজের জাতি এবং ক্রুশকে তো ধোঁকা দিতে পারে না। চেঙ্গিস আশঙ্কা করে, সে যদি ইমামের নিকট যায়, তাহলে মেয়েটি সন্দেহবশত তার পিছু নিতে পারে। তাই ভালোবাসার তীব্রতা প্রকাশ করে সম্মুখে কাজে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়।

মেয়েটি পেয়ালা দুটো মাটিতে রেখে তাতে সোরাহী থেকে মদ ঢেলে একটি পেয়ালা চেঙ্গিসের দিকে এগিয়ে দেয়। চেঙ্গিস অনিচ্ছা প্রকাশ করে– 'তুমি যদি বিষের পেয়ালাও দাও পান করবো; কিন্তু মদপান করবো না।'

'খৃস্টান হয়ে মদকে ঘৃণা করছো কেনো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'মদের নেশা তোমার রূপ ও ভালোবাসার নেশার উপর জয়ী হয়ে যায়'– চেঙ্গিস বললো– 'কৃত্রিম ও দৈহিক হওয়ার কারণে তোমার অন্তর যেমন বিত্ত-বৈভব ও ভোগ-বিলাসকে গ্রহণ করেনি, তেমনি আমার হৃদয় মদকে বরণ করছে না। কারণ, এর নেশাও কৃত্রিম। আমার উপর তুমি তোমার নেশা আচ্ছন্ন করে দাও।'

মেয়েটি মাথাটা রাশেদ চেঙ্গিসের কোলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে তার উপর নিজের নেশা আচ্ছন্ন করে দেয়। রাশেদ চেঙ্গিস এতোক্ষণ তার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছে, তা ছিলো কৃত্রিম ও মিথ্যা। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি মেয়েটির নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। চেঙ্গিস নারীর স্বাদ অনুভব করতে শুরু করে। এখন সে আসক্ত– নারীর আসক্ত। এই আসক্তির মধ্যে নিজেই

পেয়ালাটা তুলে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু গিলে ফেলে।

'আরো দাও।' চেঙ্গিস তৃপ্তি ও আনন্দের ঢেকুর তুলে বললো।

মেয়েটি চেঙ্গিসের হাতে ধরা পেয়ালাটা আবার ভরে দেয়। সে ধীরে ধীরে পান করতে থাকে। তারপর মেয়েটির মধ্যে হারিয়ে যায়।

'আচ্ছা, আমরা এভাবে আর কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে মিলিত হবো?'– মেয়েটি বললো– 'একটু ভেবে দেখো, আমি কতো বড় যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত হয়ে আছি। আমার দেহের মালিক একজন আর হৃদয়ের অধিকারী অন্যজন– তুমি। তোমার ভালোবাসা তার ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর লোকটাকে মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'কোথায় যাবে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'পৃথিবীটা অনেক প্রশস্ত'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'তুমি আমাকে এখান থেকে বের করো। বৃদ্ধ আমার যৌবনটাকে পিষে ফেলছে।'

'ঠিক আছে, যাবো'– চেঙ্গিস বললো– 'ক'টা দিন অপেক্ষা করো। আচ্ছা, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর এনেছো?'

'এনেছি'– মেয়েটি বললো– 'আমাদের বাহিনীগুলো সমবেত হচ্ছে'। কার বাহিনী কোথায় সমবেত হবে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী, মেয়েটি চেঙ্গিসকে বিস্তারিত জানায়। তবে শেষ পরিকল্পনাটা এখনো সে জানতে পারেনি। চেঙ্গসি তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে।

দু'জন আলাদা হয়ে দু'দিকে চলে যায়।

এখন তারা দু'জনে দু'জনার।

'আমি ইমাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি বটে'– চেঙ্গিস ভিক্টরকে বললো– 'তবে মেয়েটির নিকট থেকে নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এনেছি। মেয়েটি আমার জালে ধরা পড়েছে এবং আমার হাতে খেলতে থাকবে।'

'আমার মনে হয় তুমিও তার জালে আটকা পড়ে গেছো'– ভিক্টর সন্দেহের আঙুল তোলে– 'তোমার ভাবগতি বলছে, তার হৃদয় তোমার হৃদয়ে ঢুকে গেছে।'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি, মেয়েটি আমার হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে'– চেঙ্গিস বললো– 'এখন সে এমনও বলেছে, সে আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। আমি তাকে ক'দিন অপেক্ষা করতে বলেছি। তাকে

নিয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খৃস্টানদের পরিকল্পনা পুরোপুরি জানা হয়ে গেলে এসব তথ্য নিজেই কায়রো নিয়ে যাবো। আর মেয়েটিকেও সঙ্গে নেবো।'

'তাকে কখন বলবে, তুমি মুসলমান এবং এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য এসেছিলে?'

'মিসরের সীমান্তে প্রবেশ করে'– চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'এখানে তাকে সামান্যই বলবো।'

চেঙ্গিস প্রেমের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। খৃস্টানদের তথ্য সংগ্রহের জন্য তার যতোটা না চিন্তা, তার চে' বেশি ভাবনা কখন প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের সময় আসবে। সে নিজেই অনুভব করছে, তার ভাবনার ধরন এবং গতিবিধিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসে গেছে। প্রথমবার মদপান করার পর মনে অনুতাপ জাগ্রত হয়েছিলো। কিন্তু গত রাতে নিজ হাতে পেয়ালা তুলে নিয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে মদপান করেছে। এখন এ কাজের জন্য তার কোনো অনুতাপ নেই। এ এক বিরাট পরিবর্তন।

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ জানানো হলো, কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডার আসবেন। তারা রেমন্ডের মেহমান হবেন। চেঙ্গিস তড়িঘড়ি প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলে। তার জানা আছে, এসব মেহমানের আপ্যায়নের এক নম্বর উপকরণ মদ।

রাতে যথাসময়ে মেহমানগণ এসে উপস্থিত হন। অল্প ক'জন বিশিষ্ট মেহমান। চেঙ্গিস ও ভিক্টর বুঝে ফেলে, আজকের অনুষ্ঠানটা মূলত ভোজসভা নয়– গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। ভিক্টর ও চেঙ্গিস আসল কর্তব্য পালনের জন্য বিশেষভাবে তৎপর ও প্রস্তুত। বৈঠকে খৃস্টানদের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান হারমানও উপস্থিত আছেন। মদপানের পালা এবং আক্রমণ বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এখনকার কথোপকথন প্রস্তাব নয়– সিদ্ধান্ত। আছে পরিকল্পনার কাঠামোও। তাদের কথাবার্তায় বুঝা গেলো, শীঘ্রই অভিযান শুরু হয়ে যাবে।

হারমানকে তার বিভাগের তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। যেসব এলাকায় তাদের ফৌজ অবস্থান করছে, সেসব অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেনো সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করে ফেলে। ত্রিপোলীর যেখানে তাদের সবচে' বৃহৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেখানে আইউবীর গোয়েন্দাদের ধরার বিশেষ

ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হারমান আরো জানায়, এখানে শত্রু গোয়েন্দাদের একটি চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদেরকে ব্যর্থ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। একজন লোককে ধরতে পারলে তার মাধ্যমে পুরো গ্যাংটির সন্ধান বেরিয়ে আসবে। কায়রোর গোয়েন্দাদের নিকট নির্দেশনা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওখান থেকে গতকালই একজন এসেছিলো। সে বলেছে, সালাহুদ্দীন আইউবী জোরেশোরে ভর্তি ও প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি জেরুজালেম অভিমুখে যাত্রা করার ইচ্ছা রাখেন।'

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টর যেটুকু তথ্য পেয়েছে, তা-ই যদি কায়রো পৌঁছিয়ে দেয়া যায়, তা সুলতান আইউবীর জন্য যথেষ্ট ছিলো। খৃস্টানরা অতিসত্বর যাত্রা শুরু করবে এবং হাররান ও হাল্ব তাদের গন্তব্য এই সংবাদটা তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবীর কাছে পৌঁছানো দরকার।

বৈঠক ভেঙে যায়। চেঙ্গিস ও ভিক্টর মধ্যরাতের পর ডিউটি শেষ করে। চেঙ্গিসের ইমামের নিকট যাওয়া দরকার। সে প্রতি রাতের ন্যায় পোশাক পরিবর্তন করে এবং কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ পোশাকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে রওনা দেয়। আজ তার যেতে অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই পথে মেয়েটির হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই। চেঙ্গিস নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ে।

রাশেদ চেঙ্গিসের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সবুজঘেরা এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় মেয়েটি ঠিকই তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে যায়। চেঙ্গিস কখনো মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেনি, সে কোথায় থাকে এবং কীভাবে দেখে ফেলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নটা করার ফোরসত পায়নি সে। কারণ, সাক্ষাৎ মাত্রই দু'জনে প্রেমে মজে যাচ্ছে আর মেয়েটি একথা-ওকথায় তাকে ব্যস্ত রাখছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সে ওখানেই ধারে কাছে কোথাও থাকে এবং চেঙ্গিসের পায়ের শব্দ শুনেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু চেঙ্গিস বিষয়টি ভেবে দেখেনি। আজ রাতেও বরাবরের ন্যায় একই ঘটনা ঘটলো। চেঙ্গিস ইমামের কাছে যেতে পারলো না। কিন্তু তার মনে কোন অনুতাপও জাগলো না। মুহূর্ত মধ্যে মেয়েটি তাকে প্রেমে মজিয়ে ফেলে। আজ সে এই প্রথম করুণভাবে নিজের অসহায়ত্ব ও দুঃখের কাহিনী শোনাতে শুরু করে যে, চেঙ্গিসের পা উপড়ে যায়।

'আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও'– মেয়েটি গভীর আবেগের সাথে কম্পিত কণ্ঠে বললো– 'দর্শকরা আমাকে রাণী-রাজকন্যা মনে করে। কিন্তু

বাস্তবে আমার জীবনটা এমন একটা জাহান্নাম, যাকে কাছে থেকে দেখলে তোমার মাথার চুলের আগা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠবে। আমি মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান। কিন্তু রূপ আমাকে এমন এক অত্যাচারের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার বয়স যখন পনের বছর ছিলো, তখন আমার পিতা আমাকে এক আরব ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে দেন। আব্বা গরীব ছিলেন না। তবে ছিলেন অর্থের কুমির। আমরা ছয় বোন ছিলাম। তিনি আমাদেরকে একদম দেখতে পারতেন না। আমার বড় দু'বোন পিতার আচরণে বিরক্ত হয়ে দু'ব্যক্তির হাত ধরে চলে যায়। আর আমাকে তিনি বিক্রি করে দেন। এক বছর পর ব্যবসায়ী আমাকে উপহারস্বরূপ এক খৃস্টান অফিসারের হাতে তুলে দেন।

কিছুদিন পর অফিসার যুদ্ধে নিহত হলে আমি তার সংসার থেকে পালিয়ে আসি। কিন্তু যাবো কোথায়! এক খৃস্টান আমাকে আশ্রয় প্রদান করে। কিন্তু আশ্রয়ের নামে সে আমার শরীরকে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে ফেলে। আমি বেশ্যা ছিলাম না। কিন্তু সে আমাকে কয়েক দিনের জন্য খৃস্টান বাহিনীর উচ্চস্তরের অফিসারদের গণিকা হিসেবে ভাড়া দিতে থাকে। সেই লোকটি এবং সে যাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করতো, সবাই আমাকে অলংকার দিয়ে লাল করে দেয় এবং রাজকন্যার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এদিক থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সুখী ছিলাম। কিন্তু আত্মিক শান্তি আমার কপালে জুটেনি। এই পেশার সুবাদে বড় বড় সামরিক অফিসার-কর্মকর্তার সঙ্গে আমার উঠাবসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে আমি অভিজ্ঞ হয়ে উঠি। আমি সম্রাট ও শীর্ষ স্তরের কমান্ডারদের শয্যা পর্যন্ত পৌঁছে যাই। তারা আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে।

একবার আমাকে বাগদাদ পাঠানো হলো। দায়িত্ব দেয়া হলো নূরুদ্দীন জঙ্গীর এক সালারকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া। আমি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্বটা পালন করেছি। আমি যদি তোমাকে আমার গুপ্তচরবৃত্তির পুরো কাহিনী শোনাতে শুরু করি, তাহলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবে। বোধ হয় বিশ্বাসও করবে না। কাহিনী অনেক দীর্ঘ। যা হোক সেই কমান্ডার আমাকে গণিকা হিসেবে রেখে দেয়। লোকটা বৃদ্ধ। তবে আমাকে নিয়ে বেশ ফূর্তি করতো। সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সম্ভবত অন্যদের বুঝাতে

চাইতো, সে বৃদ্ধ নয় এবং আমার মতো একটি রূপসী যুবতীকে আনন্দে রাখতে সক্ষম। লোকটি আমার সকল আবদার-আকাঙ্খা পূরণ করতো। চাহিদার কথা মুখ দিয়ে বের করতে দেরি; কিন্তু দিতে বিলম্ব করতো না। আমি তার সঙ্গে আক্রায় ছিলাম। সেখানে ঘটনাক্রমে এক মুসলমান গোয়েন্দার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। সে দামেশ্‌ক থেকে এসেছিলো।'

'তার নাম কী?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'নাম শুনে তোমার কী লাভ হবে?' মেয়েটি উত্তর দেয়– 'তুমি তো তাকে চেনো না। আমার কথা শোনো। তোমার ভালোবাসা আমার মুখের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে, আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে। আমি তোমার সম্মুখে এমন সব তথ্যাদি ফাঁস করে দিচ্ছি, যা আমাকে কারাগারে পাঠাতে পারে, যেখানে মানুষরূপী হায়েনারা আমাকে অসহনীয় নির্যাতনে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি তোমার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। যা হোক, আমি বলছিলাম দামেশ্‌কের কথা। সেই গোয়েন্দা ধরা পড়েছিলো এবং তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।

আমি অনেক বড় একজন অফিসারের রক্ষিতা ছিলাম। সেই গোয়েন্দার তামাশা দেখার জন্য আমি পাতাল কক্ষে চলে গেলাম। তাকে এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছিলো যে, আমার গা শিউরে ওঠে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো, তোমার সঙ্গীরা কোথায় এবং এ যাবত তুমি কী কী তথ্য জ্ঞাত হয়েছো? লোকটির পিঠ থেকে রক্ত ঝরছিলো। চেহারাটা নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপরও সে বলছিলো– আমার শিরায় মুসলমান পিতার রক্ত প্রবাহমান। আমি আমার কোনো সহকর্মীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। শুনে আমার শিরাগুলো সব সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভাবি, আমার শিরায়ও তো মুসলিম পিতামাতার রক্ত আছে। আমার মধ্যে ভূমিকম্পের ন্যায় এক ধরনের দোলা খেলে যায়। আমি সংকল্প করি এই মুসলমানটাকে পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে বের করবো। আমি আমার মনিবের পদমর্যাদা, নিজের রূপের জাল আর তিন-চার টুকরো সোনা ব্যবহার করি। একদিন সকালে আমার মনিব আমাকে খবর শোনালেন পাতাল কক্ষ থেকে মুসলমান গোয়েন্দাটা পালিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ জানতো না লোকটা পালায়নি; বরং আমি তাকে পাতাল থেকে সরিয়ে উপরের এক কক্ষে রেখেছি। আমার মনিব যখন আমাকে লোকটার পলায়নের খবর শোনাচ্ছিলেন, সেই পলাতক গোয়েন্দা উক্ত শহরেই

অবস্থান করছিলো। আমি আমার এক মুসলমান চাকরের মাধ্যমে তার আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেছিলাম। সেও তোমারই ন্যায় সুদর্শন যুবক ছিলো। পাতাল কক্ষ তাকে লাশে পরিণত করেছিলো। আমি তাকে ভিটামিন ওষুধ ও পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিলাম। রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি তার কাছে যেতাম। সে আমার সত্ত্বার মধ্যে ঈমান জাগ্রত করে দিয়েছে। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, আমি মুসলিম কন্যা। এখন তোমাকে যে কাহিনী শোনাচ্ছি, তাকেও শুনিয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিলো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি বললাম, আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির কৌশল শিখিয়ে দাও। আমি নিজের জাতি ও ধর্মের জন্য কিছু করতে চাই। সে আমাকে আক্রার তিনজন লোকের নাম-ঠিকানা বলেছিলো। পরে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো।

লোকটা সুস্থ্য হয়ে উঠলে আমি তাকে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেই। তার চলে যাওয়ার পর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকি। তারা আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির পাঠ শেখাতে থাকে। কোর্স সমাপ্ত করে একসময় আমি তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজ করতে শুরু করি। একে তো আমি উচ্চপদসস্থ একজন সেনা অফিসারের রক্ষিতা, তদুপরি আমার রূপ-যৌবনের কারণে অন্য বহু অফিসার আমার বন্ধুত্বের প্রত্যাশী ছিলো। এগুলোকে আমি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি। সম্ভ্রম তো আগেই খুইয়ে ফেলেছি। নির্লজ্জতা এবং যার-তার বিছানায় রাত কাটানো আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। পাপী লোকদের সঙ্গে জীবন-যাপন করে আমি একজন প্রতারক হয়ে ওঠেছিলাম। তাদেরকে অনেক সুদর্শন টোপ দিয়েছি এবং মুসলমানদের অনেক দামি দামি তথ্য দিয়েছি। এই যে গোয়েন্দার কাহিনী শোনালাম, সে আমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথা শোনাতো। আমি আইউবীকে ফেরেশতা মনে করি। আমার মনে আকাঙ্খা জাগে, আমি জাতির জন্য কিছু করে যাবো এবং একবারের জন্য হলেও সুলতান আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো আর সেই সাক্ষাতকেই আমি আমার হজ্ব মনে করবো। এখন আমি সেই কমান্ডারের সঙ্গে এখানে এসেছি। না এসে পারিনি। খৃস্টানরা বিপুল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। আমি তাদের সমস্ত তথ্য জেনে নিয়েছি। এখন আমার এমন একজন লোক প্রয়োজন, যে আইউবীর গুপ্তচর।'

'এতো বীরত্বের সঙ্গে তুমি এসব তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছো কেনো?'– চেঙ্গিস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি সত্যিই যদি গোয়েন্দা হয়ে থাকো, তাহলে তুমি একেবারেই আনাড়ি। তুমি আমার ভালোবাসার উপর নির্ভর করছো। যদি বলি, আমি তোমা অপেক্ষা ক্রুশকে বেশি ভালোবাসি এবং আমার অফাদারী ক্রুশের প্রতি, তাহলে তুমি কী করবে? বুদ্ধিমান গোয়েন্দা কর্তব্যের খাতিরে নিজের সন্তানকেও কুরবান করে থাকে।'

'যদি আসল কথাটা বলি, তাহলে মানতে বাধ্য হবে। আমি আনাড়ি নই'– মেয়েটি বললো– 'আমি জানি, নিশ্চিত করেই জানি, তুমি খৃস্টান নও–তুমি মুসলমান এবং মিসরের চর।'

রাশেদ চেঙ্গিস নিজের অলক্ষ্যেই চমকে ওঠে, যেনো মেয়েটি তাকে দংশন করেছে। মদের নেশা আর রোমাঞ্চকর আবেগের মাদকতা সহসা এমনভাবে উবে যায়, যেনো ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে গেছে। চেঙ্গিস কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু মনে হলো যেনো তার কিছুই বলার নেই। মেয়েটি তো ঠিকই বলেছে।

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটির চাপা হাসির শব্দ শুনতে পায়। মেয়েটি বললো– 'বলো, আমি কি আনাড়ি?'

কোন উত্তর দেয়া চেঙ্গিসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মেয়েটি সত্যিই যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তাহলে নিজের পরিচয়টা কি স্বীকার করে নেয়া উচিত? নিয়ম তো ছিলো এক দলের গোয়েন্দা নিজ দেশেরই অপর দলের কাছেও পরিচয় গোপন রাখবে। চেঙ্গিস তো এও জানে না, মেয়েটা কোন্ স্তরের গোয়েন্দা। এমনও তো হতে পারে, সে যা বলেছে সবই মিথ্যা এবং আসলেই সে খৃস্টানদের গুপ্তচর। তাছাড়া সুলতান আইউবীর তো কোন নারীকে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করেন না। এই মেয়েটি যদি মুসলমানদের চরবৃত্তি করেও থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ নিজের থেকেই করছে। এমন একটি মেয়েকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি।

'চুপ হয়ে গেলে কেনো?'– মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে– 'আমি কি ভুল বলেছি?'

'সম্পূর্ণ ভুল বলেছো'– রাশেদ চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'তুমি আমাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছো।'

'কীরূপ সমস্যা?' মেয়েটি জানতে চায়।

'এই যেমন আমি তোমাকে গ্রেফতার করাবো, নাকি ভালোবাসার খাতিরে চুপ থাকবো'– চেঙ্গিস বললো– 'আমি খৃস্টান এবং পাক্কা ক্রুসেডার।'

দু'জনই মাটিতে বসা। মেয়েটি নিজের উরুর নীচ থেকে কিছু একটা বের করে চেঙ্গিসের কোলের মধ্যে রেখে দিয়ে বললো– 'এই নাও তোমার দাড়ি। কাল যখন তুমি আমার কাছে ছিলে, তখন তোমার চোগার পকেট থেকে এগুলো বের করেছিলাম। আজো বের করে নিয়েছি। কিন্তু তুমি কালও টের পাওনি, আজও না।'

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটির ভালোবাসা এবং মদের নেশায় এমনই মজে গিয়েছিলো যে, তার কোনো হুঁশ-জ্ঞান ছিলো না।

'এক রাতে এই দাড়ি আমি তোমার মুখে দেখেছিলামও'– মেয়েটি বললো– 'এই দাড়ি স্থাপন করে তুমি কক্ষ থেকে বের হয়েছিলে। আমি তোমাকে পথে থামিয়ে দেই এবং তুমি যখন আমাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরেছিলে, তখন তোমার চোগার উভয় পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছিলাম। আমার হাত দাড়ি অনুভব করেছিলো।'

'কৃত্রিম দাড়ি দেখেই তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, আমি গোয়েন্দা?'

'তুমি যে ধারায় আমার কাছে খৃস্টানদের যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে, সে ধারাটা গোয়েন্দাদের'– মেয়েটি বললো– 'আমাকে তুমি যেসব প্রশ্নের উত্তর এনে দিতে বলেছিলে, সেসব প্রশ্ন গোয়েন্দা ছাড়া অন্য কারো জানার বিষয় নয়। আর মদপান করতে অস্বীকার করে শুধু মুসলমানরাই।'

মেয়েটি বলতে বলতে থেমে যায়। নিজের একটা বাহু চেঙ্গিসের কাঁধের উপর রেখে তার গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে বললো– 'তুমি আমাকে ভয় করছো। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি মুসলমান? আমার অন্তরটা তোমাকে কীভাবে দেখাবো। আমরা দু'জন একই পথের পথিক। আমি তোমাকে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা মনে করে হৃদয়ে স্থান দেইনি। তবে তোমাকে আমার কেনো যে ভালো লাগলো, বলতে পারবো না। আমার এমনটা মনে হয়েছিলো, তুমি আর আমি আকাশেও একত্রে ছিলাম, পৃথিবীতেও একত্রিত হয়েছি এবং দু'জনে এক সাথেই উত্থিত হবো। তুমি বললে আমি তোমার গোয়েন্দা হওয়ার পক্ষে আরো একাধিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করবো। আমি এই সংকল্পও করে রেখেছি, আমরা দু'জন অনেক মূল্যবান তথ্য নিয়ে এখান থেকে একত্রে বেরিয়ে যাবো। এসব তথ্য যদি সময়মতো কায়রো না পৌঁছে, তাহলে হাররান, হাল্ব, হামাত, দামেশ্ক ও বাগদাদ খৃস্টানদের

সয়লাবে ডুবে যাবে। মিসরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুলতান আইউবী এখানকার আয়োজন-প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর। সময় নষ্ট করো না। আমার পক্ষে এখান থেকে একাকি বের হওয়া সম্ভব ছিলো না। আমাকে তোমার সঙ্গ প্রয়োজন। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের নামে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। তুমি আমার রক্ষী সাজবে। তাহলে কেউ আমাদেরকে সন্দেহ করবে না।'

রাশেদ চেঙ্গিসের মুখে কোন কথা নেই। মেয়েটি পেয়ালায় মদ ঢালে। মদভর্তি পেয়ালাটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবেগমাখা কণ্ঠে বললো– 'তুমি ভয় পেয়ে গেছো। মদটা পান করে নাও। এটি মদের শেষ পেয়ালা। এরপর আমরা তওবা করে নেবো।'

মেয়েটি চেঙ্গিসের উপর নিজের রেশমী চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে পেয়ালাটা তার ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে ধরে। চুলের কোমল ছোয়া আর সৌরভ, নারী দেহের নরম পরশ আর উত্তাপ এবং মদ সবকিছু মিলে চেঙ্গিসের মুখ খুলে দেয়– 'তুমি সত্যিকার অর্থেই গোয়েন্দা। অন্যথায় দেড়টি বছর সব গোয়েন্দার প্রধান গুরু হারমানের ছায়ায় থাকা সত্ত্বেও তিনি ধরতে পারেননি আমি গোয়েন্দা। আমি তোমার বিচক্ষণতার কাছে হার মানলাম। তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা একই পথের পথিক। আমার সঙ্গে তুমি কায়রো চলো।'

'অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে'– মেয়েটি বললো– 'আগামীকাল এখানে এসে সাক্ষাৎ করবো। আমি তোমাকে আরো এমন সব তথ্য জানাবো, যা জানা তোমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হবে না।'

রাতের শেষ প্রহর। রাশেদ চেঙ্গিস নিজ কক্ষে গিয়ে পৌঁছে। ইতিপূর্বে এতো রাতে ফিরে কখনো সে ভিক্টরকে জাগায়নি। সকালে ঘুম থেকে জেগে তাকে রাতের কাহিনী শোনাতো। কিন্তু আজ রাত চেঙ্গিসের আনন্দের জোয়ার ধৈর্যের বাঁধ মানছে না। অন্যরকম এক উত্তেজনা বিরাজ করছে তার হৃদয় জগতে। নিজেকে একজন সফল সেনানায়ক মনে হচ্ছে তার। যে মেয়েটি তাকে হৃদয় দিয়েছিলো, যে সুন্দরী মেয়েটিকে সে ভালোবেসেছিলো; সে মুসলমান এবং সুলতান আইউবীর একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর। একটি রূপসী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপোলী ত্যাগ করতে যাচ্ছে, এটিও কম আনন্দের বিষয় নয়।

রাশেদ চেঙ্গিস তখনই ভিক্টরকে জাগিয়ে তোলে এবং জানায়, আরে, মেয়েটি তো আমাদেরই গোয়েন্দা সদস্য! চেঙ্গিস ভিক্টরকে মেয়েটির রাতের পুরো কাহিনী শোনায়।

'তুমি কি তাকে বলে দিয়েছো তুমি গোয়েন্দা?' ভিক্টর জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'– চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'বলাই প্রয়োজন ছিলো।'

'আমার কথাও বলেছো?'

'না'– চেঙ্গিস উত্তর দেয়– 'তোমার সম্পর্কে কোনো কথা হয়নি।' ভিক্টরকে চুপচাপ দেখে চেঙ্গিস বললো– 'তুমি কি মনে করছো, আমি ভুল করেছি? আমি আনাড়ি নই ভিক্টর!'

'আমার কথা না বলে তুমি ভালো করেছো'– ভিক্টর বললো– 'আর এ দাবিটা করো না, তুমি আনাড়ি নও।'

'আমি কি ভুল করেছি?' চেঙ্গিস পুনরায় জিজ্ঞেস করে।

'হতে পারে তুমি অনেক ভালো কাজ করেছো'– ভিক্টর বললো– 'আর যদি ভুল করে থাকো, তাহলে এই ভুল সাধারণ ভুল নয়। তুমি সম্ভবত ভুলে গেছো, একজন মাত্র গুপ্তচর একটি বাহিনীর জয়ের কারণ হতে পারে। আবার হতে পারে পরাজয়ের কারণও। তুমি জানো, সুলতান আইউবী খৃস্টানদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে অনবহিত। আমরা যদি ধরা পড়ে যাই আর এই তথ্য আমাদের সঙ্গে কয়েদখানায় চলে যায় কিংবা জল্লাদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তাহলে 'সকল যুদ্ধে বিজয়ী সেনানায়ক' বলে খ্যাত সুলতান আইউবী ইতিহাসে 'পরাজিত সিপাহসালার' আখ্যায়িত হবেন।'

'না'– চেঙ্গিস পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো– 'সে আমাকে ধোঁকা দেবে না। সে মুসলমান। আমি আগামী রাতে আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবো। এখন আর আমাদের ইমামের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই তথ্য আমি নিজেই কায়রো নিয়ে যাবো। আমার হৃদয়ের রাণী আমার সঙ্গে থাকবে। তবে আমার অবর্তমানে কারো মনে সন্দেহ জাগবে না, আমি এখান থেকে তথ্য নিয়ে পালিয়ে গেছি। কারণ, মেয়েটিও যেহেতু আমার সঙ্গে যাবে, তাই প্রচার করে দিও তুমি আমাকে ও তাকে গোপনে মিলিত হতে দেখেছো এবং আমি মেয়েটিকে নিয়ে জেরুজালেমের দিকে চলে গেছি। ঘটনাটিকে প্রেমঘটিত বলে প্রচার করতে হবে।'

ভিক্টর গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায়। রাশেদ চেঙ্গিস মদের নেশায় ঝিমুতে শুরু করে।

চেঙ্গিস যখন ভিক্টরের কক্ষে প্রবেশ করে, তখন অদূরে অবস্থিত অফিসারদের বেডরুমগুলোর একটিতে মেয়েটিও প্রবেশ করে। কক্ষের বাসিন্দা ঘুমিয়ে আছে। মেয়েটি কক্ষে ঢুকেই অবলীলায় তার একপা ধরে সজোরে ঝটকা টান দেয়। লোকটি বিড় বিড় করে ওঠে। মেয়েটি হেসে বললো– 'ওঠো, ওঠো, শিকার মেরে এসেছি।'

লোকটি ধড়মড় করে শয্যা ছেড়ে উঠে বসে বাতি জ্বালায়। তারপর মেয়েটিকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ফেলে দেয়। কিছু সময় অশ্লীলতার নগ্ন প্রদর্শনী চলে। তারপর মেয়েটি যে সোরাহীতে করে চেঙ্গিসের জন্য মদ নিয়ে গিয়েছিলো, তার অবশিষ্টটুকু দু'টি পেয়ালায় ঢেলে দু'জনে মিলে পেয়ালা দুটো খালি করে ফেলে।

'এবার বলো, কী সংবাদ নিয়ে এসেছো?'

'লোকটি গোয়েন্দা'– মেয়েটি বললো– 'আর মুসলমান।'

'তাহলে তো হারমানের সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হলো।'

'সম্পূর্ণ সঠিক'– মেয়েটি বললো– 'মদ আর আমার যাদু ক্রিয়া করেছে। অন্যথায় হারমানের ন্যায় অভিজ্ঞ গোয়েন্দাও তাকে ধরতে পারতেন না। যদি তার কৃত্রিম দাড়ি আমার হাতে না পড়তো, তাহলে বোধয় আমিও ব্যর্থ হতাম। আমার সন্দেহ তো সেদিনই দূর হয়ে গিয়েছিলো, যেদিন প্রথম সে মদপান করতে অস্বীকার করে। মুসলমান না হলে মদপান করবে না কেনো। তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি, লোকটা মুসলমান। আমি তাকে বলেছি, আমি পবিত্র ভালোবাসার জন্য ছটফট করছি। তখনই সে সরলমনে আমাকে ভালোবেসে ফেলে–পবিত্র ভালোবাসা। এটাও প্রমাণ করে লোকটা মুসলমান। আমাদের লোকেরা তো ভালোবাসার কথা বলে প্রথমে বস্ত্র উদোম করে থাকে।'

'ভালোবাসা পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র নারীর দেহ পাহাড়কেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম'– লোকটি বললো– 'এই দুর্বলতা প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেও বিরাজমান। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রূপ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দিতে সক্ষম হবে। নারী সশরীরে কাছে থাকুক কিংবা নিছক কল্পনায়, মানুষকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে।'

লোকটা খৃস্টানদের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিসার এবং হারমানের নায়েব। হারমানের কোনোভাবে সন্দেহ হয়ে গিয়েছিলো, চেঙ্গিস গুপ্তচর। একে তো তিনি একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা; তদুপরি তাকে নির্দেশ দেয়া

হয়েছে, কাউকে গোয়েন্দা বলে সামান্যতম সন্দেহ হলেও তাকে ধরে ফেলো। রাশেদ চেঙ্গিসকে সম্ভবত রাতে তিনি মসজিদে যেতে দেখেছিলেন। তাই নায়েবকে নির্দেশ দেন, কোনো নারীর ফাঁদে ফেলে দেখো লোকটা সন্দেহমুক্ত নাকি সন্দেহভাজন। এ বিভাগে বেশ ক'জন নারী কাজ করছে, যারা একজন অপেক্ষা অপরজন বেশি রূপসী। হারমানের নায়েব এই মেয়েটিকে নির্বাচন করে চেঙ্গিসের পেছনে লেলিয়ে দেয়। মেয়েটি তার বিদ্যায় অভিজ্ঞ। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে সে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে, যার বিস্তারিত আপনারা পড়েছেন। চেঙ্গিস কখনো ভাবেনি, প্রতি রাতে ইমামের নিকট যাওয়ার সময় এই যে মেয়েটি তার পথ আগলে দাঁড়ায়, আসে কোথা থেকে এবং কীভাবে জানে যে সে যাচ্ছে? মেয়েটি ছায়ার মতো তার পিছে লাগা ছিলো। তার প্রতিটি গতিবিধিই সে প্রত্যক্ষ করতো।

'আমি তাকে তোমার গড়ে দেয়া বেদনাদায়ক কাহিনী শোনালে সে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে'– মেয়েটি বললো– 'তৎক্ষণাৎ সে বিশ্বাস করে নেয়, আমি মুসলমান এবং সত্যি সত্যিই আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করছি।'

'মুসলমান আবেগপ্রবণ জাতি'– হারমানের নায়েব বললো– 'বরং এরা এক বিস্ময়কর ও অভিনব সম্প্রদায়। মুসলমানরা ধর্মের নামে এমন সব ত্যাগ স্বীকার করে বসে, যা অন্য কোন জাতি পারে না। যুদ্ধের ময়দানে একজন মুসলমান দশ-পনেরজন খৃস্টানের মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং করছেও। একে তারা ঈমানী শক্তি বলে অভিহিত করে। আটজন, দশজন কমান্ডো সৈনিকের আমাদের পেছনে চলে যাওয়া, গেরিলা আক্রমণ করা, আমাদের খাদ্যসামগ্রীতে অগ্নি সংযোগ করে উধাও হয়ে যাওয়া, ঘেরাও-এর মধ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া, বের হতে না পারলে নিজেদেরই লাগানো আগুনে স্বেচ্ছায় ভষ্মীভূত হওয়া কোন সাধারণ বীরত্ব নয়। এ এক অস্বাভাবিক শক্তি। আমি তাদের এই শক্তিকে অলৌকিক বিষয় মনে করি। আমাদের কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন, যারা মানব চরিত্রের দুর্বল শিরাগুলো চেনেন। তারা মুসলমানদের এই শক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে এমন কতিপয় পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় উন্মাদনাকে তাদের দুর্বলতায় পরিণত করছে। এখন তারা যাকে ধর্মীয় চেতনা বলে মনে করে, সেটাই মূলত তাদের দুর্বলতা। এক্ষেত্রে ইহুদীরা

অনেক কাজ করেছে। আমরা কতিপয় ইহুদী ও খৃস্টানকে মুসলমানদের আলেমের রূপে প্রেরণ করে এই সাফল্য অর্জন করেছি। মুসলিম অঞ্চলের বেশক'টি মসজিদের ইমাম মূলত ইহুদী কিংবা খৃস্টান। তারা কুরআন-হাদীসের এমন ব্যাখ্যা সর্বসাধারণের মাঝে গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন, যার উপর ভিত্তি করে মুসলমান ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অনুসারী হয়ে চলেছে। তাদের সফল তৎপরতার ফলে মুসলমান এখন এমন সব কর্মকাণ্ডকে ইসলাম বা দীন বলে বিশ্বাস করে, যা মূলত ইসলাম পরিপন্থী। এখন তাদেরকে ধর্মের নামে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ানো যায়, আমরা যার মহড়া করিয়ে দেখিয়েছি। মুসলমানদের মাঝে আমরা যৌন উন্মাদনাও সৃষ্টি করে দিয়েছি। এখন যে মুসলমানের হাতে বিত্ত আর ক্ষমতা আসে, আগে সে হেরেম তৈরি করে এবং তাকে সুন্দরী যুবতীদের দ্বারা সাজায়। এই নারীপূজা এখন মুসলমানদের উচ্চস্তর থেকে শুরু করে নিম্নস্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা একাধিক পন্থায় মুসলিম মেয়েদের মাঝে কল্পনাপূজা ও মনস্তাত্ত্বিক বিলাসিতা ঢুকিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া মুসলমান একটি আবেগপ্রবণ জাতি। তুমি তো দেখেছো, তোমার শিকার মুসলমানটির আবেগে খোঁচা দিয়েছো আর অমনি সে তোমার জালে ফেঁসে গেলো। আবেগ বড় একটি দুর্বলতা। হারমান বলে থাকেন, অদূর ভবিষ্যতে এই জাতিটা কল্পনার দাস হয়ে যাবে এবং বাস্তব থেকে দূরে সরে যাবে। তখন আর আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হবে না। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মুসলমান আমাদের দাসানুদাস হয়ে যাবে। নিজেদের নীতি-আদর্শ ত্যাগ করে তারা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে গৌরববোধ করবে।'

'আমার ঘুম আসছে'– মেয়েটি বিরক্ত কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমাকে একটি শিকার দিয়েছি। তুমি ওটাকে এখনই গ্রেফতার করে নাও।'

'না'– নায়েব বললো– 'তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। গ্রেফতার করতে চাইলে তার সঙ্গে এ নাটক খেলার প্রয়োজন ছিলো না। তোমাকেও এতো কষ্ট দেয়া হতো না। আমরা তো সামান্যতম সন্দেহেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারি। আমরা এখনই তাকে গ্রেফতার করবো না। তার মাধ্যমে তার সেই সকল সহকর্মীর সন্ধান বের করতে হবে, যারা ত্রিপোলীতে গোয়েন্দাগিরি করছে। তাদের মধ্যে নাশকতাকারী কমান্ডোও থাকতে পারে। তার মাধ্যমে অন্যান্য শহরের শত্রু গোয়েন্দাদেরও চিহ্নিত করা যেতে পারে। তুমি তার সঙ্গে আবারও দেখা করো। তাকে বলবে,

আমি সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি। এখন আরো কয়েকজন গোয়েন্দার প্রয়োজন। এ-ও বলবে, এক স্থানে খৃস্টানরা বিপুল পরিমাণ দাহ্য পদার্থ ও মূল্যবান মালামাল মজুদ করে রেখেছে। আক্রমণে যাওয়ার সময় এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমাদেরকে এগুলো ধ্বংস করতে হবে। এ কাজের জন্য তুমি আমাদের এখানকার কমান্ডোদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।'

'আমি বুঝে গেছি'— মেয়েটি বললো— 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে তার সঙ্গীদের তথ্য ফাঁস করবে না।'

হারমানের নায়েব মেয়েটির মাথার চুল, নগ্ন কাঁধ ও বুকে হাত বুলিয়ে বললো— 'কেনো, তোমার এসব অস্ত্র কি অকর্মণ্য হয়ে গেছে? নিজের মুখোশ খুলে দিয়ে লোকটা দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এবার তোমাকে ভেতরে ঢুকে কোণায় কোণায় তল্লাশি নিতে হবে। এ কাজটাও তুমি করতে পারবে। আমি সকালে হারমানকে তোমার কৃতিত্বের কথা অবহিত করবো।'

রাতের আহারের পর চেঙ্গিস ও ভিক্টর কর্তব্য পালন করছে। এমন সময় হারমান এসে হাজির হন। তিনি চেঙ্গিসের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ হাত মেলান এবং বললেন— 'তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, আমাদের বাহিনী ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আক্রমণ অভিযানে রওনা হতে যাচ্ছে। আমরা তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করাবো। ভিক্টরও সঙ্গে থাকবে। যেহেতু দু'-তিনজন সম্রাট সঙ্গে থাকবেন, তাই তোমাদেরকেও সঙ্গে থাকা আবশ্যক।'

'আমি প্রস্তুত আছি।' চেঙ্গিস বললো।

হারমান রিপোর্ট পেয়ে গেছেন, রাশেদ চেঙ্গিস গুপ্তচর এবং আজ রাত তার বিভাগের এক রূপসী যুবতী তার গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদেরও নাম-ঠিকানা উদ্ধার করবে। হারমান মেয়েটিকে নতুন কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন এবং নায়েবকে বললেন, চেঙ্গিসের দলের সন্ধান বের না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটি একাকি তার সঙ্গে মিলিত হতে থাকবে। পাশাপাশি সতর্ক থাকবে, যেনো চেঙ্গিসের কোনো সন্দেহ জাগতে না পারে।

চেঙ্গিসের কোনো কাজে মন বসছে না। গুনে গুনে ক্ষণ অতিক্রম করছে। এতো বড় সাফল্য তার কখনো অর্জিত হয়নি। একদিকে এতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেয়েছে গেছে, অপরদিকে একটি অতিশয় রূপসী তরুণীও তার মুঠোয় এসে পড়েছে। এ এক বিরাট অর্জন। এ রাতটাকে সে ত্রিপোলীতে শেষ রাত

মনে করছে। আগামী রাত তথ্য ও মেয়েটিকে নিয়ে ত্রিপোলী ত্যাগ করছেই। মনে আনন্দের ঠাঁই হয় না রাশেদ চেঙ্গিসের।

অবশেষে ডিউটি শেষ করে রাশেদ চেঙ্গিস কক্ষে চলে যায়। ভিক্টরও তার সঙ্গে আছে। চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করে। আজ কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ নেয়নি। প্রয়োজন নেই। খঞ্জরটা চোগার পকেটে লুকিয়ে নেয়।

'আমি তোমাকে শেষবারের মতো বলছি'– ভিক্টর বললো– 'নারী ও মদের নেশা থেকে মুক্ত থেকে মাথা ঠিক রেখে কথা বলবে। আমার ভয় হচ্ছে, পুরোপুরি যাচাই-বাছাই না করে তুমি তাকে আমাদের গোপন তথ্য দিয়ে দেবে।'

'শোনো ভিক্টর'– চেঙ্গিস বিস্ময়কর এক ভঙ্গিতে বললো– 'আমি মেয়েটার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনবো না। আমি তার সঙ্গে একাধিকবার দীর্ঘ সাক্ষাৎ করেছি, তার পুরো কাহিনী শুনেছি। সে এখন আমার ভালোবাসার মানুষ। আমি তাকে শতভাগ বিশ্বাস করি। তার সঙ্গে যেহেতু তোমার কোনো কথা হয়নি, তাই তুমি বুঝবে না। তুমি আমাকে পাগল মনে করো না। এটা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা।'

ভিক্টর নীরব হয়ে যায়। চেঙ্গিসের বলার ধরণ থেকেই সে বুঝে ফেলেছে লোকটার হুঁশ–জ্ঞান ঠিক নেই। এখন সে একটি মেয়ের প্রেমে মাতোয়ারা। ভিক্টর বুঝে, রাশেদ চেঙ্গিস একটি সুদর্শন যুবক। এই মেয়েটির চেয়েও অধিক রূপসী ও উচ্চস্তরের নারী তার জন্য পাগলপারা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এই মেয়েটির ব্যাপারে তার ঘোর সন্দেহ, সে চেঙ্গিসকে ধোঁকা দিচ্ছে। আর যদি ধোঁকা নাও দিয়ে থাকে, তবু চেঙ্গিস নিজের আসল পরিচয় বলে দিয়ে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই মেয়েটি মুসলমান গুপ্তচরও যদি হয়, তবুও তার উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ, তাকে তো সরকারীভাবে পাঠানো হয়নি।

ভিক্টরের যোগ-বিয়োগ মিলছে না।

রাশেদ চেঙ্গিস চলে গেছে। ভিক্টর গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায়। চেঙ্গিসের চলে যাওয়ার পর ভিক্টরের ঘুমিয়ে যাওয়ার নিয়ম। কিন্তু আজ তার ঘুম আসছে না। ভিক্টর কক্ষে গিয়ে না শুয়ে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করতে থাকে।

মেয়েটি একই স্থানে চেঙ্গিসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সন্নিকটে

মাটিতে মদের সোরাহী ও দু'টি পেয়ালা পড়ে আছে। অন্ধকারে চেঙ্গিসকে ছায়ার ন্যায় আসতে দেখে দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝাপটে ধরে, যেরূপ ঝাপটে ধরে ছোট্ট শিশু তার মাকে। মেয়েটি এমনভাবে প্রেম নিবেদন ও আত্মসমর্পণের ভাব প্রদর্শন করে যে, চেঙ্গিসের বিবেকের উপর যৌনতার মাদকতা আচ্ছন্ন করে ফেলে। রূপসী মেয়েটি তার রূপ-যৌবনের সেই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে, যেগুলোর উপর হাত বুলিয়ে হারমানের নায়েব বলেছিলো, তোমার এসব অস্ত্র অকর্মণ্য হয়ে যায়নি তো।

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো না তো?'– মেয়েটি চাপা কণ্ঠে চেঙ্গিসকে জিজ্ঞেস করে– 'তোমার ভালোবাসা আমাকে এমন অসহায় বানিয়ে দিয়েছে যে, আমি আমার এমন স্পর্শকাতর তথ্যাবলী তোমাকে দিয়ে দিয়েছি।'

মেয়েটি এক হাতে চেঙ্গিসের কোমর ধরে গায়ে গা মিশিয়ে তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে মদের সোরাহী ও পেয়ালা রাখা আছে। চেঙ্গিসকে বসিয়ে পেয়ালায় মদ ঢেলে বললো– 'নাও, জয়ের আনন্দে এক পেয়ালা'।

চেঙ্গিস এতোই উৎফুল্ল যে, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালাটা হাতে তুলে নেয় এবং গল গল করে পেয়ালাটা খালি করে ফেলে। মেয়েটি শূন্য পেয়ালায় আবারো মদ ঢালে। চেঙ্গিস তাও পান করে ফেলে।

তাদের থেকে আট-দশ কদম দূরে একটি বৃক্ষ। পেছন থেকে কে যেনো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে গাছটার আড়ারে বসে পড়ে। রাতের নীরবতা খা খা করছে। বৃক্ষের আড়ালে বসা লোকটি চেঙ্গিস ও মেয়েটির কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। তারা খানিকটা উচ্চস্বরেই কথা বলছে।

'এবার বলো, কী খবর নিয়ে এসেছো?' চেঙ্গিস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে।

'এমন সংবাদ এনেছি, যা সুলতান আইউবী জীবনে স্বপ্নেও শুনেননি'– মেয়েটি বললো– 'আমি খৃস্টানদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।' মেয়েটি চেঙ্গিসকে খৃস্টানদের পরিকল্পনা ও অগ্রযাত্রার পথ বলে দেয়। আক্রমণ কোথায় হবে তাও অবহিত করে। খৃস্টান বাহিনীর রসদ কোন্ পথে যাবে এবং রওনা কবে হবে, সব বলে দেয়।

'এখান থেকে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া দরকার'– চেঙ্গিস বললো– 'কাল রাতেই যাবে?'

'না'– মেয়েটি বললো– 'আমাদের যেসব তথ্যের প্রয়োজন ছিলো, পেয়ে গেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তা না নিভিয়ে যাবো না। খৃস্টানরা তাদের বাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ

রসদ সংগ্রহ করেছে। অস্ত্র আর তাঁবুর তো কোনো হিসাবই নেই। তরল দাহ্য পদার্থের মটকাও আছে। আছে তরিতরকারীর সম্ভার। এসব দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এগুলো ধ্বংস করা কঠিন কিছু নয়। পাহারা এটুকু ব্যবস্থা আছে যে, মাত্র সাত-আটজন সিপাহী রাতে টহল দেয়। এই ভাণ্ডার খৃস্টানরা তিন-চার মাসে সংগ্রহ করেছে। আমরা যদি এগুলো ধ্বংস করে দিতে পারি, তাহলে তাদের আক্রমণ তিন-চার মাসের জন্য পিছিয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে সুলতান আইউবী তার প্রস্তুতি পরিপূর্ণ করে নিতে পারবেন। তুমি তো হারমানকে জানো। আমি তার হৃদয় থেকেও তথ্য বের করে এনেছি। তিনি বলেছেন, সুলতান আইউবী নতুন ভর্তি নিচ্ছেন। তার আগেকার বাহিনীটি আপন ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, এখন আর তাদের যুদ্ধ করার শক্তি নেই। এই অভাগা খৃস্টানরা আইউবীর সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে। এ সময় প্রয়োজন হলো খৃস্টানদের অভিযান বিলম্বিত করে দেয়া। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের রসদ জ্বালিয়ে দেয়া। তাদের যে হাজার হাজার ঘোড়া আছে, সেগুলোও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হতে পারে।'

'রসদে আগুন লাগাবে কে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'তুমিই বলতে পারো, এখানে তোমাদের কতো লোক আছে'– মেয়েটি বললো– 'এদের মধ্যে কমান্ডোও আছে নিশ্চয়ই। দায়িত্বটা তাদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। এখানে তোমাদের কতোজন কমান্ডো সেনা আছে?'

'সুলতান আইউবী নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, অধিকতৃ অঞ্চলে নাশকতা চালানো যাবে না। কেননা, কমান্ডোরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এদিক-ওদিক সরে যায়। তার শাস্তি ভোগ করে নিরীহ সাধারণ মুসলমান'– চেঙ্গিস বললো– 'খৃস্টানরা তাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এ কারণে আমরা আমাদের কমান্ডোদের ফেরত পাঠিয়েছি। যে ক'জন আছে, সবাই গুপ্তচর। তবে তারা নাশকতাও চালাতে জানে। তাছাড়া তারা এখানকার কিছু যুবককেও প্রস্তুত করতে পারে।'

'তাদেরকে কি কোনো এক স্থানে একত্র করার ব্যবস্থা করা যায়?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে এবং চেঙ্গিসের পেয়ালায় মদ ঢেলে পেয়ালাটা তার হাতে ধরিয়ে দেয়।

'আমরা একটি মসজিদকে আমাদের আস্তানা বানিয়ে রেখেছি'– মদের পেয়ালাটা খালি করে চেঙ্গিস বললো। মসজিদের অবস্থান জানিয়ে সে

বললো– 'উক্ত মসজিদের ইমাম আমাদের নেতা। অত্যন্ত যোগ্য ও সাহসী মানুষ। আজ রাতেই আমি এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলবো। কালই তিনি যুবকদেরকে মসজিদে একত্রিত করবেন। তারা সকলে নামাযের নাম করে মসজিদে এসে হাজির হবে।'

'শুধু একজন যোগ্য ও সাহসী লোক দ্বারা কাজ হবে না'– মেয়েটি বললো– 'ইমামের সঙ্গে তুমিও থাকবে। তাছাড়া আরো তিন-চারজন বিচক্ষণ লোকের প্রয়োজন, যাতে এই নাশকতা পরিকল্পনাটা নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা যায়। আর এই সম্ভার তখন ধ্বংস করতে হবে, যখন আমরা দু'জন এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। কারণ, ঘটনার পরপরই শহর সীল হয়ে যাবে। তখন আর আমরা বেরুতে পারবো না।'

'শুধু ইমাম নন'– চেঙ্গিস বললো– 'এখানে আমাদের একজন থেকে অপরজন অধিক যোগ্য লোক আছে।' চেঙ্গিস কয়েকজন লোকের নাম বললো– 'আমি এদের প্রত্যেককে মসজিদে উপস্থিত করতে পারি।'

চেঙ্গিস থেকে এসব তথ্যই নিতে চাচ্ছে মেয়েটি। সে চেঙ্গিসকে তার দল সম্পর্কে আরো জিজ্ঞাসা করে, যা চেঙ্গিস অকপটে বলে দেয়। অবশেষে বললো– 'জানো, এই প্রাসাদেও আমি একা নই, ভিক্টর নামক যে লোকটি আমার সঙ্গে কাজ করে, সেও আমার দলের সদস্য।'

'ভিক্টরও?' মেয়েটি চমকে ওঠে জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ'– চেঙ্গিস বললো– 'তুমি কি আমাদের ওস্তাদির প্রশংসা করবে না যে, আমরা একজন খৃস্টানকেও আমাদের গুপ্তচর বানিয়ে রেখেছি?'

মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব থাকে। তারপর বললো– 'আগামীকাল দিনের বেলা আমি তোমার কক্ষে আসবো। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

মেয়েটি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকটি নড়ে ওঠে। বসে বসে কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে এবং আট-দশ কদমের দূরত্বটা দু'লাফে অতিক্রম করে মেয়েটাকে পেছন থেকে এক বাহু দ্বারা ঝাপটে ধরে। তার খঞ্জরধারী হাত উপরে উঠেই তীব্রবেগে নীচে নেমে আসে। খঞ্জর মেয়েটার বুকে গেঁথে যায়। মেয়েটা হাল্কা একটা চীৎকার দিয়ে শুধু বললো– 'আমার বুকে খঞ্জর ঢুকে গেছে।'

চেঙ্গিস ঝটপট নিজের খঞ্জরটা বের করে বীরত্বের সাথে লোকটার উপর আক্রমণ চালায়। লোকটি মোড় ঘুরিয়ে মেয়েটিকে সামনে নিয়ে আসে এবং

বলে– 'আমি ভিক্টর চেঙ্গিস! এই হতভাগীর বেঁচে না থাকাই উচিত।'

মেয়েটি কোঁকাচ্ছে। ভিক্টর তাকে পেছন থেকে এক বাহুতে ঝাপটে ধরে আছে।

'তুমি অপদার্থ খৃস্টান'– মদের নেশায় বুঁদ হওয়া চেঙ্গিস বললো– 'সাপের বাচ্চা!' চেঙ্গিস মোড় ঘুরিয়ে ভিক্টরের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

ভিক্টর মেয়েটিকে আবার সামনে নিয়ে এসে তাকে ঢাল বানিয়ে বললো– 'চৈতন্যে আসো চেঙ্গিস! মেয়েটাকে সবকিছু বলে দিয়ে তুমি আমাদের খেলাটা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছো। ও যদি জীবিত থাকে, তাহলে রাত পোহাবার পরই আমরা সকলে গ্রেফতার হয়ে যাবো।'

চেঙ্গিস ক্ষ্যাপা সিংহের মতো ভিক্টরের চার পার্শ্বে ঘুরছে আর হুংকার ছাড়ছে। মেয়েটির এখনো চৈতন্য আছে। সে কোঁকাতে কোঁকাতে বললো– 'চেঙ্গিস! আমার রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম। খৃস্টানরা আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আমি বাঁচবো না। এই লোকটা আমাদের নয়– খৃস্টানদের গুপ্তচর।'

চেঙ্গিস লাফ দিয়ে ভিক্টরের উপর আক্রমণ করে। ভিক্টর তাকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করে, তুমি প্রতারণার শিকার। চলো, মেয়েটাকে হত্যা করে লাশটা দূরে ফেলে আসি। কিন্তু চেঙ্গিস এখন কারো গোয়েন্দা নয়। এখন সে একজন পুরুষ, যার প্রেয়সীকে অন্য এক পুরুষ ধরে রেখেছে এবং তার বুকে খঞ্জর বিদ্ধ করেছে। সম্মুখ থেকে সে মেয়েটাকে সজোরে এক ধাক্কা মারে যে, ভিক্টর পেছন দিকে পড়ে যায় আর মেয়েটি তার উপর ছিটকে পড়ে। চেঙ্গিস ভিক্টরের উপর খঞ্জরের আঘাত হানে। ভিক্টর পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিলো। সে একদিকে সরে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। চেঙ্গিস তার উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। খঞ্জর তার কাঁধে গিয়ে আঘাত হানে।

ভিক্টর নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। চেঙ্গিসের বেঁচে থাকাও ঝুঁকিপূর্ণ। ভিক্টরের খঞ্জর চেঙ্গিসের পেটে আঘাত হানে। চেঙ্গিস পাল্টা আঘাত করে। ভিক্টরের বাহু কেটে যায়। ভিক্টর চেঙ্গিসের বুকে খঞ্জর মারে। মদমত্ত চেঙ্গিস দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভিক্টর তার বুকের উপর আরেকটি আঘাত হানে। চেঙ্গিস লুটিয়ে পড়ে যায়। ভিক্টর মেয়েটার বুকে হাত রাখে। হৃদপিণ্ডটা নীরব। মরে গেছে। চেঙ্গিসও শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। এখন আর চৈতন্য নেই তার।

ভিক্টরের কাঁধ ও বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। মেয়েটির পরিধানের কাপড় ছিঁড়ে বাহুটা বেঁধে নেয় সে। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য কাঁধের জখমে

কাপড় ঢুকিয়ে দেয়। ভিক্টর হাঁটতে শুরু করে।

ভিক্টর দ্রুত হাঁটছে। জখমের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। তবু তার কোনো পরোয়া নেই। অবলীলায় হাঁটছে ভিক্টর।

ভিক্টর একটি গলিতে ঢুকে পড়ে। দু'টি মোড় অতিক্রম করে সে একটি প্রশস্ত গলিতে পৌঁছে যায়। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ত্রিপোলী। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে সর্বত্র। প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ। একটি মাত্র ঘরের দরজা খোলা– আল্লাহর ঘর মসজিদের দরজা।

ভিক্টর এই মসজিদে এ-ই প্রথমবার এসেছে। তবে কীভাবে আসতে হবে, এসে কী করতে হবে, তার জানা আছে। বাম দেয়ালে একটি দরজা আছে। এটিই ইমামের বাসার দরজা। ভিক্টর পায়ের জুতো খুলে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

রাতের অর্ধেকটা কেটে গেছে। ইমাম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দরজার করাঘাত তাকে জাগিয়ে তোলে। জাগ্রত হয়ে তিনি খানিক অপেক্ষা করেন। পুনরায় করাঘাত পড়ে। ঠিক আছে, আমারই গোয়েন্দাদের বিশেষ সাংকেতিক আওয়াজ। তারপরও তিনি লম্বা খঞ্জরটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন– 'চেঙ্গিস?'

'ভিক্টর'– ভিক্টর জবাব দেয়– 'ভেতরে চলুন।'

'রক্তের গন্ধ আসছে কোথা থেকে?' ইমাম অন্ধকারে ভিক্টরের বাহু ধরে জিজ্ঞেস করে।

'আমার রক্ত।' ভিক্টর জবাব দেয়।

ইমাম ভিক্টরকে টেনে ভেতরে নিয়ে যান। বাতি জ্বালালে দেখতে পান ভিক্টরের পরিধেয় রক্তে লাল এবং ভিজা। ইমাম ভিক্টরকে কখনো দেখেননি। পরিচয়টা চেঙ্গিসের মুখে শোনা। ভেতরের খবরাখবর পরিবেশন করা ছিলো তার দায়িত্ব। ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ভিক্টরের কোন প্রয়োজন ছিলো না।

'তুমি এসেছো?'– ইমাম জিজ্ঞেস করেন– 'চেঙ্গিস আসেনি কেনে?'

'চেঙ্গিস আর কখনো আসবে না।' ভিক্টর উত্তর দেয়।

'কেনো?'– ইমাম ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'ধরা পড়েছে?'

'হ্যাঁ, ধরা পড়েছে'– ভিক্টর জবাব দেয়– 'নিজের পাপের হাতে ধরা পড়েছে। আমার খঞ্জর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে। আপনি আমার রক্ত

দেখতে পাচ্ছেন। সম্ভব হলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আপনি ভয় পাবেন না। আল্লাহর শোকর আদায় করুন যে, চেঙ্গিস জীবিত নেই! অন্যথায় আমাদের প্রত্যেককে কয়েদখানার নির্যাতনে জীবন হারাতে হতো।

ইমাম তাড়াতাড়ি ওষুধ বের করেন। পানি আনেন। ভিক্টরের জখম ধুইতে শুরু করেন। ভিক্টরকে পোশাক পরিবর্তন করতে বললেন।

'না'– ভিক্টর বললো– 'আমি আমার করণীয় ঠিক করে রেখেছি। এই কাপড়েই আমি ফিরে যাবো। আমি আপনার নুন খেয়েছি। আমার প্রিয় বন্ধু ও অতিশয় বিপজ্জনক সফরের সঙ্গী আমার হাতে খুন হয়েছে। আমি স্থির করেছি, আপনাদের সকলের জন্য নিজেকে কুরবান করে দেবো। নিজের ঘাড়টা জল্লাদের সম্মুখে অবনত করে দিয়ে আপনাদের সকলকে রক্ষা করবো।'

ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ইমাম তাতে ওষুধ প্রয়োগ করছেন আর ভিক্টর ইমামকে সমস্ত ঘটনা বলে শোনাচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে ভিক্টর বললো– 'আমার সন্দেহ জেগে গিয়েছিলো মেয়েটি প্রতারণা করছে। সে নিজেকে একজন বৃদ্ধ কমান্ডারের রক্ষিতা বলে দাবি করতো; কিন্তু আমি এমন কোনো বৃদ্ধ কমান্ডারকে কখনো দেখিনি। প্রতিদিন তার চেঙ্গিসের পথে দাঁড়িয়ে থাকা প্রমাণ করে, সে নিকটেই কোথাও থাকতো এবং চেঙ্গিসের উপর দৃষ্টি রাখতো। আমি চেঙ্গিসকে যখনই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছি, সে ক্ষেপে ওঠেছে। আমি আপনাকে বলেছি, সে মদপানও করতে শুরু করেছিলো। আমার সন্দেহ, তাকে মদের সঙ্গে হাশিশ মিশিয়ে খাওয়ানো হতো। অন্যথায় চেঙ্গিসের মতো কঠিন ও পাকা ঈমানের মানুষটা এতো তাড়াতাড়ি এবং এতো সহজে এই ফাঁদে পা দেয়ার কথা নয়। অনেক রূপসী নারী তাকে ভালোবাসার জালে আটকানোর চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সব অফারই সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটি তাকে নিজের রূপ আর হাশিশ মিশ্রিত মদের যাদুতে দৈহিকভাবে নয়– মানসিকভাবে ঘায়েল করে নিয়েছিলো।'

চেঙ্গিস যখন বললো, সে মেয়েটিকে বলে দিয়েছে সে গোয়েন্দা, তখন আমার মনটা কেঁপে ওঠেছিলো। আমি যেনো অদৃশ্য থেকে ইঙ্গিত পেয়ে গেছি, এটি এতো বিরাট পদস্খলন, যার শাস্তি শুধু তার নয়– আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু। তার এই পদস্খলন মিসর-সিরিয়ার আযাদীর অপমৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেয়েটি তার বিবেকের উপর যে যাদু প্রয়োগ করে দিয়েছিলো, তা তাকে

আমাদের থেকে এবং নিজের ঈমান ও কর্তব্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিলো। আমি তখনই সংকল্প করে নিয়েছি, রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র পথ আছে– মেয়েটিকে হত্যা করতে হবে। চেঙ্গিস যদি এই ভয়ঙ্কর পথ থেকে সরে না আসে, তাহলে তাকেও শেষ করে ফেলতে হবে। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে একজন মানুষকে হত্যা করা কোনো ব্যাপার নয়। তাছাড়া গোয়েন্দা বিধান তো আছেই যে, কারো প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ হলে কিংবা কারো মাধ্যমে তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারপরও আমি সময় নিয়েছি। তাকে রক্ষা করেই জাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু লোকটি আমাকে খুন করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলো।'

'এমনও তো হতে পারে, তুমি তাকে ভুল বুঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে হত্যা করেছো'– ইমাম বললেন– 'হতে পারে মেয়েটি আসলেই মুসলমান এবং সত্যমনেই আমাদের জন্য কাজ করছিলো।'

'হতে পারে'– ভিক্টর বললো– 'কিন্তু আমি নিশ্চিত ঘটনা এমন নয়। আমি প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমি মেয়েটিকে সেই ভবন থেকে বের হতে এবং ওখানেই ফিরে যেতে দেখেছি; যে ভবনে হারমানের বিভাগের মেয়েরা থাকে। আমি এও জেনেছি, মেয়েটি কোনো কমান্ডারের রক্ষিতা নয়। আজ রাত আমি চেঙ্গিসের পেছনে চলে গেলাম এবং যে স্থানে চেঙ্গিস মেয়েটিকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলো, আমি সেখান থেকে কয়েক পা দূরে একটি গাছের আড়ালে বসে গেলাম। মেয়েটি চেঙ্গিসের নিকট যেসব তথ্য জানতে চায় এবং যে ধারায় জিজ্ঞেস করে, তা-ই আমাকে নিশ্চিত করার যথেষ্ট ছিলো যে, মেয়েটি খৃস্টানদের গুপ্তচর। মেয়েটি ত্রিপোলীতে আমাদের কমান্ডো সেনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সে চেঙ্গিসকে জানালো, খৃস্টান বাহিনীর জন্য রসদ ইত্যাদির বিপুল সম্ভার সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে দাহ্য পদার্থের অসংখ্য মটকাও আছে। আমিও গুপ্তচর। আমি ভালো করেই জানি, এখানে কোথাও এতো সম্ভার সংগ্রহ করা হয়নি। এই সম্ভার রাখার যে জায়গার কথা বলেছে, সেখানে কিছুই নেই। প্রয়োজন মনে করলে আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন। চেঙ্গিস মেয়েটির কাছে আমাদের সবগুলো স্পট চিহ্নিত করে দিয়েছে। নাম উল্লেখ করে আমাকেও ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি আমার নাম শুনে বিস্ময় লুকাতে পারেনি। এ তথ্য পাওয়ার পর সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকে। তারপর

উঠে দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েটি আমাদের অতিশয় বিপজ্জনক তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলো। এ তথ্য যাচ্ছিলো সোজা হারমানের কাছে। আপনি এর পরিণতি আন্দাজ করতে পারবেন। আমি উঠে প্রথমে মেয়েটিকে ধরে ফেলি এবং খঞ্জরটা তার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে দেই। চেঙ্গিস মেয়েটির পক্ষ নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি তাকে অনেক বুঝালাম, ঘটনার বাস্তবতা বুঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মদ আর নারীর পরশ তাকে পশু বানিয়ে রেখেছিলো। আমি তার খঞ্জরের আঘাত খেয়েও বুঝালাম। কিন্তু কোনো বুঝ নেয়ার মতো অবস্থা তার ছিলো না। আমি অনুভব করলাম, চেঙ্গিস জীবিত থাকলে আমি তাকে কাবুতে রাখতে পারবো না এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যাবে। আমি তাকেও খতম করে দিলাম।'

'তুমি ভালো করেছো'– ইমাম বললেন– 'আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। এখন তুমি ত্রিপোলী থেকে বেরিয়ে যাও। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'না'– ভিক্টর বললো– 'রাত পোহালে সকলে চেঙ্গিস ও মেয়েটির লাশ দেখবে। আমার বিশ্বাস, হারমান জেনে ফেলেছেন চেঙ্গিস গোয়েন্দা ছিলো। তিনিই মেয়েটিকে তার পেছনে লাগিয়েছিলেন। তাই তিনি ধরে নেবেন এদেরকে মুসলমান গোয়েন্দারা খুন করেছে। তারপর এখানকার মুসলমানদের উপর কেয়ামত নেমে আসবে। আগেই নির্দেশ জারি হয়ে গেছে, কারো উপর চরবৃত্তির সন্দেহ হলে তাকে বন্দি কিংবা হত্যা করে ফেলবে। হারমান এখানকার প্রতিটি গৃহের উপর একজন করে গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছেন। তারা মুসলমানদেরকে টার্গেট বানানোর বাহানা খুঁজছে। আমি নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি। এই খুনের দায় আমি নিজে বহন করবো। কারণ বলবো, আমি আর চেঙ্গিস একই নারীর প্রেম-প্রত্যাশী ছিলাম।'

'তোমার থেকে আমরা এতো কুরবানী গ্রহণ করবো না'– ইমাম বললেন– 'আমি একজন লোক দেবো, যে তোমাকে কায়রো রেখে আসবে।'

'আমি আমার জীবনের কুরবানী দিতে চাই'– ভিক্টর বললো– 'আমার শহরে খৃস্টান বাহিনীর দু'জন অফিসার আমার এক বোনের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলো। সে সময়টার কথা আমার স্মরণ আছে। তারা তাদের সৈনিকদেরকে আমার বোনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলো। কোন খৃস্টান আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তিনজন মুসলমান যুবক খৃস্টান সৈন্যদের মোকাবেলা করেছিলো। তারা আহত হয়েছিলো। তবু

তারা আমার বোনকে রক্ষা করেছে। খৃস্টানদের উচ্চ পর্যায়ে ভালো একজন অফিসার ছিলেন। তিনি আমার অভিযোগ শুনেছিলেন। অন্যথায় শেষ পর্যন্ত আমার বোনও রক্ষা পেতো না, প্রতিরোধকারী মুসলিম যুবকরাও রেহাই পেতো না। এই ঘটনাটাই আমাকে মুসলমানদের গোয়েন্দায় পরিণত করেছে। আমি আপনার জাতিকে এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে চাই। নিজের জীবনটা জল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি ত্রিপোলীর মুসলমানদের জীবন ও সম্মান রক্ষা করবো।'

ভিক্টর ইমামকে জানায়– 'খৃস্টানরা সৈন্য সমাবেশ শুরু করেছে। তাদের গন্তব্য হাল্‌ব। প্রথমে তারা সিরিয়া জয় করার ইচ্ছা পোষণ করছে। তবে রওনা কবে হবে এখনো জানা যায়নি। এও জানা সম্ভব হয়নি, তাদের সকল সৈন্য একই এলাকার উপর আক্রমণ চালাবে, নাকি সামনে গিয়ে বিভক্ত হয়ে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে হামলা করবে। এসব সংবাদ খুব তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবীর কানে পৌঁছে যাওয়া দরকার, যাতে তিনি মিসরে বসে না থাকেন।

ভিক্টর যা কিছু জানতে পেরেছিলো, ইমামকে জানিয়ে দেয়। সে উঠে দাঁড়ায়। ইমাম যেতে নিষেধ করলে বললো– 'আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে কেউ ধরতে পারবে না।'

ভিক্টর বেরিয়ে যায়।

ভিক্টরের ক্ষতস্থানের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ইমাম তার জখম দুটোতে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে এই ভেবে পট্টিগুলো খুলে ফেলে যে, যাদের নিকট যাচ্ছে, তারা জিজ্ঞেস না করে বসে ব্যান্ডেজ কে করে দিয়েছে?

পট্টি খুলে ফেলার পর আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়। চেঙ্গিস ও মেয়েটির লাশ যেখানে পড়ে আছে, ভিক্টর সেখানে এসে পৌঁছে। রাতের শেষ প্রহরের চাঁদ উপরে উঠে এসেছে। ভিক্টরের মদের সোরাহী ও দু'টি পেয়ালার উপর দৃষ্টি পড়ে। মেয়েটির চেহারার প্রতি গভীর চোখে তাকায়। মৃত্যু মেয়েটির চেহারার রূপ নষ্ট করতে পারেনি। উন্মুক্ত রেশমকোমল চুলগুলো বুকের উপর ছড়িয়ে আছে। ভিক্টর পুনরায় মদের সোরাহীটার প্রতি তাকিয়ে মনে মনে বললো– 'হায়রে মানুষ! নিজের ধ্বংসের জন্য কতোই না উপায় বের করে নিয়েছো!'

ভিক্টর চেঙ্গিসের লাশটার প্রতি তাকায়। খানিক কি যেনো ভেবে এক পার্শ্বে বসে পড়ে। চেঙ্গিসের মরদেহটা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভিক্টর তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললো– 'তুমি ভালোভাবেই জানতে বন্ধু, নারী পুরুষের জন্য কতো বড় দুর্বলতা আর মদ কতো রাজা-বাদশাহর সিংহাসন উল্টে দিয়েছে। তারপরও জেনে-শুনে তুমি এই দুর্বলতা নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছো। যাক গে ওসব, আমিও আসছি বন্ধু! জল্লাদ খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তোমার নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। আমরা একই পথের পথিক। আমি আসছি বন্ধু– আমি আসছি।'

ভিক্টর উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। খৃস্টান অফিসারদের বাসভবন তার গন্তব্য। জখম থেকে রক্ত ঝরছে। খঞ্জরটা খাপ থেকে বের করে দেখে খঞ্জরের গায়ে রক্ত জমে আছে। নিজের জখমের রক্ত দ্বারা খঞ্জরটা ভিজিয়ে নেয়। খঞ্জর হাতে নিয়েই হাঁটছে ভিক্টর।

অধিক রক্তক্ষরণের ফলে ভিক্টর শরীরে দুর্বলতা অনুভব করছে। অফিসারদের ভবনে এসে পৌঁছে একটি দরজায় করাঘাত করে। তার জানা আছে, এখন তাকে যার নিকট যেতে হবে, তার বাসগৃহ এটিই। কিছুক্ষণ পর এক কর্মচারি দরজা খুলে দেয়। ভিক্টর অফিসারের নাম উল্লেখ করে বললো– 'ওনাকে জাগিয়ে তুলে বলো এক খুনী এসেছে।'

চাকর দৌড়ে ভেতরে চলে যায়।

ভেতর থেকে বকবকানির শব্দ ভেসে আসতে শুরু করে। অফিসার গালাগাল করতে করতে এগিয়ে আসেন। দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'কে তুমি? কাকে খুন করে এসেছো?'

চাকর একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে ছুটে আসে। অফিসার আলোতে ভিক্টরকে দেখে বললেন– 'তুমি? কার সঙ্গে লড়াই করেছো?'

'আমি দু'জন মানুষের খুনের দায় স্বীকার করতে এসেছি'– 'ভিক্টর বললো– 'আমাকে গ্রেফতার করুন।'

অফিসার ভিক্টরের মুখে সজোরে একটা চপেটাঘাত মেরে বললেন– 'খুন করার আর সময় পাওনি? দিনে করলে না কেনো? আমি কি তোমার বাপের চাকর যে, এখন তোমাকে গ্রেফতার করবো? আমার গভীর সুখ নিদ্রাটা তুমি বরবাদ করে দিয়েছো!' পরক্ষণে চাকরকে বললেন– 'যাও, একে নিয়ে কয়েদখানায় বন্দি করে রাখো।'

চাকর ভিক্টরকে বাহুতে ধরে হাঁটতে শুরু করলে অফিসার গর্জন করে

বলে ওঠলেন– 'দাঁড়াও, থামো জংলী কোথাকার! ভেবে দেখলে না লোকটা তো পথে তোমাকেও খুন করে ফেলতে পারে। ভেতরে নিয়ে আসো। শুনি কী করেছে।'

'আমি একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে হত্যা করেছি স্যার!' ভিক্টর উচ্চকণ্ঠে বললো।

'হত্যা করেছো?'– অফিসার চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করে– 'হত্যা করেছো? যদি কোনো মুসলমানকে হত্যা করে থাকো, তাহলে যাও নিজের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করাও। তুমি তাকে খুন না করলে নিশ্চয়ই সে তোমাকে খুন করে ফেলতো। আর যদি কোনো খৃস্টানকে খুন করে থাকো, তাহলে তোমাকেও খুন হতে হবে। ভেতরে এসে খুলে বলো কী ঘটেছে।'

'আপনি আমার সঙ্গে অতিশয় সুদর্শন এক যুবককে দেখে থাকবেন'– ভিক্টর ভেতরে গিয়ে বসে বললো– 'একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিলো। আমার সেই বন্ধু মেয়েটিকে ফুসলিয়ে আমার সাথে তার সম্পর্ক ভেঙে দেয়। নিজে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তার দ্বারা আমাকে অপদস্ত করায়। কিন্তু আমি হাল ছাড়তে চাইনি। দু'জনে মিলে আমাকে অনেক যন্ত্রণা দেয়। আজ রাতে আমি তাদেরকে একসঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় বসে থাকতে দেখে ফেলি। আমি মূলত তাদের দেখতেই গিয়েছিলাম। তাদেরকে এমন অবস্থায় দেখলাম যে, আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি মেয়েটির উপর আক্রমণ করে বসি এবং তাকে খঞ্জরের আঘাতে হত্যা করে ফেলি। তারপর আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আমার সংঘাত হয়। সে আমাকে দু'টি আঘাত করে। আমিও তাকে দু'টি আঘাতই করেছিলাম। কিন্তু আঘাত ছিলো গুরুতর। সেও মারা যায়। আমি কোথাও পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আপনার নিকট এসে পড়েছি।'

'নারীর জন্য খুন করা এবং খুন হওয়া কোনোটিই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' অফিসার বললেন।

ঘটনাটিকে অফিসার মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। এই মুহূর্তে কথা শুনতেই তার ভালো লাগছে না। চোখে তার রাজ্যের ঘুম। কে খুন হলো আর কে খুন করলো, সেদিকে তার কোনোই ভ্রুক্ষেপ নেই। ভিক্টরকে তিনি ছেড়েই দিতেন বোধ হয়। কিন্তু ততোক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। লাশ দু'টো দেখা হলো।

আসল ঘটনা জানতে পেরে হারমান ও তার নায়েব ক্ষোভে পাগলের

মতো হয়ে যান। নিহত মেয়েটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সক্রিয় গুপ্তচর ছিলে আর চেঙ্গিস ছিলো তার শিকার, যার মাধ্যমে তার পুরো দলের সন্ধান বে করার পরিকল্পনা ছিলো। তাদের সব পরিকল্পনা ও অর্জন শেষ হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে মূল্যবান গোয়েন্দা মেয়েটিকেও হারাতে হলো।

ভিক্টরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। কেউ তার ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার কথা ভাবলো না। হারমান তাকে প্রহার করতে শুরু করেন। মার খেয়ে ভিক্টর অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর আর কখনো তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। পরদিন অচেতন অবস্থায়ই তাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। জল্লাদ কুড়ালের এক আঘাতে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

যে সময়ে ভিক্টরের মাথা ও দেহকে একটি গর্তে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছিলো, ঠিক তখন ইমামের প্রেরিত এক গোয়েন্দা ত্রিপোলী থেকে বহুদূর চলে গিয়েছিলো। তাকে উটের পিঠে চড়িয়ে পাঠানো হয়েছে। কায়রো পর্যন্ত সফর অনেক দীর্ঘ ও দুর্গম, যার ধকল একমাত্র উটই সহ্য করতে পারে।

৫৩৭ হিজরীর (১১৭৭ সাল) প্রথম দিকের ঘটনা। কায়রোর সামরিক এলাকায় অস্বাভাবিক জাঁকজমক বিরাজ করছে। কোন মাঠে ঘোড়া ছুটাছুটি করছে। কোথাও পদাতিক সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কায়রো থেকে দূরে পার্বত্য এলাকার দৃশ্যটা এমন, যেনো সেখানে যুদ্ধ চলছে। এসব হলো, সুলতান আইউবীর বাহিনীর সামরিক মহড়া। এক উপত্যকায় দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে এসে বিশ-পঁচিশ গজ বিস্তৃত এই আগুনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। একটি মহড়া দূরবর্তী বালুকাময় প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো সৈনিকের সঙ্গে পানি রাখার অনুমতি নেই।

কঠিন এক প্রশিক্ষণ। এরা সকলে নবাগত যোদ্ধা। ভর্তি এখনো চলছে। ফৌজের সকল সালার ও অন্যান্য অফিসার এই প্রশিক্ষণদানে মহাব্যস্ত। সুলতান আইউবী সালতানাতের অন্যান্য কাজ ও সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেন রাতে। দিন কাটে তাঁর প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান ও সালারদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের মধ্য দিয়ে। তিনি সকলকে বলে রেখেছেন, খৃস্টানরা যদি সিরিয়ার উপর আক্রমণ না করে, তার অর্থ হবে, তারা যুদ্ধ থেকে তাওবা করেছে কিংবা তাদের মস্তিষ্ক সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তার এই দুই ধারণার একটিও সঠিক নয়। তারা অবশ্যই আসবে।'

'এ সময় পর্যন্ত কোন না কোনো অধিকৃত এলাকা থেকে কারো না করো আসবার কথা ছিলো'- সুলতান আইউবী পার্শ্বে দন্ডায়মান এক সালারকে উদ্দেশ করে বললেন। তখন তিনি একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে সামরিক মহড়া দেখছিলেন। তিনি বললেন- 'খৃস্টানরা অবশ্যই আসবে। গোয়েন্দারাই বলতে পারবে, তারা কোন্ দিক থেকে আসবে, কোথায় আসবে এবং তাদের সেনাসংখ্যা কতো হবে।'

সুলতান আইউবী টিলার উপর থেকে নীচে নেমে একদিকে হাঁটতে শুরু করেন। হঠাৎ দেখতে পান, দূরে একস্থানে ধূলি উড়ছে, যা একটি কিংবা দু'টি ঘোড়ার ধূলি হবে। সুলতান দাঁড়িয়ে যান। ধূলি ও সুলতানের মাঝে দূরত্ব কমতে থাকে। দু'টি ঘোড়া তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। একটির আরোহী আলী বিন সুফিয়ান। অপরজন ত্রিপোলী থেকে ইমামের প্রেরিত গোয়েন্দা। সুলতান তাকে চেনেন না। লোকটি উটের পিঠে করে বেশ ক'দিনে কায়রো গিয়ে পৌঁছে। আলী বিন সুফিয়ান তার থেকে রিপোর্ট নিয়ে তাকে একটি ঘোড়া দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

গোয়েন্দা সুলতান আইউবীকে জানায়- 'খৃস্টানরা ইসলামী দুনিয়ার উপর চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সেনা সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে। খুনিনের সম্রাট রেনাল্টের সৈন্যসংখ্যা সবচে' বেশি। তিনি মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন।'

'সেই রেনাল্ট, যাকে মুহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.) গ্রেফতার করে বন্দি করেছিলেন'- সুলতান আইউবী বললেন- 'জঙ্গী তাকে শর্তের ভিত্তিতে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গীর অকাল মৃত্যু রেনাল্টের শর্তহীন মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতা আর সোনা-জহরতের লোভী আমীরগণ নুরুদ্দীন জঙ্গীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে পুতুল শাসক বানিয়ে রেনাল্টকে মুক্তি দিয়ে দেয়। আজ সেই রেনাল্ট ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য আসছে। ...আচ্ছা, তারপর বলো। আক্রমণ তাদের করারই কথা। আর কে থাকবে?'

'ত্রিপোলীর সম্রাট রেমন্ড'- গোয়েন্দা বললো- 'অধিকতর সৈন্য সমাবেশ সেখানেই হচ্ছে। আক্রমণের বিস্তারিত সেখানেই স্থির হচ্ছে। তৃতীয়জন বল্ডউইন। তার সৈন্যও কম নয়। তবে তারা কবে নাগাদ রওনা হবে, জানা যায়নি। আক্রমণ হবে সিরিয়ার উপর। হাল্‌ব, হাররান ও হামাতের নামও শোনা যাচ্ছে। অভিযানটা খুব তাড়াতাড়ি হবে।'

'আলী বিন সুফিয়ান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি ত্রিপোলীর সর্বশেষ সংবাদের অপেক্ষায় থাকবো।'

'না'– আপনি আর কোনো সংবাদের অপেক্ষায় থাকবেন না'– আলী বিন সুফিয়ানের পরিবর্তে ত্রিপোলী থেকে আসা গোয়েন্দা উত্তর দেয়– 'খৃস্টানদের সামরিক শাখায় আমাদের দু'জন লোক ছিলো। দু'জনই মারা গেছে।'

গোয়েন্দা সুলতান আইউবীকে রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টরের কাহিনী শোনায়। সুলতান আইউবীর চোখ লাল হয়ে যায়। গোয়েন্দা বললো– 'রেনাল্ট দাবি করছেন, তার বাহিনীতে দুইশত পঞ্চাশজন নাইট থাকবে। আমাদের উক্ত দুই গোয়েন্দা মৃত্যুর আগে ইমামকে জানিয়েছিলো, খৃস্টানরা আপনাকে অতর্কিত গেরিলা আক্রমণ পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ দেবে না। তারা এমন কৌশল অবলম্বন করবে, আপনি তাদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবেন। আপনার সৈন্য কম এই দুর্বলতা তাদের জানা আছে। আপনি যাতে ঘুরে-ফিরে লড়াই করতে না পারেন, এই লক্ষ্যেই তারা অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসছে।'

এই গোয়েন্দা রিপোর্টের পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এখন বাইরে তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। তিনি কক্ষবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করেছেন। কাগজে সম্ভাব্য রণাঙ্গনের নকশা এঁকে তার উপর অগ্রযাত্রা ও অন্যান্য কৌশলের দাগ টানছেন। যোগ-বিয়োগ দিয়ে হিসাব মেলাচ্ছেন। কখনো হঠাৎ সালারদের ডেকে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। সেই সালারদের একজন হলেন ঈসা এলাহকারী ফকীহ, যিনি যোগ্য সেনা অধিনায়ক হওয়ার পাশাপাশি বড় মাপের একজন আলেম এবং ইসলামী আইন বিশারদও। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে সুলতান আইউবীর ডান হাত বলে অভিহিত করেছেন।

কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ একদিন সুলতান আইউবী রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বসেন। বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশকে তিনি সুদানের সীমান্ত ঘেঁষে ছাউনি ফেলতে নির্দেশ দেন। কারণ, ওদিকে থেকেও আক্রমণ আসার সম্ভাবনা আছে। সুলতান আইউবীর জন্য সবচে' বড় আপদ হলো, তিনি যখন কোনো অভিযানে রওনা হন, তখন পেছনেও শত্রু থেকে যায়। খৃস্টানদের জন্য তিনি মিসরের সকল সৈন্য নিয়ে যেতে পারেন না। এবার যখন তিনি রওনা হন, ঐতিহাসিকদের পরিসংখ্যান মোতাবেক তখন তার সঙ্গে সৈন্য ছিলো এক হাজার পদাতিক। এরা সকলে আযাদকৃত দাস।

তবে যুদ্ধবাজ। আর ছিলো আট হাজার অশ্বারোহী, যাদের কেউ মিসরী, কেউ সেই সুদানী, যাদেরকে ১১৬৯ সালে সুলতান আইউবী বিদ্রোহের অপরাধে সেনা বাহিনী থেকে বহিষ্কার করে উর্বর জমি দান করে পুনর্বাসিত করেছিলেন। এখন তারা মিসরের অফাদার ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এই এক হাজার পদাতিক সৈন্য নিতান্তই নতুন। তারা এখনো যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ দেখেনি। তাদের প্রশিক্ষণও শেষ করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে।

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে স্বীয় ভাই আল-আদিলের কমান্ডে হাল্‌বের উপকণ্ঠে রেখে এসেছিলেন। তার অনুমান ছিলো, খৃস্টানরা এতো তাড়াতাড়ি সিরিয়া এসে পৌঁছবে না। তিনি দ্রুত রওনা হয়ে হাল্‌ব পৌঁছে যান। সেখানে পৌঁছে সংবাদ পান, খৃস্টানরা হাররান দুর্গকে অবরোধ করে রেখেছে। সুলতান অবরোধকারী খৃস্টান সৈন্যদেরকে ঘিরে ফেলেন। তাঁর এই কৌশলটা এতোই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিলো যে, খৃস্টানরা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলো না। সুলতান বহু শত্রুসেনাকে গ্রেফতার করেন এবং খৃস্টানদের অনেক ক্ষতিসাধন করেন। তিনি অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লিডিডয়া ও রামাল্লা দখল করে নেন।

এ বিজয়গুলো ছিলো অপেক্ষাকৃত সহজ। তাতে মিসর থেকে আসা নতুন সৈনিকদের মনোবল বেড়ে যায়। তারা বুঝে নেয়, যুদ্ধ এভাবেই হয়ে থাকে, যাতে বিজয় আমাদেরই হয়। নতুন সৈনিকরা অসতর্ক হয়ে ওঠে। খৃস্টানরা সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে পিছপা হয়ে সুলতান আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছিলো। তাঁরা অল্প ক'জন সৈন্যের মহড়া দিয়েছিলো মাত্র। এরা ফিরিঙ্গি। রেনাল্ট ও বল্ডউইনের বাহিনী এখনো সম্মুখে আসেনি। তারা উক্ত এলাকাতেই অবস্থান করছে। এখন খৃস্টানরা এমন শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে, সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা শত্রুর এলাকা থেকে বেরই হতে পারছে না। ত্রিপোলীর গোয়েন্দার পর ওদিক থেকে আর কেউ আসতেই পারেনি।

রামাল্লার সন্নিকটে একটি নদী আছে। পানি গভীর না হলেও নদীটা বেশ গভীর ও চওড়া। ঈসা এলাহকারী রামাল্লা জয় করে তার বাহিনীকে রামাল্লার আশপাশে ছড়িয়ে দেন। নদীর তীরের আড়াল থেকে খৃস্টান বাহিনী এমনভাবে বেরিয়ে আসে, যেনো পানির স্রোত কূলের বাইরে চলে এসেছে। আল্লাহ জানেন, এই বাহিনী কবে থেকে ওখানে লুকিয়ে বসে ছিলো। ঈসা এলাহকারীর বাহিনী অসতর্কতা হেতু মারা পড়ে। তারা

বিক্ষিপ্ত ছিলো। ফলে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। ত্রিপোলীর গোয়েন্দার রিপোর্ট নির্ভুল প্রমাণিত হলো যে, খৃস্টানরা এমন কৌশল অবলম্বন করবে, যার ফলে সুলতান আইউবীর বিশেষ রণকৌশল অকার্যকর হয়ে পড়বে।

তৎকালের এক ঐতিহাসিক ইবনে আসীর লিখেছেন– 'ফিরিঙ্গিরা নদীর দিক থেকে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেনো মানুষ আর ঘোড়ার প্লাবন কূল অতিক্রম করে বাইরে এসে জনবসতিগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান আইউবীর বাহিনী অসতর্ক অবস্থায় পুরোপুরি ঘেরাওয়ে চলে আসে।'

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জেম্‌স লিখেছেন– 'সম্রাট বল্ডউইন সালাহুদ্দীন আইউবীর আগেই তার বাহিনীকে রামাল্লার উপকণ্ঠে নিয়ে এসেছিলেন। আইউবীর বাহিনী রামাল্লা জয় করার পর বল্ডউইনের এক সালার শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। খৃস্টানদের কৌশল সফল হয়। আইউবী ঘেরাওয়ে এসে পড়েন। তাঁর বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তিনি কয়েকিট ইউনিটকে একত্রিত করে বিশেষ পদ্ধতিতে জবাবী আক্রমণ করেন। কিন্তু ময়দান খৃস্টানদের হাতেই থাকে। আইউবীর হামলা ব্যর্থ হয়। এমনকি তাঁর পক্ষে পেছনে সরে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সুলতান আইউবীর নতুন সৈনিকরা– যারা কয়েকটি স্থানে সহজে সাফল্য অর্জন করে ভেবে বসেছিলো, তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না– এমনভাবে পলায়ন করে যে, তারা মিসরের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়ে যায়। পলায়নকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি, যাদেরকে অদূরদর্শী সেনা অফিসারগণ গনীমতের প্রলোভন দেখিয়ে ভর্তি করেছিলেন। সবচে' বড় কারণ, এরা অনভিজ্ঞ। পরিশেষে সুলতান আইউবীর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তিনি একটি উটের পিঠে চড়ে রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে যান এবং নিজের জীবন রক্ষা করেন।

কাজি বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন– তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'সুলতান আইউবী আমাকে এই যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– 'খৃস্টানরা আমারই কৌশল প্রয়োগ করে আমার বাহিনীকে সেই সময় রণাঙ্গনে টেনে আনে, তখনো আমি তাদেরকে যুদ্ধের বিন্যাসে সাজাতে পারিনি। আরেক কারণ, আমার বাহিনীর উভয় পার্শ্বে যে ইউনিটগুলো ছিলো, তারা পরিকল্পনাবিহীন স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। তাদের মধ্যে কোন সাবধানতা ছিলো না। এই সুযোগে শত্রুরা তাদের

উপর আক্রমণ করে বসে। সেই আক্রমণ এতোই তীব্র ও আকস্মিক ছিলো যে, আমার নতুন যোদ্ধারা ভীত হয়ে পেছনে পালিয়ে যায় এবং মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। তারা পথ হারিয়ে ফেলে এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আমি তাদেরকে একত্রিত করতে ব্যর্থ হই। দুশমন আমার বাহিনীর বহু সৈনিকদের বন্দি করে ফেলে। তন্মধ্যে ঈশা এলাহকারীও ছিলেন।'

সুলতান আইউবী তাঁর সৈনিকদেরকে জীবনহানি ঘটানোর পরিবর্তে নির্দেশ প্রদান করেন, যার যার মতো ময়দান থেকে সরে যাও এবং কায়রো পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

খৃস্টানদেরকে ষাট হাজার দিনার পণ আদায় করে সুলতান আইউবী সালার ঈশা ইলাহকারীকে ছাড়িয়ে আনেন। এক মিসরী ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আল-ওয়াহদীদ লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী স্বীয় ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহকে এই যুদ্ধ এবং নিজের পরাজয়ের চিত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি একটি আরবী পংক্তিও লিখেছেন, যার মর্ম নিম্নরূপ–

'আমি তোমাকে এমন সময়ে স্মরণ করলাম, যখন খৃস্টানদের অস্ত্র কাজ করে চলছে। শত্রুর সরল ও গৌর বর্ণের বর্শাগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে রক্ত পান করে ফিরছে।'

যুদ্ধটা হয়েছিলো ৫৭৩ হিজরীর (১১৭৬ খৃস্টাব্দে) জুমাদাল আউয়ালে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন কায়রোতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথাটা অবনত। সঙ্গে কোনো সৈন্য নেই। নেই একজন দেহরক্ষীও।

কায়রো পৌঁছেই সুলতান আইউবী পুনরায় সেনাভর্তির নির্দেশ দেন। তিনি সিরিয়ার রণাঙ্গনে স্বীয় ভ্রাতা আল-আদিলকে এবং যোগ্যতম সালারদেরকে হামাত রেখে এসেছেন।
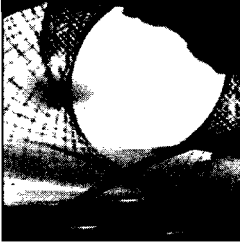
দরবেশ

রামাল্লা। আজকের ইসরাইল কবলিত এই রামাল্লায়-ই খৃস্টানদের হাতে পরাজয়বরণ করেছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দশ মাইল দূরে উত্তরে জর্ডানে অবস্থিত এই রামাল্লা। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জর্ডানের এই এলাকাটি দখল করে নিয়েছিলো। জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরে ইসরাইলী সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটা। অঞ্চলটি এখনো ইসরাইলের দখলে। তারা ঘোষণা দিয়েছে, পৃথিবীর কোন শক্তি এই অঞ্চলটি তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। রামাল্লা এবং অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলকে সেদিনও তারা বধ্যভূমি বানিয়েছিলো এবং আজো সেগুলো বধ্যভূমিই রয়ে গেছে। রামাল্লার মুসলমানরা ইসরাইলের এই অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে আর ইসরাইল তাদের রাইফেলের গুলি দ্বারা মুসলমানদের দমন করছে।

ইসরাইলের হঠকারিতা আর আরব দুনিয়ার নীরবতা-নির্জীবতা প্রমাণ করছে, ইসরাইল এই অঞ্চলটির দখল ছাড়বে না এবং ছাড়তে বাধ্য হবে না। কিন্তু আটশত বছর আগে যখন রামাল্লা খৃস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিলো, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একটি দিনের জন্যও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেননি। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক কষ্টে জীবন রক্ষা করেছিলেন। শোচনীয় পরাজয় বরণ করে তাঁর বাহিনী পিছপা হয়ে সোজা মিসরের দিকে মুখ করতে বাধ্য হয়েছিলো। বিপুলসংখ্যক সৈন্য খৃস্টানদের হাতে বন্দি হয়েছিলো। কিছু সৈন্যরা উপায়-উপকরণ ব্যতীত কায়রো যেতে গিয়ে পথেই প্রাণ হারিয়েছিলো। এরূপ পরাজয় একটি বাহিনীর মনোবল ও উদ্দীপনা ভেঙে দিয়ে থাকে। নিজেদের সামলে নিতে নিতে চলে যায় বহু সময়– বছরের পর বছর। কিন্তু সুলতান আইউবী মিসর পৌঁছে শুধু আত্মসংবরণই করেননি– অল্প কিছুদিনের মধ্যে অভাবনীয়রূপে সেই এলাকায় ফিরে যান, যেখানে তিনি পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন। তিনি ক্রুসেডারদের যম হয়ে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন।

রামাল্লা আজ আবারো সালাহুদ্দীন আইউবীর অপেক্ষা করছে।

সুলতান আইউবীর সম্মুখে কাজ শুধু এটুকুই নয় যে, পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে এবং ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে হবে। তাঁকে বহু বিপদ-শঙ্কা ও সমস্যা বেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর সারিতে বিশ্বাসঘাতকদের অভাব নেই। সুদানের দিক থেকে আক্রমণ আশঙ্কা বেড়ে গেছে। সুদানীদের জানা আছে, আইউবীর কাছে ফৌজ নেই। যে ক'জন আছে, তারা পরাজিত ও আহত। বিপরীতে ক্রুসেডারদের সৈন্য দশগুণ বেশি। রামাল্লার জয় তাদের মনোবল ও উন্মাদনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আরেকটি আশঙ্কা, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধবাদী আমীরগণ তাঁর এই পরাজয়কে কাজে লাগাতে পারে। তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর সেই বাহিনীটির জন্য আপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যাদের তিনি রণাঙ্গনে রেখে এসেছেন। সেই বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক সুলতানের ভাই আল-আদিল, যাঁর উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে।

একটি শঙ্কা খৃস্টান গোয়েন্দাদেরও। পিছপা হওয়ার সময় মিসরী সৈন্যের বেশে খৃস্টান গোয়েন্দাদেরও মিসরে ঢুকে যাওয়া সহজ ছিলো। এ সুযোগটা তারা অবশ্যই গ্রহণ করেছে। তারা মিসরে গুজব ছড়িয়ে জনগণের মনোবল ভেঙে দিতে পারে।

রামাল্লার পরাজয়ের পর আল-আদিল হামাত পর্যন্ত সরে এসেছিলেন। এই স্থানটিতেই সুলতান আইউবী তাঁর প্রতিপক্ষ মুসলিম আমীরদের পরাজিত করেছিলেন। হামাতে দুর্গও আছে। খৃস্টানরা সুলতান আইউবীকে পরাজিত করে হামাতের দিকে এগিয়ে যায়। আল-আদিল নিজেও একজন সালার এবং এখন তাঁর সঙ্গে যেসব সালার আছে, তাঁরাও দুঃসাহসী মুজাহিদ। তাঁদের দীন ও ঈমান সুলতান আইউবীরই ন্যায় পরিপক্ক। আল-আদিল স্বীয় ভাই আইউবীর শিষ্য। তাঁরই নিকট থেকে যুদ্ধকৌশল রপ্ত করেছেন। বিচক্ষণ ও দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝে ফেলেন, এমন একটি সহজ ও বিশাল জয়ের পর ক্রুসেডাররা রামাল্লায় বসে থাকবে না। তিনি পেছনে ছদ্মবেশে গোয়েন্দা রেখে দু'টি ফৌজ নিয়ে হামাত অভিমুখে রওনা হন। তিনি জেনে ফেলেছেন, সুলতান আইউবী মিসর চলে গেছেন।

আল-আদিলের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। গোয়েন্দারা তাঁকে সংবাদ প্রদান করে, খৃস্টান বাহিনী হামাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল-আদিল তাঁর বাহিনীর অবস্থা আঁচ করেন। ভালো নয়। সৈনিকদের মনোবল

ভেঙে গেছে। উট-ঘোড়ার সংখ্যাও কমে গেছে। রসদের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। তবে তিনি ফৌজকে খুবই উপযুক্ত একটি স্থানে নিয়ে এসেছেন। সবুজ পাহাড়ি এলাকা। পানি আছে। তিনি সৈনিকদেরকে এক স্থানে সমবেত করে নেন। তিনি দেখলেন, অধিকাংশ উট আহত। গুরুতর আহত উটগুলোকে জবাই করিয়ে ফৌজকে বলে দেন, পেট পুরে গোশ্ত খাও। এভাবে একটি প্রশস্ত অঞ্চলে রাতটাকে তিনি উৎসবের আমেজে ভরে দেন। তিনি সন্ধ্যায়ই হাল্ব ও দামেশ্কে দূত প্রেরণ করেন যে, যতো পারো রসদ, পশু ও অস্ত্র প্রেরণ করো।

রাতের বেলা। সৈন্যরা উটের গোশ্ত খেয়ে পরিতৃপ্ত। আল-আদিল একটি পাথরের উপর উঠে যান। তাঁর ডানে ও বাঁয়ে দু' ব্যক্তি প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিতে শুরু করেন–

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুজাহিদগণ! তোমরা এই বাস্তবতাকে মেনে নাও, আমরা পরাজিত হয়ে এসেছি। তোমরা কি এই পরাজিত অবস্থায়-ই মা-বোন, স্ত্রী-কন্যাদের নিকট ফিরে যাবে এবং বলবে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনের হাতে পরাজিত হয়ে এসেছি? তোমাদের মায়েরা কি দুধের দাবি ক্ষমা করবেন? তারা ঘরে বসে সংবাদের অপেক্ষা করছেন, আমরা প্রথম কেবলাকে কাফেরদের কব্জা থেকে মুক্ত করেছি কিনা! তারা জানে, আমাদের বে-দখল অঞ্চলগুলোতে কাফেররা মুসলিম নারীদের লাঞ্ছিত করছে। ভেবে দেখো, তোমরা তোমাদের মা-বোনদেরকে কী জবাব দেবে। তোমাদের যারা এখান থেকেই পেছনে কেটে পড়তে চাও, তারা মজলিস থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়াও। আমি তাদেরকে বাঁধা দেবো না। তাদের জন্য বাড়ি-ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।'

আল-আদিল থেমে যান। সমবেত সৈনিকরাও নীরব। একজন সৈনিকও আলাদা হলো না। প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে বসে আছে।

'সালারে আলা!'– এক সৈনিক দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে বললো– 'আমাদেরকে কী করতে হবে বলুন। আপনাকে কে বলেছে, আমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে যেতে চাই?'

'আমি যদি পিছপা হতে গিয়ে প্রাণ হারাই'– আরেক সৈনিকের উদ্দীপ্ত কণ্ঠ– 'তাহলে আমার অসিয়ত, আমার লাশ দাফন না করে শকুন-নেকড়ের জন্য ফেলে রাখবেন।'

এবার একসঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠ গর্জে ওঠে। প্রতিটি কণ্ঠেই চেতনার

জোশ। আল-আদিলের বুকটা প্রশস্ত হয়ে যায়। তিনি বললেন– 'দুশমন তোমাদের পেছনে আসছে। তোমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে, রামাল্লার জয়ই তাদের শেষ জয়। আজ রাত এবং আগামী দিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নাও। আগামী রাত পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা পাবে।'

আল-আদিল পাথরের উপর থেকে নেমে আসেন। সালার ও কমান্ডারদের তাঁবুতে ডেকে এনে নির্দেশনা প্রদান করেন।

খৃস্টানরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এটি বল্ডউইনের বাহিনী। তার জানা আছে সম্মুখে হামাতের দুর্গ এবং আল-আদিলের বাহিনী সেখানেই অবস্থান করছে। তিনি গুপ্তচর মারফত এ তথ্যও পেয়েছেন, যে বাহিনীটি হামাতের দিকে সরে গেছে, তার কমান্ডার আল-আদিল এবং আল-আদিল সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই। একজন সাধারণ সৈনিকও বুঝতে পারে, পরাজিত বাহিনী তার নিকটবর্তী দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

বল্ডউইন দ্রুত অগ্রসর হয়ে হামাতের দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। তিনি ঘোষণা দেন, দুর্গের ফটক খুলে দাও। অন্যথায় দুর্গটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। তার ধারণা, আল-আদিলের বাহিনী যুদ্ধ করার অবস্থায় নেই। কিন্তু তার ঘোষণার জবাবে দুর্গের পাঁচিলের উপর থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

বল্ডউইন পুনরায় ঘোষণা দেন, এই খুনাখুনি অনর্থক। তোমরা লড়াই করতে পারবে না। দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দাও। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, একজন বন্দির সঙ্গেও অন্যায় আচরণ করা হবে না।

'দুর্গের উপর থেকে আওয়াজ আসে–

'তোমরা এতটুকু দূরে থাকো, যে পর্যন্ত আমাদের তীর পৌঁছুতে না পারে। তোমাদের না দিয়ে বরং দুর্গটা আমরা নিজেরাই গুড়িয়ে ফেলবো। আমাদের রক্ত অনর্থক ঝরবে না। তোমরাই বরং উদ্দেশ্যহীন মৃত্যুবরণ করবে।'

ঘোষক ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থাটা দেখতে পায়। যেনো সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ চারদিক থেকে দুর্গটাকে গ্রাস করে রেখেছে। তার মোকাবেলায় দুর্গে যে সৈন্য আছে, তা না থাকারই সমান। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের কমান্ডার অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়।

সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে। খৃস্টানরা পরবর্তী কর্মসূচি ভোর পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছে। তাদের বাহিনী দ্রুতগতিতে পথ চলে এসেছে। সবাই ক্লান্ত। এটি পশ্চাদ্ধাবন। বল্ডউইন এই চেষ্টায় রত যে, তিনি আল-আদিলকে কোথাও

বিশ্রাম করার এবং বাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠিত করার সুযোগ দেবেন না। তিনি আল-আদিলকে জীবিত ধরতে চাচ্ছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই হওয়ার কারণে আল-আদিল অত্যন্ত মূল্যবান কয়েদি। তাঁর বিনিময়ে খৃস্টানরা সুলতান আইউবীর নিকট থেকে কঠিন শর্ত আদায় করে নিতে পারে। বল্ডউইনের পরিপূর্ণ আশা, তিনি দুর্গের বাহিনী ও আল-আদিলকেসহ দুর্গটা নিয়ে নিতে পারবেন।

বল্ডউইন তার বাহিনীকে দুর্গ থেকে এতোটুকু পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেছেন যে, দুর্গওয়ালাদের তীর সে পর্যন্ত পৌঁছছে না। বাইরে থেকে কোনো বাহিনী তার উপর আক্রমণ চালাতে পারে এমন আশঙ্কা তার নেই। সুলতান আইউবী এখানে নেই। নেই তাঁর কোন বাহিনীও। হামাত দুর্গটাকে নিজের পায়ের তলেই দেখতে পাচ্ছে বল্ডউইন।

সন্ধ্যার পর পর তিনি তার কমান্ডারদেরকে আগামী দিনের কর্মসূচি-পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে নিজ তাঁবুতে ফিরে যান। তাঁবুটা ফৌজ থেকে সামান্য দূরে পেছনে। সে যুগের রাজা-বাদশাহদের তাঁবু শীশমহল থেকে কম হতো না। বল্ডউইন তো বিজয়ী সম্রাট। তিন-চারটি রূপসী খৃস্টান মেয়ে তার সঙ্গে আছে। চারটি মুসলমান মেয়েও আছে। এই মেয়েগুলোকে খৃস্টান কমান্ডাররা বিজিত অঞ্চল থেকে ধরে এনে বল্ডউইনকে উপহার দিয়েছিলো। মেয়েগুলো আরবের রূপের রাণী।

খৃস্টান মেয়েরা এই মুসলিম মেয়েগুলোকে বুঝিয়েছে, তোমাদের ক্রন্দন ও মুক্তির জন্য ছটফট করা অর্থহীন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের সৌভাগ্য যে, তোমরা ক্রুশের একজন সম্রাটের ভাগে পড়েছো। তারা বুঝায়—

'শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে কোনো মুসলিম আমীর কিংবা শাসকের হেরেমে যেতেই হতো, যেখানে তোমাদেরকে কয়েদির মতো থাকতে হতো। দু'-চার বছর পর যখন তোমাদের যৌবনের আকর্ষণ কমে যেতো, তখন তোমাদেরকে কোনো সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দেয়া হতো। যদি তোমরা তোমাদেরই সৈনিকদের হাতে পড়তে, তাহলে তারাও তোমাদের সেই দশা-ই ঘটাতো, যা আমাদের সৈন্যরা ঘটাচ্ছে। নারীর কোনো ধর্ম থাকে না। যখন যার সঙ্গে বিয়ে হয়, সে-ই তার খোদা, সে-ই তার ধর্ম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তোমাদের সেই মানুষটির কাছে থাকতে আপত্তি কোথায়, যিনি রণাঙ্গনের সম্রাট, একটি রাষ্ট্রের ও কোটি মানুষের হৃদয়ের রাজা!'

মেয়েগুলো প্রথম দিনটি খুব ছটফট করে কাটায়। তাদের উপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি। কোনো ভয়-ভীতিও দেখানো হয়নি। বল্ডউইন তাদের রূপ-যৌবন দেখে তার হাই কমান্ডের সেনাপতিদের বললেন, মেয়েগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন মূল্যবান মেয়েগুলোকে ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ বানিয়ে নষ্ট করা ঠিক হবে না। তিনি মেয়েগুলোকে নিজের কাছে রেখে দেন।

'আমাদেরকে সম্ভ্রমের কুরবানী দিতেই হবে'– নির্জনে কথা বলার সুযোগ পেয়ে চার মেয়ের একজন বললো– 'আমাদের পালানো দরকার।'

'আর প্রতিশোধও নেয়া উচিত'– অন্য একজন বললো।

'তার জন্য আমাদেরকে প্রকাশ করতে হবে, আমরা আন্তরিকভাবেই তাদের দাসত্ব মেনে নিয়েছি'– প্রথম মেয়ে বললো– 'তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে।'

'আমার পিতা সুলতান আইউবীর বাহিনীতে আছেন'– অন্য একজন বললো– 'বর্তমানে মিসরে আছেন। আমি তাঁর নিকট থেকে শুনেছি, কাফেরদের মেয়েরা তাদের ধর্ম, জাতি ও ক্রুশের জন্য নিজের ইজ্জত বিলিয়ে আমাদের বড় বড় শাসকদেরকে ক্রুশের অনুগত বানায়। কাউকে হত্যা করতে হলে করায়। আমাদের ফৌজের গোপন তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সম্রাটদের নিকট পৌঁছায়।'

'আমি জানি'– অন্য এক মেয়ে বললো– 'তাদের মেয়েরা সে কাজটাই করে, যা আমাদের পুরুষ গুপ্তচররা শত্রুর দেশে গিয়ে করে থাকে।' মেয়েটি কথা বন্ধ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখে বললো– 'যদি তাদের বলে দেই, আমরা তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করবো, তাহলে এমন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে যে, আমরা এই সম্রাটকে খুন করে ফেলবো।'

'আর কিছু না হোক, অন্তত পালাবার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।' একজন বললো।

বল্ডউইন বাহিনীর হামাত দুর্গ অবরোধের রাতের দু'রাত আগের ঘটনা। সম্মুখপানে অগ্রসর হতে হতে মুসলিম মেয়েরা খৃস্টান মেয়েদের বললো, আমরা তোমাদের কথা বুঝে ফেলেছি। যে কোনো সময় আমরা ইসলাম ত্যাগ করে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করে ফেলবো।'

বিষয়টা বল্ডউইনকে অবহিত করা হলো। তিনি তাদেরকে মূল্যবান হার উপহার দিয়ে গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দেন। কিন্তু তিনি খৃস্টান মেয়েদের আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন– 'আমি এদের কারো হাতে কিছু পানাহার

করবো না। হতে পারে, এটা তাদের কৌশল। মুখের কথায় ধর্ম ত্যাগ-গ্রহণের ঘোষণা দিলেই তো হয়ে যায় না। মনের পরিবর্তন সহজ নয়। তোমরা তাদের মন জয় করার চেষ্টা করো। মুসলমানদের ক্রয় করা কঠিন নয়। তবে তাদের উপর ভরসা রাখাও অনিরাপদ। যেসব মুসলমানের ঈমান পাকা, তারা এমন এমন ত্যাগ দিয়ে বসে, আমরা যার কল্পনাও করতে পারি না। এই মেয়েগুলো পালাতে পারবে না। তবে চোখ রাখবে, যেনো এরা আমার উপর আক্রমণ না করে বসে।

অবরোধের প্রথম রাত। চার মেয়ে আলাদা আলাদা কক্ষে ঘুমিয়ে আছে। বল্ডউইনও তাদের নিয়ে ফূর্তি করার পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছোট-বড় সকল কমান্ডার অচেতনের ঘুম ঘুমাচ্ছে। সৈন্যদেরও কোনো চৈতন্য নেই। জেগে আছে শুধু সান্ত্রীরা আর বল্ডউইনের দেহরক্ষীদের চার-পাঁচজন সৈনিক। হামাতের একটি উপত্যকা চলে গেছে দুর্গের দিকে। সম্মুখে দুর্গ পর্যন্ত খোলা মাঠ। এই উপত্যকায় অন্তত এক হাজার পদাতিক সৈন্য পা টিপে টিপে হাঁটছে। কমান্ডার তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে। বল্ডউইনের বাহিনীর তাঁবু এখন সামান্য দূরে।

এই পদাতিক বাহিনী আল-আদিলের সৈনিক। আল-আদিল দুর্গে নেই। তাঁর অনুমান ছিলো, খৃস্টানরা দুর্গ অবরোধ করবে। তাই তিনি তাঁর সবক'টি ইউনিটকে বলে রাখেন, অবরোধ হলে ভয় পাবে না। আল-আদিল দুর্গপতিকে পরিকল্পনা জানিয়ে রাখেন। সে কারণেই দুর্গপতি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তীর বৃষ্টির মাধ্যমে ক্রুসেডারদের হুংকারের যথার্থ জবাব প্রদান করেছেন। দুর্গপতি হলেন আল-আদিলের মামা শিহাব উদ্দীন আল হারেমী।

রাতে আল-আদিলের এক হাজার পদাতিক সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে গেরিলা আক্রমণ চালায়। তারা সর্বপ্রথম তাঁবুগুলোর রশি কেটে ফেলে এবং উপর থেকে খৃস্টানদেরকে বর্শার আঘাতে ঝাঁঝরা করতে শুরু করে। তাঁবুর তলে আটকেপড়া সৈনিকরা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়।

এটা স্থির হয়ে লড়াই করার যুদ্ধ নয়। এটা সুলতান আইউবীর 'আঘাত করো আর পালাও' ধরনের বিশেষ রণকৌশল। এতো বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে এক হাজার সৈনিকের স্থির হয়ে যুদ্ধ করা সম্ভবও নয়। বিভক্ত ক্ষুদ্র

দলগুলোর দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। দু'-তিনটি দল ক্রুসেডারদের উট-ঘোড়া ও খচ্চরের বাঁধন খুলে দেয়। এক হাজার সৈনিক চুপিচুপি আসে আর পলকের মধ্যে ডানে-বাঁয়ে বেরিয়ে যায়। খৃস্টান বাহিনীর মধ্যে শোরগোল ও আর্তচীৎকার শুরু হয়ে যায় যে, আসমান-যমিন এক সঙ্গে কেঁপে ওঠে।

বল্ডউইনের চোখ খুলে যায়। তার কমান্ডারগণও জেগে ওঠে। তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখতে পান, কোথাও আগুন জ্বলছে। আল-আদিলের সৈনিকরা তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আক্রমণের সময় তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েছিলো। এই ধ্বনি মুসলমান মেয়েগুলোও শুনেছিলো। তারা বুঝে ফেলে, এই আক্রমণ মুসলিম সৈন্যদের। এক মেয়ে বলে ওঠে, চলো পালাই। কিন্তু দু'টি মেয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে বল্ডউইনকে খুন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হলো। বল্ডউইনের দেহরক্ষীরা তার চতুর্পার্শ্বে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে যায়।

হঠাৎ পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করে– প্রচন্ড কম্পন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি কানে আসতে শুরু করে। এরা আল-আদিলের অশ্বারোহী সৈনিক। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে তাদের সংখ্যা ছিলো দু'হাজার। ইউরোপিয়নদের মতে চার হাজারের অধিক। ধেয়ে এসে এই অশ্বারোহীরা সবদিক ছড়িয়ে গিয়ে এমন তীব্র আক্রমণ করে বসে যে, মুহূর্ত মধ্যে প্রলয় ঘটে যায়। রক্তের বন্যা বইতে শুরু করে। খৃস্টান সৈনিকরা মোকাবেলার অবস্থায় ছিলো না। এখনো তারা বুঝেই ওঠতে পারেনি যে, হচ্ছেটা কী এবং আক্রমণগুলো কোথা থেকে আসছে। তাকবীর ধ্বনি থেকে প্রমাণ মিলছে, তারা মুসলমান। আল-আদিলের আরোহী সৈন্যরা খৃস্টানদের অবরোধ ভেঙে যে-ই মোকাবেলায় আসে, তাকেই ঘোড়ার পদতলে দলিত করে কিংবা তরবারী ও বর্শার নিশানা বানিয়ে দুর্গের দিকে বেরিয়ে যায়। কমান্ডারদের আহ্বানে তারা পেছন দিকে মোড় ঘুরিয়ে আবার ঘোড়া হাঁকায়। তারা পুনরায় ছুটে গিয়ে খৃস্টানদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায়।

দুর্গের অপর দিকে যে খৃস্টান বাহিনী ছিলো, তাদের উপর আক্রমণ হয়নি। এদিককার হৈ-হুল্লোড়, আর্ত চীৎকার আর ঘোড়ার আকাশকাঁপানো হ্রেষারবে তাদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এদিককার খৃস্টান সৈন্যরা ওদিকে পালিয়ে যায়। তাদের হাজার হাজার উট-ঘোড়া ও খচ্চরের রশি খুলে দেয়া হয়েছিলো। তারা এলোপাতাড়ি ছুটতে গিয়ে সৈনিকদের পিষে

মারতে এবং আতঙ্কিত করতে শুরু করে। বল্ডউইন বাহিনীর এই অংশটা পালাতে উদ্যত হয়।

ওদিকে মুসলিম মেয়ে চারটি নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাদের একজন মুসলিম সৈনিকদের সংবাদ দেয়ার চেষ্টা করছে যে, বল্ডউইন এখানে আছেন। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা সবাই অশ্বারোহী এবং অবিরাম ছুটে চলছে। তারা খৃস্টান বাহিনী থেকে দূরে চলে গেছে। মেয়েটি দু'-তিনজন অশ্বারোহীর পেছনে পেছনে চীৎকার করে ছুটেছে। কিন্তু হট্টগোল এতো বেশি যে, তার চীৎকার কারো কানে পৌছেনি। কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়নি। মেয়েটি পেছনে অনেক দূরে চলে গেছে।

হঠাৎ এক অশ্বারোহী মেয়েটিকে দেখে ঘোড়া থামায়। মেয়েটি তাকে কম্পিত কণ্ঠে বললো, আমি মুসলমান। আমরা তিনটি মেয়ে খৃস্টান সম্রাটের কব্জায় আছি।

বল্ডউইনের তাঁবু– যেটি তার সামরিক হেডকোয়ার্টারও –ফৌজ থেকে আলাদা এবং দূরে। মেয়েটির ডাকে যে সৈনিক ঘোড়া থামিয়েছে, তিনি একজন কমান্ডার। তিনি মেয়েটিকে নিজের ঘোড়ার পিঠে পেছনে বসিয়ে নিয়ে যান।

আল-আদিলের এক সালার মেয়েটির পুরো কাহিনী শোনেন। মেয়েটি বল্ডউইনের হেডকোর্টারের ঠিকানা বলে। সালার সেখানে গেরিলা আক্রমণ এবং বল্ডউইনকে ধরার জন্য দু'টি সেনাদল প্রস্তুত করেন এবং নিজে তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি বল্ডউইনের তাঁবুটা ঘিরে ফেলেন। সালার বল্ডউইনকে হুংকার দেন। তাঁবুতে অগ্নিসংযোগের হুমকি প্রদান করেন। কিন্তু বল্ডউইন তাঁবুতে নেই। নেই তার দেহরক্ষীরাও। যারা অস্ত্র সমর্পণ করে সম্মুখে এগিয়ে আসে, তারা চাকর, কয়েকটি খৃস্টান ও তিন মুসলিম মেয়ে এবং কয়েকজন সাধারণ সৈনিক। তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। বল্ডউইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। কিন্তু কেউ বলতে পারলো না, লোকটা কোথায় আছেন।

বেগতিক অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বল্ডউইন সম্মুখে চলে গেছেন। দীর্ঘক্ষণ পর তিনি জেনে ফেলেছেন, এটা মুসলিম বাহিনীর গেরিলা আক্রমণ–পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনি নিজ তাঁবু অভিমুখে ফেরত রওনা হন। সঙ্গে দেহরক্ষী আছে। তাঁবু এলাকা থেকে বেশ দূরে থাকতেই একদিক থেকে একটি ঘোড়া ছুটে এসে তার সম্মুখে

দাঁড়িয়ে গিয়েই বললো, আপনি অন্য কোথাও চলে যান। আপনার তাঁবুতে মুসলিম সৈন্যরা হানা দিয়েছে।

বল্ডউইন সেখান থেকেই ঘোড়ার গতি ফিরিয়ে দেন।

আল-আদিল সারা রাত 'আঘাত হানো আর পালিয়ে যাও' নীতিতে অভিযান অব্যাহত রাখেন। রাত পোহাবার পর দেখা গেলো হামাতের দুর্গের চতুর্পার্শ্বে খৃস্টানদের লাশ ছড়িয়ে আছে। আহতরা কাতরাচ্ছে। আল-আদিলের শহীদদের লাশও আছে। খচ্চর-ঘোড়া ও উট দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। এখানকার কোথাও না বল্ডউইন আছে, না তার জীবিত সৈন্যরা। খৃস্টানরা তাদের রসদও ফেলে গেছে। আল-আদিল তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন, দুশমনের ফেলে যাওয়া সম্পদগুলো জড়ো করো এবং তাদের পশুগুলোকেও ধরে আনো।

আল-আদিলের এই আক্রমণ বীরত্ব, জযবা ও যুদ্ধবিদ্যার বিচারে প্রশংসনীয় অভিযান ছিলো। কিন্তু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারেননি। প্রয়োজন ছিলো, দিশেহারা অবস্থায় পলায়নপর খৃস্টানদের ধাওয়া করে তাদের সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া। তারপর সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সেই অঞ্চলে ঢুকে যাওয়া, যেটি খৃস্টানরা জয় করে নিয়েছিলো। যতো বেশি সম্ভব শত্রুসেনাদের বন্দি করাও আবশ্যক ছিলো, যাদেরকে নিজেদের বন্দিদের মুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু সফল গেরিলা আক্রমণ থেকে বড় কোনো সফলতা অর্জন করা আল-আদিলের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ, তাঁর সৈন্য ছিলো কম। ধাওয়া করার শক্তি তাঁর ছিলো না। গেরিলা ও কমান্ডো হামলা চালিয়ে দুশমনকে অস্থির ও আধমরা করা যায়। পরাজিত করে ভূ-খন্ড দখল করতে হলে পরিপূর্ণ সামরিক শক্তির প্রয়োজন। আল-আদিল প্রথম কাজটি সাফল্যের সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছেন বটে; কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য কোন সামর্থ তাঁর ছিলো না।

আল-আদিল একটি সাফল্য এই অর্জন করেছেন যে, রামাল্লার পরাজয় তাঁর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের উপর যে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলো, সেটি দূর হয়ে গেছে এবং সৈনিকদের জয্বা ও মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠেছে। তাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে গেছে, খৃস্টানরা তাদের চে' শক্তিশালী নয় এবং যে কোনো ময়দানে তারা খৃস্টানদের পরাজিত করতে সক্ষম। প্রয়োজন শুধু সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই সাফল্যও অর্জিত হয়ে গেছে যে, তারা হামাতের

দুর্গটাকে রক্ষা করেছে। অন্যথায় খৃস্টানরা একটি দুর্গও পেয়ে গিয়েছিলো।

আল-আদিল নিজ হেডকোয়ার্টারে বসে আক্ষেপ করছেন। সালারদের আবেগ তাঁর চেয়েও বেশি উত্তেজিত। যদি পর্যাপ্ত সৈন্য থাকতো, তাহলে এ কমান্ডো অভিযানের পর অনেক বড় সাফল্য অর্জন করা যেতো এবং বল্ডউইন তার সৈনিকদেরকে জীবিত নিয়ে যেতে পারতো না।

আল-আদিল স্বীয় বড় ভাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নামে পত্র লিখেন–

'শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এবং মিসর-সিরিয়ার সুলতান! আল্লাহ আপনাকে সালতানাতে ইসলামিয়ার মর্যাদার খাতিরে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমি এই আশায় পত্র লিখছি যে, আপনি সুস্থ্য শরীরে নিরাপদে কায়রো পৌঁছে গেছেন। একবার সংবাদ পেয়েছিলাম, আপনি শহীদ হয়ে গেছেন। তারপর খবর এলো, আহত হয়েছেন। আমি ও আমার সালারগণ চিন্তা ও পেরেশানীতে আছি। আপনি বুদ্ধির কাজ করেছেন যে, রাস্তা থেকেই দূত প্রেরণ করে আমাদের অবহিত করেছেন, আপনি নিরাপদ আছেন এবং কায়রো যাচ্ছেন। আমি আশা করছি, আপনি রামাল্লার পরাজয়ে ভেঙে পড়েননি। আমরা ইনশাআল্লাহ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো, হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করবো এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অতিক্রম করে সম্মুখেও এগিয়ে যাবো।'

আপনি রামাল্লার পরাজয়ের কারণ নিয়ে চিন্তা করছেন। আমি এর দায় ফৌজের উপর চাঁপাবো না। আমাদের ভাইয়েরাই আমাদেরকে সেইদিন পরাজয়ের পথে নিক্ষেপ করেছে, যেদিন তারা আমাদের বিপক্ষে সারিবদ্ধ হয়েছিলো। দুই ভাই যখন আপসে যুদ্ধ করে, তখন তাদের শত্রুরা সহমর্মিতার আড়ালে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। রাজত্বের নেশা আমাদের ভাইদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। সালতানাতে ইসলামিয়ার যে সম্পদ ছিলো, গৃহযুদ্ধে সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বাহিনীর ভালো ভালো অভিজ্ঞ সৈন্যগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের ফৌজ আর আমরা একই খেলাফতের সৈনিক ছিলাম। কিন্তু তাদের সেই ফৌজ শুধু এ কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কতিপয় লোক সিংহাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো। যে জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে সিংহাসনের লোভ সৃষ্টি হবে, সেই জাতিকে তারা দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করে আপসে যুদ্ধ করাবে। আমাদেরকে এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে, যেনো জাতি বিভেদ-বৈষম্যের শিকার না হয়। আমাদের

সিংহভাগ সৈন্য গৃহযুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছে। নতুন ভর্তি দ্বারা আমরা সেই অভাব পূরণ করেছি এবং পরাজয়বরণ করেছি। রণাঙ্গন থেকে বিশৃংখলভাবে পলায়নকারী সব সৈন্যই নতুন ছিলো।'

'রামাল্লার পরাজয়ের পরপরই আমি এবং আমার সালারগণ প্রমাণ করে দিয়েছি, আমাদের ফৌজ পরাজিত হয়নি। আমার নিকট সেই পদাতিক ও অশ্বারোহী যোদ্ধারাই ছিলো, আপনি যাদেরকে আমার কমান্ডে রেখে গিয়েছিলেন। আপনি আমাকে রিজার্ভ রেখেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এতো দ্রুত পাল্টে যায় যে, আপনার কোনো নির্দেশ আমার কাছে এসে পৌঁছেনি। আমি এ-ও জানতে পারিনি, সম্মুখে কী হচ্ছে। আর আমি আপনাকে কি-ইবা সাহায্য করতে পারতাম। পেছনে সরে আসা এক কমান্ডার– যে ডান পার্শ্বে ছিলো– আমাকে উদ্বেগজনক সংবাদ জানালো এবং পরামর্শ দিলো, আমি যেনো আমার বাহিনীকে ব্যবহার না করি এবং আক্রমণ করে ভুল না করি। আমি আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি আমার বাহিনীকে হামাত অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করি।'

'আমার বাহিনীর মনোবল ভেঙে গিয়েছিলো। আমি দু'আ করতে থাকি, যেনো দুশমন আমার সামনে এসে পড়ে আর আমি আমার সৈনিকদের চেতনায় জীবন ফিরিয়ে আনতে পারি। আমি পেছনে লোক রেখে এসেছিলাম। হামাতের পার্বত্য অঞ্চলের সংবাদদাতারা আমাকে মূল্যবান সংবাদ জানালো, বল্ডউইন আমার পশ্চাদ্ধাবনে আসছে। আমি দুর্গে আছি মনে করে তিনি তার পুরো বাহিনীকে হামাতের দুর্গ অবরোধের জন্য নিয়ে আসেন। কিন্তু আমি আপনারই কৌশল মোতাবেক পাহাড়ের অভ্যন্তরে সৈন্যদের লুকিয়ে রাখি এবং দুর্গপতিকে আমার পরিকল্পনা ও পরিস্থিতি অবহিত করে রাখি। আল্লাহ আমার আশা পূর্ণ করেছেন। আমার সৈন্যরা বল্ডউইনের বাহিনীর উপর– যাদের সংখ্যা আমার চেয়ে দশগুণ বেশি– অত্যন্ত বীরোচিত ও সফল কমান্ডো আক্রমণ চালায়। এটি আপনার সেই বাহিনীর কমান্ডো অভিযান, যাদের সম্পর্কে ইতিহাস বলবে, এরা পরাজিত হয়েছিলো। আমি মনে করি, এই কমান্ডো অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলতে না পারে, পরাজয়ের পর জাতি মরে যায়।'

'পরদিন রাত পোহাবার পর আমরা যে দৃশ্যটা দেখলাম, যদি আপনি

দেখতেন, তাহলে রামাল্লার পরাজয়ের সব বেদনা ভুলে যেতেন। আমার আফসোস, বল্ডউইন আমার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি তাকে ধরতে পারিনি। এই মুহূর্তে আমি একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাতেব দ্বারা পত্র লেখাচ্ছি। ঐ যে আমি হামাতের দুর্গটা দেখতে পাচ্ছি। তার উপর মিসর ও সিরিয়ার পতাকা উড়ছে। দুর্গের চতুর্পার্শ্বে খৃস্টানদের লাশ ছাড়া আর যা দেখা যাচ্ছে, তাহলো হাজার হাজার শকুন, যারা লাশগুলো খাবলে খাচ্ছে। আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনের দল নামছে। কোনো কোনো স্থান থেকে ধোঁয়া উঠছে। এই আগুন গত রাতে আমার গেরিলারা লাগিয়েছিলো। বল্ডউইনের জীবিত সৈন্যরা যেরূপ বিক্ষিপ্ত ও জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পলায়ন করেছে, তাতে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সে পাল্টা আক্রমণ করতে পারবে না। তথাপি আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি।'

'বর্তমানে আমার হাতে যে পরিমাণ সৈন্য আছে, যদি আরো এ পরিমাণ সৈন্য থাকতো, তাহলে আমি খৃস্টানদের ধাওয়া করতাম এবং পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করে দিতাম। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার সালার, কমান্ডার ও সকল সৈন্যের যুদ্ধের জয্বা চাঙ্গা হয়ে গেছে। আমি জানি, আপনি আরামে বসে নেই। মিসর পৌঁছেই আপনি নতুন ভর্তি ও নববিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি শান্তমনে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমি গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রাখবো। আমি দুশমনকে কোথাও সুস্থির বসতে দেবো না। এই প্রক্রিয়ায় আমি কোনো অঞ্চলের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না বটে; কিন্তু আপনি প্রস্তুতির সময় পেয়ে যাবেন। আমি দামেশ্‌কে ভাই শামসুদ্দৌলাকে বার্তা প্রেরণ করেছি, যেনো তিনি আমার জন্য কয়েক ইউনিট সৈন্য ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রেরণ করেন। হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহকে পত্র দিয়েছি, যেনো তিনি চুক্তি মোতাবেক আমাকে সাহায্য দেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ও আমার সালারগণ আপনার কুশল ও তৎপরতা সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।'

–ইতি আল-আদিল।

লেখা শেষ হওয়ার পর আল-আদিল পত্রখানা পাঠ করিয়ে শোনেন। তারপর তাতে স্বাক্ষর করে দূতের হাতে দিয়ে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন।

❖ ❖ ❖

কায়রোর আকাশে হতাশার কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখন কায়রো। নগরে-প্রত্যন্ত অঞ্চলে সকলের মুখে একটি-ই শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে– পরাজয়, পরাজয়, পরাজয়। সংশয়-সন্দেহও দিন দিন বেড়ে চলছে। পরাজয়ের মতো দুর্ঘটনা এবং অজ্ঞাত-কারণ ঘটনাবলি এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করে, যার থেকে গুজব জন্ম নিয়ে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়ে গেছে কায়রোতে এবং তার আশপাশের অঞ্চলসমূহে, যেখানে শত্রুর নাশকতা কর্মী এবং গুপ্তচরও আছে, যারা ইউরোপের বাসিন্দা– মিসরেরই মুসলমান অধিবাসী। তারা খৃস্টানদের বেতনভোগি হয়ে কাজ করছে। তাদের দায়িত্ব, প্রচার করে বেড়ানো যে, খৃস্টানদের এতোবেশি সামরিক শক্তি আছে, যার সম্মুখে পৃথিবীর কোনো শক্তির দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। সুলতান আইউবীর পরাজিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়ে যায় যে, এরা অথর্ব ও বিলাসী বাহিনী। যেখানে যায় লুট করে ফিরে এবং হাতে পেলেই মেয়েদের সম্ভ্রমহানী ঘটাতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুলতান আইউবীর সামরিক যোগ্যতার বিরুদ্ধেও প্রচারণা শুরু হয়ে যায়।

একজন মানুষ যতো বেশি সরল হয়, গুজব ও আবেগময় বক্তব্য দ্বারা সে ততোবেশি প্রভাবিত হয়। সর্বত্র আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এই কাজটা বেশি করছে নতুন ভর্তি হওয়া সৈন্যরা। আর সাধারণ মানুষ এই অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠছে। আল-আদিল ঠিকই লিখেছেন, রাজত্বের লোভী মুসলিম আমীরগণ নিজেদেরকে এবং সুলতান আইউবীর বাহিনীকে যদি গৃহযদ্ধে জড়িয়ে ধ্বংস না করতো, তাহলে নতুন সৈনিকদের দ্বারা যুদ্ধ করাবার ঝুঁকি মাথায় নিতে হতো না। একটি ভুল ভর্তিসংশ্লিষ্ট কতিপয় কর্মকর্তাও করেছিলেন যে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গনীমতের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। অথচ, প্রয়োজন ছিলো জিহাদের ফযীলত, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মানুষকে সেনা বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং একথা জানানো যে, তাদের শত্রু কারা, তাদের প্রকৃতি ও লক্ষ্য কী?

রামাল্লায় পরাজয়বরণ করে ফিরে আসা এই সৈন্যরা একাকি কিংবা দু'-দু'জন, চার-চারজনের ছোট ছোট দলে মিসরের সীমানায় প্রবেশ করছিলো। কেউ পায়ে হেঁটে কেউবা উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। কোনো সৈনিক যখন লোকালয়ে প্রবেশ করছে, জনতা তাকে ঘরে নিয়ে পানাহার

করাচ্ছে এবং যুদ্ধের কাহিনী জিজ্ঞাসা করছে। নতুন ও অনভিজ্ঞ বলে তারা পরাজয়ের গ্লানি দূর করার লক্ষ্যে কমান্ডারদেরকে অযোগ্য ও বিলাসী আখ্যায়িত করছে এবং খৃস্টান বাহিনীর শক্তির বর্ণনা দিচ্ছে। কারো কারো কথায় প্রমাণিত হচ্ছিলো, খৃস্টানদের কাছে অলৌকিক এমন কোন শক্তি আছে, যার ফলে তারা যেখানেই যাচ্ছে বিজয় ছিনিয়ে আনছে।

দু'-তিনজন ঐতিহাসিক– যাদের মধ্যে আরনল্ড অন্যতম– লিখেছেন, খৃস্টানরা একটি গোপন অস্ত্র নিয়ে এসেছিলো এবং সেটিই তাদের বিজয়ের কারণ হয়েছিলো। সেই গোপন অস্ত্রটা কী, ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের রোজনামচায় এরূপ কোনো অস্ত্রের উল্লেখ নেই। তৎকালের কাহিনীকারগণও এই 'গোপন অস্ত্র' সম্পর্কে নীরব। সম্ভবত অস্ত্রটি হলো খৃস্টানদের প্রোপাগান্ডার অস্ত্র, যাকে মিসর ও অন্যান মুসলিম অঞ্চলে খৃস্টানদের আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো। বোধ হয় এই প্রোপাগান্ডা কৌশলকেই ঐতিহাসিকরা 'অস্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

এই গোপন অস্ত্র আসলে প্রোপাগান্ডাই ছিলো। তার উদ্দেশ্য ছিলো চারটি। প্রথমত, জানগণের চোখে সেনা বাহিনীকে অপদস্ত করা, যাতে সুলতান আইউবীর ফৌজ জনগণের সহযোগিতা ও নতুন ভর্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মনে খৃস্টানদের ভীতি সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, সুলতান আইউবীর প্রতি দেশবাসীর আস্থা নষ্ট করা। চতুর্থত, আরো কিছু লোক রাজত্বের দাবিদার হয়ে যাবে এবং পুনর্বার গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া যাবে।

সুলতার আইউবী দুশমনের এই অস্ত্র সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। তাই কায়রো পৌঁছেই তিনি গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান, নগর প্রধান গিয়াস বিলবীস ও তাদের নায়েবদেরকে ডেকে বলে দেন, দুশমনের এই গোপন তৎপরতা প্রতিরোধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এবং আমাদের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে জোরদারভাবে কাজে লাগিয়ে দিন।

কিন্তু জনগণ জানতে চায় এই পরাজয়ের কারণগুলো কী, এর জন্য দায়ী কে?

❖ ❖ ❖

রামাল্লা থেকে কায়রোর দূরত্ব অনেক দীর্ঘ এবং সফর অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক। পথে পাহাড়ি এলাকাও আছে, বালির টিলা এবং মরুভূমিও

আছে, যে ভূমি পথভোলা পথিকের রক্ত চুষে খেয়ে থাকে। রামাল্লায় পরাজিত হয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া সুলতান আইউবীর সৈনিকগণ এই দীর্ঘ ও বিপজ্জনক পথেই যাত্রা শুরু করে। তাদের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য ছিলো ভয়ংকর। যারা মরুভূমির সফরে অভ্যস্ত ছিলো না, তারা কোথাও পড়ে গেলে আর উঠতে পারতো না। মৃতদের লাশ মাত্র একদিন নিরাপদ থাকতো। একদিন পরই মরু শিয়াল আর নেকড়েরা তাদের হাড়-মাংস ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো। দলবদ্ধভাবে চলা সৈনিকরা এই পরিণতি থেকে রক্ষা পেতো। যারা উট-ঘোড়া ও খচ্চরে আরোহণ করে চলতো, তাদের জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি ছিলো।

এমনই একটি ক্ষুদ্র দল পথ চলছে। তারা উট ও ঘোড়ার আরোহী। পথে পথে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া নিঃসঙ্গ সঙ্গীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এক পর্যায়ে দলটি ত্রিশ-চল্লিশজনের বড়সড় একটি কাফেলায় পরিণত হয়ে যায়। তারা সেই ভয়ানক মরুদ্যান দিয়ে পথ চলছে, যাকে বর্তমানে সিনাই মরুভূমি বলা হয়। দলবদ্ধতার কারণে তাদের মনোবল অটুট। কিন্তু দিগন্ত পর্যন্ত পানির চিহ্ন চোখে পড়ছে না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত রণাঙ্গন ত্যাগ করে আসা এক একজম, দু'দু'জন এবং তিন তিনজন সৈনিক পা টেনে টেনে হাঁটছে। তারা একে অন্যের কোনোই সাহায্য করতে পারছে না। শুধু এতোটুকু পারছে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার কোনো একজন সঙ্গী তাকে বালিতে পুতে রাখছে।

আরোহীদের এই কাফেলাটি এগিয়ে চলছে। এখন সম্মুখে আছে দেয়াল, খুটি এবং গৃহের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা মাটির উঁচু-নীচু টিলা। এক সৈনিক একটি টিলার উপর একজন মানুষের মাথা ও কাঁধ দেখতে পায়। কিন্তু পরক্ষণেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সৈনিক তার সঙ্গীদের বললো, ও পর্যন্ত গিয়ে নেমে যাবো। ওখানে অন্য কিছু আছে। ক্ষুৎ-পিপাসা ও ক্লান্তিতে কাফেলার অধিকাংশ সদস্যেরই দিশেহারা অবস্থা। এতোক্ষণ তারা যুদ্ধের আলোচনা করে চলছিলো। কিন্ত এখন আর কারো মুখ থেকে কথা সরছে না। তাদের পশুগুলোর মধ্যে এখনো প্রাণ আছে। তারা ভালোভাবেই হাঁটছে।

এক মাইল দূরের টিলা শত ক্রোশের দূরত্বে পরিণত হয়ে যায়। কাফেলা সেখানে পৌঁছে যায় এবং দু'টি টিলার মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সকলে বাহনের পিঠ থেকে অবতরণ করে। পশুগুলোকে ছায়ায় ছেড়ে দিয়ে

নিজেরা একটি উঁচু টিলার নীচে বসে পড়ে।

লোকগুলো বসে সবেমাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ একটি টিলার আড়াল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে তাদের সম্মুখে এসে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে যায়। লোকটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা পোশাকে আবৃত। পোশাকটি কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত চোগা। মুখে কালো দাড়ি। নিপুণভাবে ছাটা খাটো দাড়ি। হাতে একটি লাঠি, যে লাঠি সাধারণত আলিম, বুযুর্গ-দরবেশ ও খতীবদের হাতে থাকে। লোকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাফেলার লোকজনও একদম নীরব। খানিক পর একজন ক্ষীণ কণ্ঠে মন্তব্য করে– 'হযরত খিজির বোধ হয়'।

'ইনি এই পৃথিবীর মানুষ নন'– আরেকজন ফিস্ ফিস্ করে বললো।

কাফেলার লোকদের মনে ভয় ধরে যায়। তারা এমনিতেই সন্ত্রস্ত। এই রহস্যময় লোকটি তাদের ভীতি বাড়িয়ে তুলেছে। 'আপনি কে?' জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। এই নিঠুর মরু অঞ্চলে এ প্রকৃতির কোনো মানুষের উপস্থিতি বিস্ময়করই বটে। সৈনিক হলে ভয়ের কিছু ছিলো না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটি মেয়ে তার এক পার্শ্বে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যায়, যেনো মেয়েটি তার দেহের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরক্ষণে আরো একটি মেয়ে একইভাবে তার অপর পার্শ্বে আত্মপ্রকাশ করে। নিতান্ত বিস্ময়কর ও অলৌকিক ব্যাপারই বটে; কাফেলার ভীতি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মেয়ে দু'টো আপাদমস্তক পোশাকাবৃত। চোখের উপর জালের ন্যায় পাতলা কাপড়। হাতগুলোও বোরকাসম চাদরে ঢাকা।

'তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক'– দরবেশ মুখ খোলে– 'আমি কি আরো এগিয়ে এসে তোমাদেরকে আমার পরিচয় বলবো?'

সকলে পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর সেই লোকটি ও মেয়ে দু'টোকে নিরীক্ষা করে দেখে। একজন ভয়জড়িত কণ্ঠে বললো– 'আপনি আমাদের নিকটে এসে বলুন আপনি কে এবং আমাদের জন্য আপনার কী নির্দেশ। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করবো।'

লোকটি এমনভাবে হেঁটে তাদের নিকটে চলে আসে, যে হাঁটা মানুষ হাঁটে না। লোকটির চলন ও ভাবভঙ্গিতে গাম্ভীর্য ও প্রভাব বিদ্যমান। মেয়ে দু'টোও তার পেছনে পেছনে এগিয়ে আসে। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কাফেলার সকলে দাঁড়িয়ে যায়। তারা সন্ত্রস্ত। লোকটি টিলাটা পেছনে করে বসে পড়ে। মেয়েরাও দু'পার্শ্বে বসে যায়। জালের মধ্যদিয়ে তাদের চক্ষু

দেখা যাচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে, খুবই রূপসী মেয়ে। কিন্তু তাদের চোখে চোখ রাখার সাহস কারো হচ্ছে না। লোকটির এবং মেয়ে দু'টোর পোশাক ধুলামলিন। বোঝা গেলো, তারাও সফরে আছে।

'আমিও সেখান থেকে এসেছি, যেখান থেকে তোমরা এসেছো'— দরবেশ মিসরের পালিয়ে আসা সৈনিকদের বললো— 'পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তোমরা যেখানে যাচ্ছো, সেটি তোমাদের আবাস আর আমার আবাস সেটি ছিলো, যেখান থেকে আমি এসেছি।'

লোকটির কণ্ঠে হতাশা।

'আমরা কীভাবে বিশ্বাস করবো, আপনি মানুষ?'— এক সৈনিক জিজ্ঞাসা করে— 'আমরা তো আপনাকে আকাশের প্রাণী মনে করছি?'

'আমি মানুষ'— লোকটি উত্তর দেয়— 'আর এরা দু'জন আমার কন্যা। আমিও তোমাদের ন্যায় রামাল্লা থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার মুরশিদ যদি আমার প্রতি দয়া না করতেন, তাহলে খৃস্টানরা আমাকে হত্যা করে ফেলতো এবং আমার মেয়ে দু'টোকে ছিনিয়ে নিতো। এ আমার মুরশিদের মাজারের বরকত। আমি রামাল্লার বাসিন্দা। শৈশব থেকেই আমার ধর্মজ্ঞান অর্জনের আকাঙ্খা ছিলো। আমি বহু মসজিদের ইমামের অনেক খেদমত করেছি এবং তাদের থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছি। আল্লাহ তাঁর রাসূলের ধর্মের অনুসারীদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করে থাকেন। এক রাতে আমি স্বপ্নে নির্দেশ পাই, তুমি বাগদাদ চলে যাও এবং সেখানকার খতীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করো।'

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে কিছুই ছিলো না। পায়ে হেঁটে রওনা হই। পিতা-মাতা নিতান্ত গরীব ছিলেন। সঙ্গে পানি রাখার জন্য একটি মশকও ছিলো না। ইল্‌মের পিপাসা এই সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। রওনার সময় সকলে মন্তব্য করলো, ছেলেটা পথেই মরে যাবে। বাবা-মা খুব কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু আমি তারপরও বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর এই আশায় কোথাও পড়ে থাকতাম যে, এখানেই মরে বাঁচবো। কিন্তু চোখ খুলে দেখতাম, পার্শ্বে পানির একটি পাত্র ও কিছু খাবার পড়ে আছে। প্রথমবার খুব ভয় পেয়েছিলাম। প্রথমে বিষয়টা জিন-পরীদের কারসাজি মনে করেছিলাম। কিন্তু রাতে স্বপ্নে ইঙ্গিত পেলাম, এটা কোনো এক মুরশিদের কারামত।

আমি জানতে পারলাম না, এই মুরশিদ কে এবং কোথায় আছেন। আমি পানাহার করে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জাগ্রত হয়ে দেখি, পানির পেয়ালাও নেই, খাবারের পাত্রও নেই।

বাগদাদ পৌঁছতে পৌঁছতে দু'টি নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে। সফর অনেক দীর্ঘ ছিলো। প্রতিরাতেই আমি প্রথম দিনের ন্যায় খাদ্য-পানীয় পেতে থাকি। আমি বাগদাদের জামে মসজিদে গিয়ে পৌঁছি। খতীব আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বললেন, আমি তোমার পথের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি আমাকে তার হুজরায় নিয়ে গেলেন। আমি বিস্মিত হলাম, যে দু'টি পাত্র করে প্রতিরাতে আমার নিকট খাদ্য-পানীয় পৌঁছতো, সেগুলো হজরতের হুজরায় পড়ে আছে। তিনি বললেন, আল্লাহ হযরত মূসাকে (আ.) সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি নীলনদকে নির্দেশ দিলেন, পথ দিয়ে দাও। নদীর ডানের পানি ডানে, বাঁয়ের পানি বাঁয়ে সরে গেলো। মধ্যখানটা শুকিয়ে রাস্তা হয়ে গেলো। মূসা (আ.) বেরিয়ে গেলেন। ফেরাউন তাঁকে ধাওয়া করতে গিয়ে যখন নদীর রাস্তায় নেমে পড়লো, অমনি দু'দিকের পানি একত্রিত হয়ে তাকে ডুবিয়ে মারলো। ফেরাউন আল্লাহর গজবে নিপতিত হলো।'

'খতীব বললেন, আমরা সেই সত্ত্বার অনুগত, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর যে বান্দা তাঁর ইল্‌মের প্রেমে পাগল হয়, যেমনটি তুমি হয়েছো; তাকে তিনি মরুভূমিতে পিপাসায় মরতে দেন না; নদী-সমুদ্রেও ডুবিয়ে মারেন না। সেই মহান সত্ত্বাই তোমাকে কয়েক মাসের কঠিন পথ পার করিয়ে নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তোমার বক্ষে যে ইল্‌ম আছে, সব ঐ বালকটির বক্ষে স্থানান্তরিত করো এবং তোমার খেদমতের জন্য যে দু'টি জিন নিয়োজিত রেখেছি, তাদেরকে বলো, পথে পথে ছেলেটাকে খাদ্য ও পানীয় পৌঁছিয়ে দিক। আমি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেছি। প্রতিরাতে তোমার জন্য এখান থেকে খাবার যেতো। তুমি বিস্মিত হয়ো না বেটা!, অস্থিরও হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক কম লোকেরই হৃদয়ে ইল্‌মের বাতি প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, যার আকাঙ্খা তুমি নিয়ে এসেছো। তোমার নিয়ত ভালো। অন্তরে আল্লাহর খোশনুদির তামান্না আছে। এই তামান্না যার থাকে, সমগ্র মানুষ ও জিন তার গোলাম হয়ে যায়।'

'জিনরা কি আপনার গোলাম?' এক সৈনিক জিজ্ঞেস করে।

'তা নয়'– দরবেশ জবাব দেয়– 'কেউ কাউকে গোলাম বানাতে পারে না। আমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা। উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্য বিবেচিত হয় না। ঈমানের পরিপক্কতা আর দুবর্লতা দ্বারা মানুষের মর্যাদা পরিমাণ করা হয়।'

লোকটির বক্তব্যে এমন এক যাদু, যা সকলকে মুগ্ধ করে তোলে। সকলে তন্ময় হয়ে তার বক্তব্য শুনছে। সে বললো– 'বাগদাদের খতীব আমার হৃদয়কে ইল্‌ম দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে বিবাহও করিয়েছেন। সেখানেই আমার এই দু'টি কন্যা জন্ম লাভ করে। বহু সাধনার পর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'-তিনটি ভেদ লাভ করি। এক রাতে খতীব আমাকে বললেন, এবার যাও। গিয়ে সেই লোকগুলোর সেবা করো, যারা ইল্‌মকে সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের জন্য কবরে ঘুমিয়ে আছে। তিনি আমাকে রামাল্লায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। আমাকে দু'টি উট দিলেন। পাথেয় দিলেন এবং বললেন, অন্তরে কখনো পাপের কল্পনা জাগ্রত হতে দেবে না। রামাল্লা পৌঁছার পর এক রাতে তুমি অনিচ্ছায় শয্যা থেকে উঠে হাঁটা দেবে। সম্ভবত তোমাকে বেশি দূর যেতে হবে না। তোমার পা আপনা-আপনি থেমে যাবে। সেটি একটি পবিত্র স্থান হবে। সেটিকে তুমি আস্তানা বানিয়ে নেবে। তবে আমি একটি সময়– যা এখনো ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে– দেখতে পাচ্ছি। সেই সময়টায় পাপ হবে এবং তোমাকে অন্যের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। বোধ করি, তোমাকে হিজরতই করতে হবে।

'আমি যখন স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে সফরে ছিলাম, তখন সূর্যের প্রখরতা আমার জন্য শীতল হয়ে গিয়েছিলো। যে মরুভূমিতে পানির নাম-চিহ্ন থাকার কথা নয়, আমি সেখানেও অনায়াসে পানি পেয়ে যেতাম। রামাল্লা পৌঁছে দেখি, আমার পিতা-মাতা দু'জনই মারা গেছেন। আমার স্ত্রী বিরান ঘরটিকে ঝেড়ে-মুছে বাসযোগ্য করে তোলে। আমি বিদ্যার সাগরে ডুবে থাকি। ধীরে ধীরে মেয়েগুলো বেড়ে ওঠে। আল্লাহ্ তাদের মাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে যান। মেয়েরা আমার ঘর-গেরস্থলির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এক রাতে আমি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ এমনভাবে আমার চোখ খুলে যায়, যেনো কেউ আমাকে ডেকে তুলেছে।'

'আমি ধড় মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে যাই। বাগদাদের খতীবের কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে যায়, তুমি আপনা-আপনি জেগে উঠবে এবং কোনো ইচ্ছা-পরিকল্পনা ছাড়াই হাঁটতে শুরু করবে। তা-ই হয়েছে। আমার

মনে কোনো ইচ্ছা, কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। লোকালয়ও ত্যাগ করে চলে আসি। কোথাও কোথাও মনে হতো, কে যেনো আমার সামনে সামনে হাঁটছে। জানি না, এটা নিছক কল্পনা ছিলো, না বাস্তব।

আমি হাঁটতে থাকি। জানি না তোমরা সেই জায়গাটি দেখেছো কিনা, যেখানে বেশ গভীরতা আছে এবং সেই গভীরতায় নদী প্রবাহিত হচ্ছে। খৃস্টানদের ফৌজ সেখানেই লুকিয়ে ছিলো। আমি শুনেছি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নাকি মাটির শেষ স্তরে লুকিয়ে থাকা দুশমনকেও দেখতে পান। কিন্তু ওখানে আল্লাহ্ তাঁর চোখের উপর এমন আবরণ ফেলে দিয়েছিলেন যে, তিনি এটুকুও জানতে পারলে না, তিনি নিজে কোথায় আছেন। খৃস্টান বাহিনী তোমাদের বাহিনীকে ফাঁদে নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালায়। পরে তোমাদের কী পরিণতি ঘটেছিলো, তা তো তোমাদের জানা আছে।'

সেই যুদ্ধের বছর কয়েক আগে এক রাতে আমি আপনা-আপনি কিংবা কোন অদৃশ্য শক্তির জোরে সেই গর্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং এক স্থানে আমার পা আটকে গিয়েছিলো। জোছনা রাত ছিলো। আমি একটি কবর দেখতে পেলাম, যার চার পার্শ্বে দু'হাত উঁচু পাথরের দেয়াল। আমি পরীক্ষার জন্য অন্য একদিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি আপনা-আপনি কবরের দিকে ঘুরে গেলাম এবং পাথরের দেয়ালের অভ্যন্তরে যাওয়ার যে পথ ছিলো, তাতে ঢুকে পড়ি। ফাতেহা পাঠের জন্য আমার দু'হাত আপনা-আপনি উপরে উঠে যায়। মনে হলো, জায়গাটার জোছনা বেশি ফকফকা। মনে জাগলো, খতীব আমাকে এ স্থানটির কথা-ই বলেছিলেন। আমি কবরের উপর হাত রেখে বললাম, আমি গোলামটার জন্য নির্দেশ কী? কোন উত্তর আসলো না। মনে প্রতীতি জন্মালো, কয়েকটা রাত সেখানেই কাটিয়ে দেই। সকালে নদীতে গিয়ে অজু করে এসে নামায আদায় করি। তারপর যখন সেখান থেকে বিদায় নিলাম, তখন আমার মধ্যে এক রকম মাদকতা বিরাজ করছিলো, যেনো আমি ধনভান্ডার পেয়ে গেছি।'

তারপর উক্ত কবর থেকে আমার প্রতি এমনভাবে দিক-নির্দেশনা আসতে শুরু করে যে, আমি কোনো শব্দ শুনতাম না। অন্তরে যা কিছু জাগ্রত হতো, তা-ই আমার দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হতো। আমি কবরটির দেয়াল আরো উঁচু করে উপরে গম্বুজ নির্মাণ করে দেই। আমি অনেক দূর-

দূরান্ত পর্যন্ত গিয়েছি। হাল্‌ব-মসুল ছাড়াও বাইতুল মোকাদ্দাসও গিয়েছি। কিছুদিন যাবত উক্ত মাজার থেকে যে সব নির্দেশনা পাচ্ছিলাম, সেগুলো সুখকর ছিলো না। এটি যে বুযর্গের মাজার, তার আত্মা ছটফট করছে বলে মনে হচ্ছিলো। আমি কবরের উপর সবুজ চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলাম। এক রাতে হঠাৎ চাদরটি ফড় ফড় শব্দ করে ওঠে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। চাদরের উপর হাত বুলিয়ে বললাম– 'আদেশ করুন মুরশিদ!'

মাজারের ভেতর থেকে আওয়াজ আসে– 'তুমি কি দেখছো না মুসলমান মদপান করছে? তুমি মুসলমানদেরকে মদের অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করো।'

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। কিন্তু মদ পানকারীরা ছিলো আমীর ও শাসক গোষ্ঠী। আমার আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছেনি।

তারপর আরেক রাত মাজারের চাদর ফড় ফড় করে ওঠে আমাকে বললো, মিসর থেকে আসা ফৌজ মুসলিম বসতিগুলোতে মুসলমানদের সঙ্গে সেই আচরণই করছে, যেমনটি খৃস্টানরা করে থাকে। সে সময় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ দামেশ্‌কেও ছিলো। তাছাড়া দামেশ্‌ক থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এবং সেখান থেকে রামাল্লা পর্যন্ত স্থানে স্থানে তাঁরা অবস্থান করছিলো। সেই ফৌজের কমান্ডাররা মুসলমানদের ঘরে মূল্যবান যতো সম্পদ পেয়েছে, লুট করে নিয়ে গেছে। তারা পর্দানশীন মুসলিম নারীদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করেছে। কমান্ডারদের দেখাদেখিতে সৈনিকরাও লুটপাট ও নারীর সম্ভ্রমহানী শুরু করে দিয়েছিলো। এই রিপোর্টও আছে যে, তোমাদের সালার ও কমান্ডারগণ মুসলিম মেয়েদের অপহরণ করে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে রেখেছিলো। মাজার থেকে আদেশ আসে, তুমি সুলতান আইউবীর নিকট গিয়ে তাঁকে বলো, এই ফৌজ বাগদাদের খেলাফতের– মিসরের ফেরাউনদের নয়। কিন্তু যদি তারা এসব অপরাধ অব্যাহত রাখে, তাহলে তাদের পরিণতি ফেরাউনদের মতোই হবে।'

'সে সময়ে সুলতান আইউবী হাল্‌বের সন্নিকটে এক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তাঁর দেহরক্ষীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি সুলতানের সঙ্গে কেনো সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছো? বললাম, আমি রামাল্লা থেকে এসেছি এবং একটি বার্তা নিয়ে এসেছি। তারা জিজ্ঞাসা করলো, কার বার্তা? আমি বললাম, এই পয়গাম যার, তিনি জীবিত মানুষ নন। রক্ষীরা খিল খিল করে হেসে ওঠে। তাদের কমান্ডার উচ্চকণ্ঠে বললো, পাগল কোথাকার! সুলতান

আইউবীর জন্য কবরের বার্তা নিয়ে এসেছো, না? একজন বললো, লোকটি শেখ সান্নারের প্রেরিত ঘাতক। সুলতানকে হত্যা করতে এসেছে– একে আটক করো। কেউ বললো, খৃস্টানদের চর, মেরে ফেলো। অগত্যা গ্রেফতার এড়াবার জন্য আমি প্রকাশ করলাম, আমি পাগল। আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সুলতান আইউবীর রক্ষীদের এক কক্ষে দু'টি মেয়ে বসে আছে।

'আমরা তো আমাদের ফৌজের সঙ্গে কোনো নারী দেখিনি!' এক সৈনিক বললো।

'তারা যখন দামেশ্‌ক গিয়েছিলো, তুমি কি তখন থেকেই ফৌজের সঙ্গে আছো?' লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

'আমরা সবাই এই প্রথমবার এসেছি'– সৈনিক জবাব দেয়– 'আমরা নতুন সৈনিক।'

'আমি পুরাতন সৈনিকদের কথা বলছি'– লোকটি বললো– 'সে ফৌজের কমান্ডার ও সৈনিকরা উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে গেছে। তোমরা নতুন। এখনো পাপ করোনি। সে কারণেই তোমরা জীবিত ও নিরাপদে ফিরে এসেছো। যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ঘর লুট করেছিলো এবং মুসলিম নারীদের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলো, তারা মারা গেছে। যারা বেশি গুনাহ্‌গার ছিলো, তাদের কারো পা কাটা গেছে, কারো বাহু। জীবিত পড়ে থাকা অবস্থায় শকুনেরা তাদের চোখ খুলে খেয়েছে। যারা তাদের চেয়েও বড় পাপী ছিলো, তারা খৃস্টানদের হাতে বন্দি হয়ে গেছে। যে বন্দিত্ব তাদের জন্য জাহান্নামের চেয়ে কম হবে না। তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত নির্যাতন। তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় ছট ফট করতে থাকবে; কিন্তু মরবে না। মৃত্যুর জন্য দু'আ করবে; কিন্তু কবুল হবে না।'

'এই কি আমাদের পরাজয়ের কারণ?' এক সৈনিক বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

'আমি দু'বছর আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, এই বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে'– লোকটি বললো– 'আর এই ফৌজ কাফেরদেরকে ইসলামের অবমাননা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। এখন এই বাহিনী আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হলো।'

'আপনি কোথায় যাবেন?'– একজন জিজ্ঞাসা করে।

'আমি তোমাদের ন্যায় আল্লাহর গজব থেকে– যা খৃস্টান বাহিনীর আকারে নাযিল হয়েছিলো– পালিয়ে এসেছি'– লোকটি উত্তর দেয়– 'খৃস্টান

বাহিনী ঝড়ের ন্যায় এসেছিলো। তোমাদের ফৌজ তাকে প্রতিহত করতে পারেনি। আমি যদি একা হতাম, তাহলে মুরশিদের মাজারে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করে দিতাম। কিন্তু আমার এই যুবতী মেয়েগুলোর ইজ্জত তো আমি কুরবান করতে পারি না। খৃস্টানরা দু'টি বস্তু নাগালে পেলে ছাড়ে না। অর্থ আর নারী। আমার প্রতি মাজার থেকে নির্দেশ আসে, মেয়েদের নিয়ে তুমি মিসর চলে যাও। জিজ্ঞাসা করলাম, জীবন নিয়ে নিরাপদে যাবো কীভাবে? উত্তর আসে, তুমি আমার যে খেদমত করেছো, তার বিনিময়ে তোমরা নিরাপদেই কায়রো পৌঁছে যাবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে নীরবে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিজন মানুষকে বলতে হবে, পাপ করবে তো, এমন শাস্তি ভোগ করবে, যেমনটি ভোগ করছে তোমাদের ফৌজ। মাজার থেকে আমাকে আরো অনেক কিছু বলা হয়েছে, যা আমি মিসর পৌঁছে বলবো। তোমরা পরস্পরকে তাকাও। তোমাদের চেহারা লাশের ন্যায় সাদা হয়ে গেছে। তোমাদের দেহে যেনো প্রাণ নেই। আর আমার দিকে তাকাও। আমি আমার কন্যাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছি। সঙ্গে কোন খাদ্য-পানীয় ছিলো না। তারপরও আমরা কিরূপ তরতাজা! এটা মহান আল্লাহর'ই অনুগ্রহ।'

'আপনি কি আমাদেরকে মিসর পর্যন্ত আপনার ন্যায় নিয়ে যেতে পারেন?' এক সৈনিক জিজ্ঞাসা করে।

'পারি, যদি তোমরা ওয়াদা করো; অন্তর থেকে পাপের কল্পনা ঝেড়ে ফেলবে'– লোকটি উত্তর দেয়– 'আর এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমি যে মিশন নিয়ে মিসর যাচ্ছি, তাতে তোমরা আমার সঙ্গ দেবে।'

'আমরা সত্যমনে ওয়াদা করছি'– অনেকগুলো কণ্ঠ ভেসে ওঠে– 'আপনি বলুন, আমাদের কী করতে হবে। জীবন থাকা পর্যন্ত আমরা আপনার সঙ্গ দেবো।'

'আমি শুধু নিজের জীবন আর মেয়ে দু'টোর ইজ্জত রক্ষা করার জন্য রামাল্লা থেকে পালিয়ে আসিনি'– লোকটি বললো– 'মাজার আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, আমি মিসর গিয়ে বলবো, তোমরা ফেরাউনদের দেশের মানুষ। এই মাটিতে পাপের ক্রিয়া আছে। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে নীলাম হয়েছিলেন। মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বেআদবী মিসরে হয়েছিলো। ফেরাউনদের হাতে অনেক নবীর গোত্র এই মিসরে খুন হয়েছিলো। হে মিসরবাসী! তোমাদের ধ্বংস ও শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। তোমরা আল্লাহর

রশিকে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। এই বার্তা আমি মিশরবাসীর জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা যদি এই বার্তা সারা দেশে প্রচারের কাজে আমাকে সাহায্য করো, তাহলে তোমাদের দুনিয়াও জান্নাতে পরিণত হবে এবং আখেরাতেও তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যাবে।'

সূর্য অস্ত যেতে এখনো অনেক বাকি। রামাল্লার দিক থেকে আসা দু'-তিনজন সৈনিক নিকট দিয়ে অতিক্রম করছে। দরবেশ বললো, ওদের থামাও। ওরা রাত পর্যন্ত জীবিত থাকবে না।

তাদের থামানো হলো। তারা পানি প্রার্থনা করছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। দরবেশ বললো, পানি রাতে পাবে। সে পর্যন্ত সেই আল্লাহকে স্মরণ করো, যিনি তোমাদের রামাল্লা থেকে জীবিত উদ্ধার করে এনেছেন এবং নতুন জীবন দান করেছেন।

কিছুক্ষণ পর আরো দু'ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে এদিক দিয়ে অতিক্রম করে। তারা সৈনিক নয়। তারা প্রথমে কাফেলার প্রতি তাকায়। তারপর কালো চোগা পরিহিত কালো দাড়িওয়ালা লোকটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে। তারা ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াগুলো ওখানেই রেখে ছুটে আসে। উভয়ে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর তার হাতে চুমো খেয়ে বললো– 'মুরশিদ! আপনি এখানে?' তারা কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই কাফেলার সৈনিকদের উদ্দেশে বললো, আপনাদের খোশনসিব যে, আপনারা এই বুযুর্গের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইনি এক বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মিসরের গোনাহগার ফৌজ যদি মাজার এলাকায় আসে, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

'এদিক-ওদিক লক্ষ্য রাখো– 'লোকটি সকলকে বললো– 'যেখানেই পথভোলা কাউকে মিসরের দিকে যেতে দেখবে, এখানে নিয়ে আসবে। রাতে এখানে কেউ ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থাকবে না।'

মিসর যাওয়ার এই একটিই পথ। অন্য সব জায়গা টিলায় পরিপূর্ণ। এটিই প্রশস্ত জায়গা। তবে এর মধ্যদিয়ে যাওয়াও অনর্থক। বাইরে থেকেই বুঝা যায়, এখানে পানির নাম-চিহ্ন নেই। সবাই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে। মিসরের সীমান্ত এখনো অনেক দূর। এই লোকগুলোর আশ্রয় প্রয়োজন। কালো দাড়িওয়ালা দরবেশই এখন তাদের ভরসা। লোকটির প্রতিটি কথা

তাদের হৃদয়ে বসে গেছে। কিন্তু পিপাসার আতিশয্যে দু'-তিনজন সৈনিক চৈতন্য হারাবার উপক্রম হয়। দরবেশ তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করছে।

সূর্য ডুবে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে রাত। নীরব-নিস্তব্ধ সাহারা। হঠাৎ টিলার মধ্য থেকে একটি পাখির ডাক ভেসে আছে। সবাই চমকে ওঠে। যে জাহান্নামে পানির কল্পনাও করা যায় না, মৃত্যু যেখানে মাথার উপর ঝুলে থাকছে সারাক্ষণ, সেই অঞ্চলে পাখির ডাক! না, এটি পাখির ডাক নয়, হতে পারে না। সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এটি কোনো প্রেতাত্মার শব্দ হবে।

'শোকর আল্লাহ!'– দরবেশ বললো– 'আমার দু'আ কবুল হয়ে গেছে।' লোকটি তার সম্মুখে উপবিষ্ট দু'জন সৈনিককে বললো– 'তোমরা দু'জনে ওদিকে যাও। চল্লিশ পা গণনা করো। সেখান থেকে ডান দিকে মোড় নাও। চল্লিশ কদম গণনা করো। সেখান থেকে বাঁ দিকে মোড় নাও। সম্মুখে এক স্থানে আগুন জ্বলছে দেখবে। সেই আগুনের আলোতে তোমরা পানি দেখতে পাবে। হয়তো কিছু খাবারও পেয়ে যাবে। যা পাবে তুলে নিয়ে আসবে। এই যে ডাকটা শুনেছো, ওটা পাখির ডান নয়– গায়েবের ইশারা।'

'আমি যাবো না'– এক সৈনিক ভয়জড়িত কণ্ঠে বললো– 'তার গা ছমছম করছে– আমি জিন-পরীর জায়গায় যাবো না।'

যে দু'জন লোক পরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলো, তারা দাঁড়িয়ে যায়। দরবেশকে একটা সেজদা দিয়ে সৈনিকের উদ্দেশে বললো– 'ভয় করো না। জিন-পরীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের প্রতি নির্দেশ আছে, এই বুযর্গ যেখানে যাবেন, তাকে খাদ্য-পানীয় পৌঁছাতে থাকবে। আমরা হযরতের কারামত সম্পর্কে অবগত। দু'-তিনজন লোক আমাদের সঙ্গে চলো।

এবার সৈনিকরা যেতে সম্মত হয়। তারা রওনা হয়ে পড়ে। দরবেশের কথামতো পা গননা করে। মোড় ঘুরে। তারপর দু'টি টিলার মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে একস্থানে আগুন দেখতে পায়। সকলে কালেমা ঝপতে ঝপতে এগিয়ে যায়। আগুনের আলোতে পানিভর্তি চার-পাঁচটি মশক পড়ে আছে দেখতে পায়। আছে একটি কাপড়ের পুটুলিও। থলেটি খেজুরে ভর্তি। তারা মশক ও থলেটি তুলে নেয়। ফিরে গিয়ে বস্তুগুলো দরবেশের সম্মুখে রেখে দেয়। দরবেশ খেজুরগুলো অল্প অল্প করে সকলের

মাঝে বন্টন করে দেয়। পরে দু'টি মশক তাদের হাতে তুলে দিয়ে বললো, প্রয়োজনের বেশি পান করো না। পানি বাঁচানোর চেষ্টা করো। এবার কারো সন্দেহ রইলো না, লোকটি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বড় মাপের একজন বুযুর্গ। সে সকলকে তায়াম্মুম করিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত পোহাতে এখনো অনেক দেরি। লোকটি সকলকে জাগিয়ে তোলে এবং কাফেলা মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। দরবেশ একটি উটের পিঠে এবং তার মেয়ে দু'টো আরেকটি উটের পিঠে চড়ে বসে। পথে তাদের তিন-চারজন সৈনিকের সঙ্গে সাক্ষৎ হয়। তারাও মিসর যাচ্ছে। দরবেশ তাদেরও খেজুর খাওয়ায় ও পানি পান করায়। তারপর তাদেরকে দু'জন উষ্ট্রারোহীর পেছনে বসিয়ে নেয়।

এই কাফেলার ডান দিক দিয়ে আরো একটি কাফেলা যাচ্ছিলো। একজন বললো, ওদেরকেও নিয়ে নিন। দরবেশ বললো, তারা আমাদের ন্যায় পালিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

অনেকদিন পর সৈনিকদের এই কাফেলা দরবেশরূপী কালো দাড়িওয়ালা লোকটির সঙ্গে মিসরের সীমানায় প্রবেশ করে। যে দু'ব্যক্তি পরে এসে দরবেশকে সেজদা করেছিলো, তারা পথে সৈনিকদেরকে দরবেশের কারামতের কাহিনী শোনাতে থাকে। তারা সৈনিকদের ধারণা প্রদান করে, যে ব্যক্তি লোকটিকে নিজ গ্রামে আশ্রয় দেবে, তার জীবিকার কোনো অভাভ থাকবে না এবং খোদা সব সময় তার উপর দয়াপরবশ থাকবেন। একই গ্রামের তিন সৈনিক তাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা দরবেশকে বললো, আপনি আমাদের গ্রামে চলুন। লোকটি তাদেরকে দু'-চারটি প্রশ্ন করে তাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে।

কায়রোর অদূরে বড় একটি গ্রাম। কাফেলা উক্ত গ্রামটিতে প্রবেশ করে। সৈনিকদের দেখে গ্রামের অধিবাসীরা তাদের চার পার্শ্বে ভিড় জমায়। তাদের পশুগুলোকে খেতে দেয় এবং তাদের জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করে।

জনতা যুদ্ধের কাহিনী শুনতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তারা কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটি সম্পর্কে বললো, ইনি আল্লাহর নৈকট্যশীল বুযুর্গ মানুষ। আল্লাহ জিনের মাধ্যমে এর নিকট খাবার পৌঁছিয়ে থাকেন।

সৈনিকরা জনতাকে লোকটির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শোনায়। দরবেশ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। দু'চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে আছে। তার মেয়ে দু'টোকে এই গ্রামেরই অধিবাসী এক সৈনিক নিজ ঘরে নিয়ে যায়।

'রণাঙ্গনের ভেদ আমাকে জিজ্ঞাসা করো'- দরবেশ বললো- 'এরা সৈনিক। এরা কেবল লড়াই করতে জানে। সৈনিকদের জানা থাকে না, যুদ্ধের নেপথ্য নায়কদের উদ্দেশ্য কী। এই যে ক'জন সৈনিককে আমি সাহারার আগুন থেকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছি, এরা সেই ফৌজের শাস্তি ভোগ করছিলো, যারা এদের অনেক আগে সিরিয়া গিয়েছিলো। সেই ফৌজ প্রতিটি রণাঙ্গনে বিজয় অর্জন করেছিলো। সেখানকার উপত্যকা-মরুভূমি 'সুলতান আইউবী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত ছিলো। এই বাহিনী সর্বত্র হীরে-জহরত ও নারী দেখতে পায়। ওখানকার নারীরা মিসরের নারীদের চেয়েও বেশি রূপসী। গনীমতের নেশা বাহিনীটির মধ্যে ফেরাউনী চরিত্র সৃষ্টি করে দেয়। তাদের মন-মস্তিষ্কে গনীমত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। তারপর ফৌজের সালার, কমান্ডার ও সৈনিকরা জাতির ইজ্জত এবং মর্যাদাবোধকেও বিদায় জানায়। তারা মুসলমানদের ঘরে ঘরে লুট-তরাজ শুরু করে দেয়। সুন্দরী মেয়েদের শ্লীলতাহানী ও অপহরণ করতে শুরু করে। এই নারীগুলো সবাই ছিলো সম্ভ্রান্ত ও পর্দানশীল মুসলিম মহিলা। তাদেরকে তারা নিজ তাঁবুতে আটকে রাখে।'

'কেন, সুলতান আইউবী কি অন্ধ ছিলেন?'- এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে- 'তিনি কি দেখলেন না, তাঁর সৈন্যরা কী করছে?'

খোদা যখন কোনো জাতিকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন দেশের ইমাম, আলিম ও শাসকদের বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দেন'- দরবেশ বললো- 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী স্বয়ং জয়ের নেশায় মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বোধ হয় আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর শাস্তি-সাজার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। তার দেহরক্ষী ও বিলাসী সালারগণ তাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিলো যে, কোনো মজলুমের ফরিয়াদ তাঁর কানে পৌঁছতো না। যে রাজা ফরিয়াদীদের জন্য ইনসাফের দ্বার এবং নিজের কান বন্ধ করে রাখেন, সে রাজা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। আমি দু'বছর আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, এই বাহিনী পাপের শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি রাতে গায়েবী আওয়াজ শুনতাম। কিন্তু যার জন্য আওয়াজ আসতো, তার কান বন্ধ ছিলো।'

তারপর খোদা তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী- যিনি রণাঙ্গনের রাজা ছিলেন এবং যাকে খৃস্টানরা রণাঙ্গনের দেবতা মনে করতো- এমনই জ্ঞানান্ধ হয়ে যান যে, তিনি সকল রণকৌশল ভুলে যান। তাঁর কৌশলে যুদ্ধ করে শত্রুরা। তিনি এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন যে, একাকি মিসর পালিয়ে আসতে বাধ্য হন।'

'আমরা খৃস্টানদের থেকে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো'- এক বেদুঈন তেজস্বী কণ্ঠে বললো- 'আমরা আমাদের পুত্রদেরকে কুরবান করে দেবো।'

'জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে'- দরবেশ বললো- তিনি যদি কারো কপালে পরাজয় লিপিবদ্ধ করেন, তাহলে জয় ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা তার থাকে না। তখন বান্দার সব জোশ ঠান্ডা হয়ে যায়। আমিও এখানে এজন্যই এসেছি যে, মিসরের শিশুটিকেও প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত করবো। কিন্তু শাস্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। তোমরা যদি তোমাদের পুত্রদেরকে এখনই পুনরায় ভর্তি করিয়ে ময়দানে প্রেরণ করো, তাহলে তারা মারা যাবে এবং পরাজয়বরণ করবে। প্রতিটি কাজের একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারিত থাকে। খৃস্টানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের সেই মোক্ষম সময়টি এখনো আসেনি। এখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো এবং তাঁর নিকট তোমাদের সেই পুত্রদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, যাদেরকে তোমরা সিরিয়া প্রেরণ করেছিলে।

'পরাজয়ের সব দায় আমার মাথায় রাখো'- সুলতান আইউবী বললেন। তিনি সালার, নায়েব সালার, কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন- 'পরাজয়ের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। ভুল হয়েছে, আমি নতুন সৈনিকদের ময়দানে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যদি আরো অপেক্ষা করতাম আর মিসরে বসে থাকতাম, তাহলে দুশমন সমগ্র মিসরে ছড়িয়ে যেতো। আমি ফৌজের যে অভাবটা নতুন সৈনিকদের দ্বারা পূরণ করেছি, তোমরা জানো, তার দায় কার উপর বর্তায়। কিন্তু সেই আলোচনায় জড়িয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। অপরাধ আরোপ যদি করতেই হয়, তাহলে আমার উপর করো। বাহিনী দ্বারা যুদ্ধ আমি করিয়েছি। কৌশলে ভুল থাকলে সেই ভুল আমার। তার কাফফারা আমাকেই আদায় করতে হবে

এবং করবো। জয়-পরাজয় যে কোনো যুদ্ধের শেষ ফল। আজ আমরা এমন একটি পরিণতির মুখোমুখি, যার জন্য আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। সে কারণেই আমি তোমাদের চেহারায় মলিনতা এবং চোখে অস্থিরতা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যদি আমাকে পরাজয়ের শাস্তি দিতে চাও, আমি তার জন্যও প্রস্তুত আছি। আমার কানে এ আওয়াজও আসছে যে, আমার ফৌজ সিরিয়া গিয়ে নারীর শ্লীলতাহানি, লুণ্ঠন ও মদপানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে, বাগদাদের খলীফার উপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরাজয়বরণ করেছি এবং আমি এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করে খলীফাকে আমার অনুগত বানাবার চেষ্টা করবো। আমাকে ফেরাউনও আখ্যা দেয়া হচ্ছে। আমি এর একটি অপবাদেরও জবাব দেবো না। এসব অপবাদ-অভিযোগের জবাব আমি মুখে দেবো না– দেবে আমার তরবারী। আমি শব্দ দ্বারা নয়, কাজে প্রমাণ করবো এসব কার পাপ, যার শাস্তি আমি এবং আমার মুজাহিদরা ভোগ করেছে।'

ইতিমধ্যে দারোয়ান সংবাদ জানায়, হামাত থেকে দূত এসেছে। সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভেতরে তলব করেন। সর্বাঙ্গ ধুলায় মাখা ও দীর্ঘ সফর-ক্লান্ত দূত আল-আদিলের একখানা পত্র সুলতানের হাতে তুলে দেন। সুলতান পত্রখানা খুলে পাঠ করেন। তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। পত্রখানা এক সালারের হাতে দিয়ে সুলতান বললেন– 'পড়ে সবাইকে শোনাও।'

সালার বার্তাটি পড়তে শুরু করেন। পড়তে পড়তে যতোই অগ্রসর হচ্ছেন, শ্রোতাদের চোখে আনন্দের দ্যোতি ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অজান্তে তাদের মুখ থেকে অস্ফুট জিন্দাবাদ ধ্বনিও উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে।

'এ হলো গুনাহগারদের কীর্তি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা যারা কায়রোতে ছিলে, জানো না আল-আদিলের নিকট কতোজন সৈন্য আছে। জানতে না বল্ডউইনের কাছে আমাদের দশগুণ বেশি সৈন্য ছিলো। তার আরোহীরা বর্মপরিহিত। সব পদাতিকের মাথায় শিরস্ত্রাণ। আল-আদিল কি প্রমাণ করেনি, আমরা পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে জানি? তোমরা কি ভাবতে পারো, আমি মাথায় হাত রেখে বসে পড়বো? তোমরা পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমাকে নতুন সেনাভর্তি দাও। বায়তুল মুকাদ্দাস তোমাদের ডাকছে। দুশমনের সঙ্গে আমি কোনো প্রকার চুক্তি-সমঝোতা করবো না।'

আল-আদিলের বার্তা যেমনি সুলতান আইউবীকে উজ্জীবিত করে তোলে, তেমনি তাঁর সালার, কমান্ডার প্রমুখদের বিক্ষত মনোবলকেও চাঙ্গা করে তোলে। যাদের অন্তরে সুলতান আইউবী ও তাঁর ফৌজের বিরুদ্ধে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিলো, তা দূর হয়ে যায়।

ওদিকে আল-আদিলও থেমে নেই। তিনি তাঁর বাহিনীকে ত্রিশ-চল্লিশজনের দলে বিভক্ত করে সেই এলাকায় নিয়ে যান, যেখানে বল্ডউইন ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর কমান্ডারদেরকে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। উদ্দেশ্য, দুশমনকে অস্থির করে রাখতে হবে। যেনো তারা অগ্রযাত্রা করতে না পারে এবং বসে থাকতেও না পারে।

বল্ডউইন পূর্ব থেকেই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি এতো বিশাল বাহিনী নিয়ে এই আশায় এসেছিলেন যে, তিনি দামেশ্ক পর্যন্ত সকল ভূখণ্ড দখল করে ফেলবেন। কিন্তু এখন তার অবস্থা হচ্ছে, প্রতি রাতে বাহিনীর কোনো না কোনো অংশের উপর তীরবৃষ্টি হচ্ছে কিংবা আক্রমণ হচ্ছে। সৈন্যদের সচেতন হতে না হতে আক্রমণকারীরা সটকে পড়ছে।

বল্ডউইন তার বাহিনীকে সমগ্র অঞ্চলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল-আদিলের কমান্ডো বাহিনীর ন্যায় গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছেন, যারা রাতে এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। কিন্তু প্রতিটি ভোরেই বল্ডউইনকে সংবাদ শুনতে হচ্ছে, আজ অমুক ক্যাম্পের উপর আক্রমণ হয়েছে কিংবা অমুক গ্রুপটি মারা পড়েছে।

অঞ্চলটা পাহাড়ি। আল-আদিলের গেরিলাদের জন্য এটি একটি বিশেষ সুবিধা। সুযোগটা তারা ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছে। তবে এই স্বার্থ উদ্ধার করতে আল-আদিলকে অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে। কমান্ডোরা এতো দুঃসাহসিকতার সাথে আক্রমণ চালাচ্ছে যে, তারা দুশমনের ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে এবং নিজেদের জীবন কুরবান করে সমূহ ক্ষতিসাধন করছে।

এই ধারার যুদ্ধ আর এই কুরবানীর মাধ্যমে কোনো অঞ্চল জয় করা সম্ভব ছিলো না। আল-আদিল দুশমনকে সেখান থেকে পেছনে হঠাতে পারছেন না। কিন্তু উপকারও কম হচ্ছে না যে, খৃস্টানদের এই বিশাল বাহিনীটি সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। বল্ডউইন যদি সম্মুখে অগ্রসর হতেন, তাহলে এই সামান্য সৈন্য নিয়ে আল-আদিল

মুখোমুখি যুদ্ধে দু'ঘণ্টাও টিকতে পারতেন না।

বল্ডউইনের ক্যাম্পে কর্মরত স্থানীয় লোকদের মধ্যে আল-আদিলের গুপ্তচরও আছে। সুযোগমতো তারাও কাজ করছে। খৃস্টানরা ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য পাহাড়ের উঁচুতে শুষ্ক ঘাসের স্তূপ জড়ো করে রেখেছিলো। আল-আদিলের এক গুপ্তচর তাতে আগুন ধরিয়ে ভস্ম করে ফেলে।

আল-আদিল সংবাদ পান, দামেশ্‌ক থেকে সামান্য সাহায্য আসছে। হাল্‌ব থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। আল-মালিকুস সালিহ বার্তা প্রেরণ করেন, খৃস্টানরা হাররান দুর্গ অবরোধ করার পরিকল্পনা আঁটছে। তা-ই যদি ঘটে যায়, তাহলে হাল্‌বের ফৌজ দ্বারা তাদের মোকাবেলা করতে হবে।

কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রামাল্লার পরাজয়ের পর ইসলামী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তার ক্ষুদ্র যে ইউনিটগুলো বেঁচে গিয়েছিলো, তারা লুটপাটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। তারা খৃস্টানদের সেনা কাফেলাগুলোতেও হাইজ্যাক শুরু করে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, লুট করতো স্বয়ং খৃস্টান সৈন্যরা। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ তথ্য স্বীকার করেছেন। পূর্বেও ঐতিহাসিকদের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, খৃস্টান সৈন্যরা অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে মুসলিম কাফেলাসমূহ লুণ্ঠন করতো। তারা এই লুটতরাজ এমন ধারায় করতো, যেনো এটি তাদের সামরিক ডিউটি। কতিপয় ঐতিহাসিক যেসব মুসলিম সেনাদল সম্পর্কে লিখেছেন, তারা লুটতরাজ করতে শুরু করেছিলো, তারা ছিলো মূলত আল-আদিলের কমান্ডো সেনা, যারা সম্রাট বল্ডউইনের বিশাল বাহিনীকে গেরিলা অপারেশনের মাধ্যমে একই অঞ্চলে আটকে রেখেছিলো।

যা হোক, গেরিলা অপারেশনে আল-আদিলকে অনেক মূল্য গণনা করতে হয়েছে। কিন্তু সৈনিকদের জয্‌বা এতোই তীব্র ছিলো যে, একজন সৈনিকও পেছন দিকে তাকাতে সম্মত ছিলো না। অধিকাংশ সৈন্য অবিরাম উপত্যকা ইত্যাদি অঞ্চলে টহল দিয়ে অপারেশন পরিচালনা করে ফিরছিলো। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ক্ষণিকের জন্য ক্যাম্পে যাওয়ার ফুরসত ছিলো না। ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদীর প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ভাষ্যমতে, তারা ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকারের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকতো এবং যখনই শিকার চোখে পড়তো, তখন আর নিজের জীবনের কোনো তোয়াক্কা থাকতো না। তারা দুশমনের অধিক থেকে অধিকতর ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে

অবলীলায় শহীদ ও আহত হয়ে যেতো। তাদের রাত কাটতো মরু বিয়াবানে-অঘুম নয়নে।

কিন্তু কায়রোতে এই প্রোপাগাণ্ডা জোরেশোরে বেড়ে চলেছে যে, মিসরের ফৌজ চরিত্রহীন ও বিলাসী হয়ে ওঠেছে এবং রামাল্লার পরাজয় তার শাস্তি। কায়রোর ইন্টেলিজেন্স খুঁজে বের করতে পারছে না, এই অপপ্রচার কোথা থেকে উত্থিত হচ্ছে। এটা নতুন সৈনিকদের অসতর্ক কথাবার্তার প্রতিফল, নাকি দুশমনের এজেন্টরা সুকৌশলে এই প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখন এ-ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মানুষ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে ইতস্তত করছে। রামাল্লার পরাজয়ের আগে মিসরীদের চিন্তা-চেতনা এরূপ ছিলো না। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'জনগণ ফৌজের দুর্নাম করে বেড়াচ্ছে' এই তথ্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধেও মানুষ মুখ খুলছে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

কালো দাড়িওয়ালা দরবেশ তার দু'কন্যাকে নিয়ে যে গ্রামটিতে অবস্থান নিয়েছিলো, এখন সে সেখানকার বাসিন্দা। গ্রামবাসীরা তাকে একটি ঘর দিয়ে রেখেছে। মিসরীদের গুনাহ মাফ করাবার জন্য তিন মাস চিল্লা করতে হবে বলে সে প্রকাশ্যে উঠাবসা করা ও মানুষের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। উক্ত গৃহ থেকে বাইরে বের হলেও স্বল্প সময়ের জন্য বের হচ্ছে এবং নীরব থাকছে। উপস্থিত জনতাকে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে সালাম করছে এবং ভেতরে চলে যাচ্ছে। মাঝপথ থেকে তার সঙ্গে আসা সৈনিকরাই তার ঘনিষ্ঠ সহচর। আর সেই দু'ব্যক্তি– যারা পরে পার্বত্য অঞ্চলে এসে তাকে সেজদা করেছিলো– লোকটাকে এতো প্রচার করে দেয় যে, এখন তাকে এক নজর দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসা-যাওয়া করছে।

❖ ❖ ❖

আলী বিন সুফিয়ানের এক গোয়েন্দা ডিউটির অংশ হিসেবে ছদ্মবেশে কায়রোর উপকণ্ঠে এক স্থানে ঘোরাফেরা করছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাগরিবের নামায আদায় করার জন্য সে মসজিদে প্রবেশ করে। নামাযের পর ইমাম সাহেব দু'আ করেন। মুনাজাত শেষ হলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের কিছুক্ষণের জন্য বসতে অনুরোধ জানিয়ে ভাষণ দিতে শুরু করে। তার ভাষণের বিষয়বস্তু রামাল্লার পরাজয়। সে সুলতান আইউবীর ফৌজের বিরুদ্ধে সেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করে, যা কালো দাড়িওয়ালা

দরবেশ বলেছিলো। এই লোকটি দরবেশের সূত্র এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেনো লোকটি গায়েব জানে এবং জিনরা তাকে জীবিকা পৌঁছায়। সে সফরের পূর্ণ কাহিনী শোনায় এবং তারা কীভাবে গায়েব থেকে পানি ও খেজুর লাভ করেছিলো, তার বিবরণ প্রদান করে।

মুসল্লীরা তন্ময় হয়ে তার বক্তৃতা শুনতে থাকে।

বক্তব্য শেষ হলে মুসল্লীরা তাকে দরবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে– 'তিনি কি মনের আশা পূরণ করতে পারেন? দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকদের আরোগ্য দান করতে পারেন? ভবিষ্যতের খবর জানেন? সন্তান দিতে পারেন?'

উত্তরে বক্তা বললো, তিনি এখনো সকলকে শুধু এ কথাই বলছেন যে, সুলতান আইউবী ও তার বাহিনীতে ফেরাউনী চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তাদের পরাজয়ের কারণও এটাই। তিনি আরো বলছেন, তোমরা না নিজেরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবে, না অন্যকে ভর্তি হতে দেবে। অন্যথায় তোমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। কারণ, গুনাহের শাস্তির মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি। তিনি তিন মাসের জন্য মুরাকাবায় বসেছেন। তিন মাস পরে বলবেন, মিসরীদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে কিনা।

লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে একদিকে হাঁটতে শুরু করে। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা তার পিছু নেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি যে বুযুর্গের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি একজন সৈনিক। আপনার বক্তব্য শুনে মনে ভয় ধরে গেছে যে, ফৌজের পাপের শাস্তি আমাকেও ভোগ করতে হয় কিনা। আমিও দামেশ্‌ক-হালবের রণাঙ্গনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমিও সেই পাপ করেছি, যার আলোচনা আপনি করেছেন। আপনি আমাকে বুযুর্গের নিকট নিয়ে চলুন। তিনি যদি বলেন আমি ফৌজ থেকে পালিয়ে যাবো। তিনি আমার থেকে যে সেবা চাইবেন, আমি দেবো। আমি খোদার অসন্তোষকে ভয় করি।

লোকটি এতোই অনুনয়-বিনয় করে যে, তার চোখ থেকে অশ্রু নেমে আসে।

'আমার সঙ্গে চলো'– লোকটি বললো– 'কিন্তু কাউকে বলবে না তুমি তাঁর কাছে গিয়েছিলে। বর্তমানে তিনি চিল্লায় আছেন। তিন মাসের জন্য মুরাকাবায় বসেছেন। কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। সাক্ষাতের পর তিনি যা যা জিজ্ঞেস করবেন, কেবল তারই উত্তর দেবে, কোন ফালতু কথা বলবে না।'

'আপনি কি সেই গ্রামেরই বাসিন্দা?'– গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করে– 'বলেছেন আপনি রামাল্লার রণাঙ্গন থেকে আসা সৈনিক?'

'এই জন্যই তো কুরআনে হাত রেখে বলতো পারবো, এই বুযুর্গ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দাদের একজন'– সৈনিক বললো– 'আমি রণাঙ্গনের রুদ্ররোষ দেখেছি। দেখেছি সফরের গজবও। কিন্তু এই লোকটি মরু প্রান্তরকে ফুল বাগিচায় পরিণত করে দিয়েছিলেন। এখন আর আমি বাহিনীতে যোগ দেবো না।'

গ্রামটা দূরে নয়। দু'জন কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেছে। রাত গভীর হয়ে গেছে। সৈনিক গোয়েন্দাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে সেই ঘরে চলে যায়, যেখানে তার পীর অবস্থান করছে। খানিক পর ফিরে এসে বললো, 'আপনি পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে আসুন।' বলেই নিজে তার সম্মুখে সম্মুখে হাঁটতে শুরু করে। দু'জন পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেউড়ি ও বারান্দা অতিক্রম করে তারা একটি কক্ষে প্রবেশ করে। বারান্দায় আলো ছিলো। দরবেশ যে দুটো মেয়েকে নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিয়েছিলো, তারা অন্য এক কক্ষে অবস্থান করছে। বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে তারা কক্ষের জানালা খুলে দেখে। বাইরে চোখ ফেলেই একটি মেয়ে চমকে ওঠে এবং অলক্ষ্যে তার মুখ থেকে 'উহ!' বেরিয়ে আসে।

'কী হলো?' অপর মেয়ে জিজ্ঞেস করে– 'লোকটি কে?'

'মনে হয় আমরা ধরা পড়ে গেছি'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'এই লোকটাকে আমি আগেও কোথাও দেখেছি। গোয়েন্দা মনে হচ্ছে!' মেয়েটি গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায়।

গোয়েন্দা কক্ষে প্রবেশ করে দরবেশের সম্মুখে সেজদাবনত হয়। তার পায়ে মাথা ঘষে। দরবেশ মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে বসে আছেন। গোয়েন্দা কান্নাজড়িত কণ্ঠে সবিনয় অনুরোধ জানায়, আপনি আমার গুনাহগুলো মাফ করিয়ে দিন। সে সৈনিকদের সঙ্গে পথে যেসব আবেগময় কথা বলেছিলো, দরবেশের সম্মুখেও সেসব পুনর্ব্যক্ত করে। তার চোখে অশ্রু এসে যায়। দরবেশ নিজের তাসবীহটা তার মাথার উপর বুলিয়ে মুচকি হেসে মাথায় হাত রাখে।

'এতে আমার প্রশান্তি আসবে না'– গোয়েন্দা অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে বললো– 'মুখের কথায় আমাকে সান্ত্বনা দিন। আমাকে আদেশ করুন।

আমি আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আমার একটি মাত্র সন্তান। আপনি আদেশ করলে আমি তাকেও আপনার পায়ের উপর জবাই করে ফেলবো। সুলতান আইউবীকে হত্যা করতে বলুন, আমি আপনার আদেশ পালন করবো। কথা বলুন। আদেশ করে দেখুন আমি মান্য করি কিনা।'

অপর এক ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করে। সে গোয়েন্দার কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনছে এবং গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করছে। সে গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি এতো অস্থির হচ্ছো কেনো? এখন তো তুমি মুর্শিদের ছায়ায় এসে পড়েছো!'

'আমার পাপ এতো বেশি যে, আমি রাতে ঘুমাতে পারি না'– গোয়েন্দা বললো– 'আমি হামাতের সন্নিকটে এক গ্রামে এক মুসলিম পরিবারের একটি মেয়েকে অপহরণ করতে গিয়ে তার যুবক ভাইকে খুন করেছিলাম। আমি যদি ফৌজের সৈনিক না হতাম, তাহলে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হতো। কিন্তু এই ঘটনার জন্য কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি।'

দরবেশ চক্ষু বন্ধ করে ফেলে। ঠোঁট নড়ছে। হাত দুটো উপরে তুলে পরে গোয়েন্দার দিকে ইশারা করে। কিছুক্ষণ পর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। চোখ খুলে যায়। এবার মুখ খোলে। গোয়েন্দাকে বললো– 'অনেক কষ্টে তোমার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পেয়েছি। মন দিয়ে শোন। আমি তোমার গুনাহ মাফ করিয়ে দেবো বরং তুমি ও তোমার পরিবার এতো বেশি হালাল জীবিকা লাভ করবে, যা তুমি স্বপ্নেও দেখোনি। এখন চলে যাও, কাল আবার এসো।'

দরবেশ পুনরায় মুরাকাবায় আত্মনিয়োগ করে। সৈনিক এবং অপর লোকটি গোয়েন্দাকে বারান্দায় নিয়ে যায়। তারা তাকে দরবেশের এমন সব কারামতের কাহিনী শোনায় যে, গোয়েন্দা অভিভূত হয়ে পড়ে। মেয়ে দুটো জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছে। যে মেয়েটি গোয়েন্দাকে প্রথমবার দেখে চমকে ওঠেছিলো, সে অপর মেয়েকে বললো– 'একে আমি আগে কোথাও দেখেছি। লোকটা ধোঁকা দিচ্ছে না তো! মানুষটা কিন্তু সে-ই।'

'ঘটনাটা সেরূপই মনে হচ্ছে, যেমনটি আমরা আগেও একবার ধরেছিলাম'– গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট করছে– 'সেই

মুরাকাবা, সেই চিল্লা সেই জিন ও মানুষের আবেগকে আয়ত্ত্ব করে তাদের উপর যাদু প্রয়োগ করা। আমাদের ফৌজের যে সৈনিক আমাকে তার নিকট নিয়ে গিয়েছিলো, সে কেবল ফৌজের বিরুদ্ধেই কথা বলছিলো। মসজিদে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যেও একই কথা বলেছিলো। লোকটি আমার সঙ্গে যেসব কথা বলেছে, তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, তার আরো একাধিক সঙ্গী আছে, যারা তারই মতো মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসল্লীদের আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। রণাঙ্গনের অসত্য কাহিনী শোনাচ্ছে এবং বুঝাতে চেষ্টা করছে, ফৌজে ভর্তি হওয়া পাপের কাজ।'

'তাদের এই অভিযান মসজিদেই পরিচালনা করার কথা'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'মসজিদে বলা কথাকে মানুষ অহীর সমান মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষ আবেগের গোলাম। তারা সেই লোককে মুরশিদ-পথের দিশারী বলে বরণ করে নেয়, যে প্রথমে আবেগকে উত্তেজিত করে পরে শব্দ দ্বারা তাকে শান্ত করে। তুমি কাল আবার যাও। আমাকে গ্রাম ও ঘরটা বুঝিয়ে দাও। এদিক-ওদিক দেখে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো। তোমার তথ্যের ভিত্তিতে আমি সেখানে কমান্ডো অভিযান চালাবো।'

'আমার ভয় হয় কমান্ডো অভিযান চালালে সেখানকার অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠবে'– গোয়েন্দা বললো– 'সৈনিক আমাকে বলেছে, গ্রামের প্রতিটি শিশুও তার অনুরক্ত এবং দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে।'

'আমাদের অতো কিছু তোয়াক্কা করা চলবে না'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'যে শাসক জনগণের উপর শাসন চালাতে চায়, জনগণের আবেগ-উচ্ছ্বাসের তোয়াক্কা তাকে করতে হয়। এই চরিত্রের শাসকরা জনগণের আবেগ নিয়ে খেলা করে থাকে, যাতে প্রজারা খুশি থাকে এবং তাদের আনুগত্য করে। আমাদের কাজ সালতানাতে ইসলামিয়া ও দেশের জনগণের মর্যাদার সুরক্ষা। আমরা এলাকাবাসীকে হাকীকত দেখাবো। আমরা তাদেরকে সুলতান আইউবীর গোলাম বা ভক্ত বানাতে চাই না। আমরা তাদেরকে বলবো, ইসলামের প্রহরী তোমরাও ততোটুকু, যতোটুকু তোমাদের সুলতান। আমরা তাদেরকে ইসলামের দুশমন দেখাবো। আমরা আবেগ-পূজার নেশা জাগিয়ে জাতিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাই না। জাতিকে বাস্তবতার ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে। তুমি যাও। দেখো, বুঝো। তারপর রিপোর্ট করো।'

গোয়েন্দার দরবেশের আস্তানায় যাওয়ার সময় রাতে। আলী বিন সুফিয়ান নিজের বেশভূষা পরিবর্তন করে উক্ত গ্রামে চলে যান। তিনি দরবেশের ঘরটি চিনে নেন এবং তার প্রতি মানুষের ভক্তি-বিশ্বাসের আন্দাজ করেন। মানুষের কথাবার্তা শোনেন। মিসরের ফৌজের বিরুদ্ধে ঝড় তোলা হচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান বাড়ির পেছনটা দূর থেকে দেখে নেন। ওখানে ছোট্ট একটি দরজা। দরজাটা বন্ধ। গাছ-গাছালি আছে। ডানে ও বামে আরো দু'টি ঘরের পশ্চাদ্দেশ। কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না। যতো ভিড় বাড়ির সম্মুখে। হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। পুরাতন চোগা পরিহিত শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। আলী বিন সুফিয়ান আড়াল হয়ে যান। তিনি খোলা দরজাটায় একটি সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পান। মেয়েটি দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

লোকটি লাঠি হাতে ঝুঁকে ঝুঁকে ধীর পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। বেশ দূরে গিয়ে লোকটি দাঁড়িয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। একদিক থেকে এক অশ্বারোহী ধেয়ে আসে। লোকটি ঘোড়ায় চড়ে বসে এবং কায়রোর দিকে রওনা দেয়। ঘোড়া নিয়ে আসা লোকটি পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে চলে যায়।

আলী বিন সুফিয়ান নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে অশ্বারোহী সাদা দাড়িওয়ালা লোকটির পেছন পেছন এগুতে থাকেন। লোকটি কয়েকবারই পেছন দিকে তাকায়। আলী বিন সুফিয়ান এগুতে থাকেন। লোকটি কায়রোর দিকে এগুতে থাকে। একটি লোক পেছনে পেছনে চলছে বলে সে বেজায় বিরক্ত। কায়রোমুখী হয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয় সে। আলী বিন সুফিয়ানও গতির তাল বজায় রাখেন। তাঁর ঘোড়া আরো দ্রুত চলতে শুরু করে। লোকটি বারবার পেছন দিকে তাকাতে থাকে। আলী বিন সুফিয়ান তার পেছন পেছন যেতে থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে লোকটি কায়রোর রাস্তার পরিবর্তে ঘোড়া অন্য পথে ঘুরিয়ে দেয়। ঘোড়ার গতি স্বাভাবিক। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর ঘোড়াও সেই পথে ঢুকিয়ে দেন।

উভয় ঘোড়া এখন যেখানে, সেখানে এদিক-ওদিক দু'একটি ঝুপড়ি বা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। কোথাও যাযাবরদের অস্থায়ী ডেরা। লোকটি একের পর এক পথ পরিবর্তন করছে এবং বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ানও তার পেছন পেছন অগ্রসর হচ্ছেন। লোকটির অস্থিরতা বেড়ে

চলছে। অবশেষে সে কায়রোর দিকেই মুখ করে এবং ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। আলী বিন সুফিয়ানের ঘোড়ার গতিও বেড়ে যায়। এখন উভয় ঘোড়ার মধ্যখানের ব্যবধান পনের-বিশ কদম। তারা কায়রো নগরীতে ঢুকে যাবে বলে। এমন সময় হঠাৎ শশ্রুমণ্ডিত লোকটি ঘোড়া থামিয়ে মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ানও তার সম্মুখে গিয়ে থেমে যান।

'তুমি দস্যু মনে হচ্ছে'– সাদা শশ্রুমণ্ডিত অশ্বারোহী বললো। খঞ্জর বের করে পুনরায় বললো– 'আমার পিছু নিয়েছো কেনো?'

আলী বিন সুফিয়ান দেখলেন, সাদা দাড়ির কারণে লোকটার বয়স সত্তুর বছর মনে হচ্ছে। কিন্তু চেহারা, চোখ ও দাঁত বলছে চল্লিশেরও কম। আলী বিন সুফিয়ানও ছদ্মবেশে। তিনি কটিবন্ধ থেকে সোয়া গজ লম্বা তরবারীটা বের করে হাতে নেন।

'দাড়ি খুলে ফেলো'– আলী বিন সুফিয়ান লোকটির এক পাজরে তরবারী ঠেকিয়ে বললেন– 'আমার সামনে সামনে চলো।'

শুনে লোকটির চোখ দুটো পলকহীন দাঁড়িয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান তরবারীর আগাটা তার কালো পট্টির উপর রেখে দাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝটকা টান দেন। সঙ্গে সঙ্গে দাড়িগুচ্ছ মুখমণ্ডল থেকে আলাদা হয়ে যায়। ক্লিনসেভ চেহারাটা বেরিয়ে আসে। পরক্ষণে তিনি নিজের কৃত্রিম দাড়িও খুলে ফেলে বললেন– 'আমিও তোমাকে চিনি। তুমিও আমাকে চেনো। চলো রওনা হই।'

লোকটি ক্ষমতাচ্যুৎ আব্বাসী খেলাফতের একজন আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী। এই খেলাফতকে– যার সিংহাসন কায়রোতে ছিলো– সাত-আট বছর আগে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। তখন খলীফা ছিলেন আল-আজেদ, যিনি হাশিশি, ক্রুসেডার ও সুদানীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছিলেন। সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে কথা বলে এই খেলাফতকে বিলুপ্ত করে এমারতে মেসেরকে খেলাফতে বাগদাদের অধীন করে দেন। কিন্তু খেলাফতে আব্বাসিয়ার পদচ্যুৎ কর্মকর্তারা এখনো গোপন তৎপরতায় লিপ্ত। সুলতান আইউবীর রামাল্লা পরাজয় তাদের জন্য সোনালী সুযোগ এনে দেয়। এই আব্বাসীরা গোপন পন্থায় সুলতান আইউবী এবং তার বাহিনীকে চরিত্রহীন, বিলাসী, লুটেরা এবং পরাজয়ের জন্য দায়ী প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে।

এই ধৃত লোকটিও তাদেরই একজন।

আলী বিন সুফিয়ান লোকটিকে হেফাজতে নিয়ে নেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েদখানায় আটক করে রাখেন।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা রাতে দরবেশের নির্ধারিত সময়ে গ্রামের বাইরে এক স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। গত রাতের সৈনিক তাকে নিতে চলে আসে। সৈনিক তাকে নতুন কিছু উপদেশ দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারা পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু গোয়েন্দাকে গত রাতের কক্ষের পরিবর্তে অন্য এক কক্ষে নিয়ে বসায়। এই কক্ষে কালো দাড়িওয়ালা বুযুর্গ নেই– কেউ নেই। তাকে রেখে সৈনিকও বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। গোয়েন্দা দরজায় হাত লাগিয়ে বুঝতে পারে, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কক্ষে কোনো জানালা নেই। গোয়েন্দা বুঝে ফেলে আমি ধরা পড়ে গেছি। এরা জেনে গেছে, আমি গুপ্তচর। পালাবার কোনো পথ নেই। কী করা যায় ভাবতে শুরু করে গোয়েন্দা।

অনেকক্ষণ পর দরজা খুলে যায়। যে দু'টি মেয়েকে দরবেশ নিজের কন্যা পরিচয় দিয়েছিলো, তাদের একজন ভেতরে প্রবেশ করে। এখন সে পূর্বের ন্যায় আপাদমস্তক পর্দাবৃতা নয়। তবে ইউরোপিয়ানদের ন্যায় নগ্নও নয়। তার পোশাক আরব নারীদের পোশাকের ন্যায়। কারুকাজ কিছু এরাবিয়ান, কিছুটা ইউরোপিয়ান। মেয়েটি ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কে যেনো বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। দরজা আবারো বন্ধ হয়ে যায়। কক্ষে প্রদীপ জ্বলছে। মেয়েটির প্রতি চোখ পড়ামাত্র গোয়েন্দার চোখ বিস্ময়ে নিষ্পলক হয়ে যায়।

মেয়েটি মিটি মিটি হাসছে।

'চেনার চেষ্টা করছো, না?'– মেয়েটি বললো– 'এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেছো? তুমি আমার শহর থেকে রক্ষা পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলে। কিন্তু এখন নিজ ভূখণ্ডে আমর কয়েদি হয়ে গেছো। এখন আর বেরুতে পারবে না।'

গোয়েন্দা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, যাতে প্রশান্তিও আছে, উদ্বেগও আছে। গোয়েন্দার তিন বছর আগের কাহিনী মনে পড়ে যায়। তাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আক্রা প্রেরণ করা হয়েছিলো। আক্রা তখন খৃস্টানদের দখলে ছিলো। সেখানে তাদের বড় পাদ্রীর আস্তানা ছিলো, যাকে ক্রুশের মহান মোহাফেজ বলে অভিহিত করা হতো। যেসব খৃস্টান সম্রাট আরব এলাকা দখল করার

জন্য আসতেন, তারা অবশ্যই সেখানে যেতেন এবং বড় পাদ্রীর আশির্বাদ গ্রহণ করতেন। সে কারণে সামরিক দিক থেকে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। আলী বিন সুফিয়ান সেখানে গোয়েন্দা প্রেরণ করে রেখেছিলেন। তারা সেখানে খৃস্টানবেশে একটি আস্তানাও গড়ে তুলেছিলো। তাদের তিন-চারজন গোয়েন্দা শত্রুর হাতে ধরা পড়েছিলো এবং দু'জন শহীদ হয়েছিলো। ফলে সেখানকার কমান্ডার আরো গোয়েন্দা চেয়ে বার্তা প্রেরণ করেছিলো। তখন নতুনভাবে যাদের প্রেরণ করা হয়েছিলো, তাদের একজন এই গোয়েন্দা, যে এখন মিসরের একটি কক্ষে শত্রুর হাতে বন্দি।

লোকটির গাত্রবর্ণ, দৈহিক কাঠামো ও মুখাবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। বুদ্ধিমত্তাও অতিশয় প্রখর ও সতর্ক। অশ্বচালনায় এতোই দক্ষ যে, সামরিক মহড়া ও সমর প্রদর্শনীতে নিজের কৃতিত্ব-যোগ্যতা দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতো। চরিত্রও ফুলের মতো পবিত্র। খৃস্টান নাম ধারণ করে সে আক্রা প্রবেশ করেছিলো এবং নিজের দুর্দশা ও নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়ে বলেছিলো, আমি হাল্‌বের মুসলিম বাহিনীতে নতুন সৈনিকদেরকে অশ্বচালনা প্রশিক্ষণ দিতাম। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা আমার এক যুবতী বোনকে অপহরণ করে আমাকে অন্যায়ভাবে ফৌজ থেকে বের করে দিয়েছে।

খৃস্টানরা তার চাল-চলন ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে অশ্বচালনার প্রশিক্ষণের জন্য রেখে দেয়। কিন্তু তার শিষ্যরা সৈনিক নয়। তারা যুবতী মেয়ে এবং বড় বড় অফিসারদের পুত্র। গোয়েন্দা জানতে পারে, এই মেয়েগুলোকে মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরে কতিপয় পুরুষকেও তার হাতে তুলে দেয়া হয়। এরা সকলে খৃস্টান গোয়েন্দা। মুসলিম গোয়েন্দা তাদের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। খৃস্টানদের থেকে সে মোটা অংকের ভাতাও পেতে শুরু করে।

এই মেয়েটি– যে এখন তার সঙ্গে কক্ষে কথা বলছে– আক্রায় তার শিষ্য ছিলো। মেয়েটির গুপ্তচরবৃত্তির যোগ্যতা ছিলো; কিন্তু অশ্বচালনা জানতো না। আলী বিন সুফিয়ানের এই গোয়ন্দার মেয়েটিকে ভালো লাগতে শুরু করে। প্রথমে ভালো লাগা, তারপর ভালোবাসা। অবশেষে দু'জনের মাঝে গভীর প্রণয় জমে যায়। এক পর্যায়ে গুরু-শিষ্য নয়– প্রেমিক-প্রেমিকা পরিচয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে। মেয়েটি এমনও সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলে, এই লোকটির খাতিরে গুপ্তচরবৃত্তির মতো হীন পেশাটা ছেড়ে দেবে এবং তার স্ত্রী হয়ে সম্মানের জীবনযাপন করবে। মুসলমান গোয়েন্দা তার ভালোবাসার উত্তর ভালবাসা দ্বারাই দিয়েছিলো বটে; কিন্তু কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেনি। মেয়েটি কাজ-কর্মে অবহেলা করতে শুরু করেছিলো। প্রেমিক গুরুকে ছাড়া তার কিছুই ভালো লাগছিলো না।

একদিন আক্রায় দু'জন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়ে যায়। তাদের একজন তার জানামতো সকল সহকর্মীর ঠিকানা বলে দেয়। এই গোয়েন্দাও তাদের একজন ছিলো। খোঁজাখোঁজি শুরু হয়ে যায়। মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি গুপ্তচর নও তো? মুসলমান নও তো? শুনেছি, এখানকার গোয়েন্দা বিভাগ তোমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে এবং তোমার উপর নজর রাখছে।'

জবাবে গোয়েন্দা হেসে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠে। রাতে কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কমান্ডার বললো, আমাদের বহু লোক চিহ্নিত হয়ে গেছে। সম্ভব হলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

গোয়েন্দা কমান্ডারের গৃহ থেকে বের হয়ে টের পায়, দু'ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছে। সে এগিয়ে গিয়ে আস্তাবলে ঢুকে পড়ে। একটি ঘোড়ায় জিন কষে। অমনি দু'জন লোক এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছো? লোকটি অত্যন্ত চৌকস ও সতর্ক। অবস্থা বেগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়েই ঘোড়া হাঁকায়। একজন তাঁর ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। অপরজন কিছু বুঝতে না বুঝতে সে ছুটতে শুরু করে। গোয়েন্দা আক্রা থেকে বেরিয়ে আসে।

'আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি'– গোয়েন্দা মেয়েকে বললো। তিন বছর পর তাদের এই সাক্ষাৎ– 'আমি বিস্মিত হয়নি। তুমি যে গোয়েন্দা, আমি জানি।'

'তিন বছর আগে তোমার প্রেমের ফাঁদে পড়ে আমি গুপ্তচরবৃত্তি ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম– মেয়েটি বললো– 'তুমি যদি বলতে, তুমি মুসলমান এবং গোয়েন্দা, তবু আমি তোমাকে ধোঁকা দিতাম না। আমি তোমার সঙ্গে এসে পড়তাম। তোমার পালিয়ে আসার পর আমি যখন জানতে পারলাম, তুমি মুসলমান গুপ্তচর ছিলে, তখন আমি ব্যথিত হয়নি। আমার বেদনাটা ছিলো তোমার বিরহের।'

'এখন কি তোমার হৃদয়ে আমার ভালোবাসা নেই?'– গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করে– 'তুমি এখন আমার দেশে। আমার সঙ্গে আসো। এখানে আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।'

'আছে'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এখনো আছে। কিন্তু কর্তব্য তার উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। এটা তোমার অপরাধ। তোমার ভালোবাসার খাতিরে আমি গোয়েন্দাগিরি পরিত্যাগ করার সংকল্প নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সংকল্পকে দলিত করে আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির নোংরামিতে ডুবিয়ে দিয়েছো। তিনটি বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়টায় আমি নিজেকে জঘন্যরূপে নাপাক করে ফেলেছি। ইসলামের প্রতি ঘৃণা আমার আত্মায় মিশে গেছে। এখন আর প্রেম নয়। এখন তুমি আমার বন্দি। আমি আমার জাতিকে ধোঁকা দিতে পারি না। আমি যে লোকটির সঙ্গে এসেছি, তাকে বলে দিয়েছি, তুমি গুপ্তচর। তাকে আমি আক্রার সব ঘটনা খুলে বলেছি। বারান্দা দিয়ে অতিক্রম করার সময় যদি আমি তোমাকে না দেখে ফেলতাম, তাহলে আমরা সকলে গ্রেফতার হয়ে যেতাম। তোমাকে আমিই ধরিয়েছি।'

'তোমাদের যে লোকটি পীর সেজেছে, সে মুসলমান না খৃস্টান?' গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করে।

'জেনে কী করবে?' মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করে।

'গোয়েন্দাগিরি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে'– গোয়েন্দা বললো– 'মৃত্যুর প্রাক্কালে আরো তথ্য জানতে চাই আর কি। এই ভেদ তো এখন আর বাইরে নিতে পারবো না।'

'মুসলমান'– মেয়েটি বললো– 'মুসলমানদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ওস্তাদদেরও ওস্তাদ।'

কক্ষের দরজা খুলে যায়। কলো দাড়িওয়ালা দরবেশ এক ব্যক্তির সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেই মেয়েটিকে বললো– 'তোমার কথা-বার্তা শেষ হয়ে থাকলে বেরিয়ে যাও।'

মেয়েটি গোয়েন্দার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে যায়।

দরবেশ গোয়েন্দাকে বললো– 'শুধু এটুকু বলো, আমার ভেদ কার কার জানা আছে। তুমি কি আলী বিন সুফিয়ানকে বলে দিয়েছো, আমি সন্দেহভাজন?'

'না'– গোয়েন্দা জবাব দেয়– 'আমি গোয়েন্দা বটে; কিন্তু এখানে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আসিনি।'

দরবেশের হাতে হান্টার (চামড়ার চাবুক) ছিলো। সে পূর্ণ শক্তিতে গোয়েন্দাকে প্রহার করতে করতে বললো– 'আমি সত্য কথা শুনতে চাই।'

কক্ষের দরজাটা সজোরে খুলে যায়। মেয়েটি ভেতরে প্রবেশ করে। সে দরবেশের উভয় হাত ধরে বিনয়ের সাথে বললো– 'একে মেরো না, সব বলে দেবে।'

'না, আমি কিছুই বলবো না।' গোয়েন্দা বজ্রকণ্ঠে বললো।

দরবেশ আবারো প্রহার করতে উদ্যত হয়। মেয়েটি ছুটে গিয়ে গোয়েন্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। চীৎকার করে বলে ওঠে– 'মেরো না। এর দেহের আঘাত আমার হৃদয়ের জখমে পরিণত হবে।'

'তুমি কি একে রক্ষা করতে চাচ্ছো?' অপর ব্যক্তি গর্জে ওঠে জিজ্ঞেস করে।

'না'– মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো– 'লোকটি যদি কোনো তথ্য না দেয়, তাহলে তরবারীর এক আঘাতে এর মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলো। নির্যাতন দিয়ে হত্যা করো না।'

মেয়েটিকে টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। গোয়েন্দার উপর অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। সারাটা রাত তাকে শয্যায় পিঠ লাগাতে দেয়া হলো না। তাকে বহু কিছু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। নির্যাতনের পর নির্যাতন চলছে; তবু কোন তথ্য দিচ্ছে না।

রাতের শেষ প্রহর। মেয়েটি তার কক্ষে প্রবেশ করে। গোয়েন্দা অর্ধ অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। দরবেশের লোকেরা তরবারীর আগা দ্বারা তার শরীরে খোঁচাচ্ছে। দেখে মেয়েটি তার গায়ের উপর শুয়ে পড়ে চীৎকার করতে শুরু করে– 'এ আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি তোমাকে বলে দিয়েছি, এটা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। এর কষ্ট আমার কষ্ট। লোকটি তার কর্তব্য পালন করছে আর আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। একে তোমরা প্রাণে মেরে ফেলো– নির্যাতন করো না।'

গোয়েন্দা অর্ধ অচেতন অবস্থায় নিজ গায়ের উপর পড়ে থাকা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট স্বরে বললো– 'তুমি চলে যাও। পাছে আমি আমার কর্তব্য থেকে ছিটকে না পড়ি। এই অত্যাচার আমার কর্তব্যেরই অংশ। তুমি তোমার ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করো আর আমাকে আমার দীনের জন্য জান কুরবান করতে দাও।'

মেয়েটি পাগলের মতো হয়ে গেছে। তাকে পুনরায় টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

দরবেশ আদেশ করে– 'এই হতভাগীকে একটি কক্ষে আটকে রাখো।'

❖ ❖ ❖

দিনের অর্ধেকটা কেটে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর গোয়েন্দার ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে ওঠেছেন। তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে। সেই রাতে গেলো; এখনো ফিরলো না কেনো! গতকাল তিনি শুভ্র শশ্রুমন্ডিত যে লোকটিকে পাকড়াও করেছিলেন, কয়েদখানায় রাতে নির্যাতনের মাধ্যমে তার থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে, কালো দাড়িওয়ালা দরবেশটা কে, তার আসল পরিচয় কী এবং তার মিশন কী।

দিবসের শেষ বেলা আলী বিন সুফিয়ান একটি কমান্ডো সেনাদল প্রস্তুত করেন। এখন তাঁর প্রবল ধারণা, তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দা ধরা পড়ে গেছে। আস্তানাটি যে শত্রুর নাশকতাকারী গোয়েন্দাদের আড্ডাখানা, তা এখনা প্রমাণিত।

আলী বিন সুফিয়ান-এর কমান্ডোরা এতো দ্রুততার সঙ্গে এসে পৌঁছে যে, এলাকাবাসি কিছুই বুঝে ওঠতে পারেনি। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বানরের ন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। পলকের মধ্যে ভেতরের সবগুলো লোককে ধরে ফেলে।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা একটি কক্ষে অচেতন পড়ে আছে। তার মুমূর্ষু অবস্থা। তার প্রেমিকা মেয়েটি এক কক্ষে মেঝেতে পড়ে আছে। তার বুকে একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। 'আমি আত্মহত্যা করেছি' বলেই মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এলাকাবাসী ঘটনাটা টের পেয়ে গেছে। তারা দরবেশের আস্তানার বাইরে ভিড় জমায়। পরস্পর কানাঘুষা চলছে।

দরবেশকে বের করে জনতার সম্মুখে দাঁড় করানো হলো। তাকে বলা হলো, আসল পরিচয় নিজ মুখে শোনাও। জনতাকে বলো, কী উদ্দেশ্যে মিসরের ফৌজ ও সুলতান আইউবীর দুর্নাম রটনা করছো।

দরবেশ সত্য সত্য বলে দেয়। মানুষ তার যে পরিচয় জানে, সব ভুয়া। আসল পরিচয়, সে খৃস্টানদের চর এবং নাশকতার হোতা। ইদানিংকার দেশময় অপপ্রচারের মূল নায়ক।

এক মেয়ে মারা গেছে। অপর মেয়েকে জনতার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো এবং বলা হলো, এই মেয়েটি মুসলমান নয়– খৃস্টান। জনতাকে আরো অবহিত করা হলো, রামাল্লা থেকে আশার পথে পার্বত্য এলাকায় আগুনের কাছে যে পানি ও খেজুর পড়ে ছিলো, সেগুলো এদেরই লোকেরা রেখেছিলো।

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর পাতাল কক্ষে ধৃত দরবেশ ও সাঙ্গপাঙ্গদের থেকে যেসব তথ্য লাভ করেছেন, তাতে জানা গেলো, লোকটি রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা নতুন সৈন্যদেরকে ফন্দি করে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলো। সঙ্গে তার নিজেরও লোক ছিলো। এরা বিভিন্ন মসজিদ ও নানা লোক সমাগমের স্থানে মিসরের ফৌজের বিরুদ্ধে কথা বলতো। উদ্দেশ্য ছিলো, দেশের জনগণ ও ফৌজের মাঝে সংশয় ও ঘৃণার প্রাচীর দাঁড় করানো। এই মিশনে মিসরের প্রশাসনের জনাকয়েক কর্মকর্তা এবং ক্ষমতাচ্যুৎ আব্বাসী খেলাফতের গোপন কর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মোটকথা, দুশমনের পরিচালিত এই অভিযানে স্বার্থপূজারী ঈমান বিক্রেতা মুসলমানও অংশীদার ছিলো।

'যখন দেশের সেনা বাহিনী ও জনগণের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন বুঝে নিও সালতানাতে ইসলামিয়ার পতন শুরু হয়ে গেছে'— সুলতান আইউবী বললেন। তিনি নির্দেশ জারি করেন— 'দেশের সমস্ত মসজিদের ইমামদেরকে রামাল্লার পরাজয়ের প্রকৃত কারণ অবহিত করার ব্যবস্থা করো। ইমামগণ বিষয়টি দেশের মানুষকে অবহিত করবেন। কাউকে দায়ী কিংবা অভিযুক্ত করে যদি কেউ শান্তি লাভ করে থাকে, তাহলে সব দায়-দায়িত্ব আমার উপর চাপাও। ফিলিস্তিনের রণাঙ্গনে জীবন দিয়ে আমি জাতির সেই লোকগুলোর গুনাহের কাফফারা আদায় করবো, যারা ক্ষমতার নেশায় আমার ফৌজ ও ফিলিস্তীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তখন আমার রক্তের প্রতিটি ফোঁটা চীৎকার করে করে জানান দেবে, রামাল্লার পরাজয়ের জন্য ফৌজ দায়ী ছিলো না এবং মিসরের একজন ফৌজও কোনো অনৈতিক কাজে জড়িত ছিলো না।

[ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত]

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান